চানঘরে গান

বুদ্ধদেব গুহ

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

নিচের গানের কথাগুলো রেখেদিলাম,বইটার সাথে সুরের মিল আছে। আপনাদের কেমন লাগল জানাবেন।

-----অয়ন চট্টোপাধ্যায়

www.boiRboi.blogspot.com

তোড়াকে,

এবং তোড়াদের..........

আমার যমুনার জল দেখতে কালো স্নান করিতে
লাগে ভালো, যৌবন মিশিয়া গেল জলে,

হাত পানিতে নামিয়া কন্যা
হাত মজ্জন করে। কন্যার হাত দেখিয়া
আমার মন আনচান করে,

আমার যমুনার .... জলে,

নাভি পানিতে নামিয়া কন্যা। নাভি মজ্জন করে,
কন্যার নাভি দেখিয়া আমার মন আনচান করে,

আমার যমুনার .... জলে,

বুক পানিতে নামিয়া কন্যা বুক মজ্জন করে,
কন্যার বুক দেখিয়া আমার মন আনচান করে,

আমার দেখতে কালো. স্নান করিতে লাগে ভালো.
যৌবন মিশিয়া গেল জলে,

www.boiRboi.blogspot.com

লেখকের অন্যান্য বই

কোজাগর	খেলা যখন
অভিলাষ	সবিনয় নিবেদন
সাজঘরে, একা	মাধুকরী
ইলমোরাণদের দেশে	ঋভুর শ্রাবণ
পঞ্চপ্রদীপ	টাঁড়বাঘোয়া
বাজা তোরা, রাজা যায়	গুগুনোগুম্বারের দেশে
ধুলোবালি	মউলির রাত
মহুয়া	ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে
পারিধী	ওয়াইকিকি
সোপর্দ	বনবিবির বনে
চবুতরা	হলুদ বসন্ত
স্বগতোক্তি	বাবলি
প্রথম প্রবাস	ভোরের আগে
পঞ্চম প্রবাস	প্যারিজাত পারিং
নাজাই	মহুলসুখার চিঠি
পলাশতলির পড়শী	
ভাবার সময়	শালডুংরি
প্রথমাদের জন্যে	সন্ধের পরে
লবঙ্গীর জঙ্গলে	সাসানডিরি
জলছবি, অনুমতির জন্যে	পুজোর, সময়ে
আয়নার সামনে	জেঠুমনি অ্যান্ড কোং
শ্রেষ্ঠ গল্প	ল্যাংড়া পাহান
দূরের দুপুর	রুআহা
দুরের ভোর	বাঘের মাংস এবং অন্য শিকার
জঙ্গল মহল	বাংরিপোসির দু' রাত্তির
সুখের কাছে	পহেলি পেয়ার
জঙ্গলের জার্নাল	একটু উষ্ণতার জন্যে
যাওয়া আসা	অন্বেষ
ঝাঁকি দর্শন	হাজারদুয়ারী
রিয়া	নিনিকুমারীর বাঘ
কোয়েলের কাছে	বনজ্যোৎস্নায়, সবুজ অন্ধকারে
বিন্যাস	দু নম্বর
অ্যালবিনো	নগ্ন নির্জন / বাতিঘর
ঋভু	চানঘরে গান

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

সবিনয় নিবেদন

'চানঘরে গান' পত্রাশ্রয়ী লেখা হলেও উপন্যাস নয়।

সব লেখাকেই যে "উপন্যাস" বা "ছোট গল্প" হতেই হবে এমনও তো কোনো কথা নেই! এমন পর্যায়ভুক্ত করাটাই ঠিক নয়। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার সাহিত্যেরই মতো বাংলা সাহিত্যেও নানা চরিত্রের লেখা যদি সংযোজিত হয় তাতে সাহিত্যই পুষ্ট হবে।

"চানঘরে গান" হয়তো সাহিত্যের একধরনের বিশেষ শ্রেণী হিসেবেই চিহ্নিত ও ব্যবহৃত হবে ভবিষ্যতে।

কে বলতে পারেন?

পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যাঁদের কিছু বক্তব্য থাকবে, তাঁরা পোস্ট বক্স নাম্বার ১০২৭৬, কলকাতা-৭০০ ০১৯ এই ঠিকানাতে জানাতে পারেন।

ইতি—

বিনত লেখক

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
২২শে ফেব্রুয়ারী

লেখক,

আমি যে কোনোদিনও আপনাকে চোখে দেখতে পাব তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

কী বলে যে সম্বোধন করব চিঠিটি তাও অনেক ভেবে-টেবেও ঠিক করতে পারলাম না।

'শ্রদ্ধাস্পদেষু' ? লিখব কি ?

না, না সে বড় সাধারণ, সূর্যাস্তর ছবিরই মতো "ক্লিশে" হয়ে যাওয়া সম্বোধন।

প্রিয়তম লিখব ? না। সেও তো তাইই ! তাই না ? লেখক ?

তাছাড়া আপনি তো আমার কাছে শুধু 'শ্রদ্ধাস্পদেষু'ই নন। এবং শুধু 'প্রিয়তমও' নন। আপনি যে অনেক কিছুই ! আমার প্রথম কৈশোরের স্বপ্ন আপনি। আমার শেষ কৈশোরের নরম সজনে ফুল। আমার প্রথম যৌবনের উদ্দাম বাসনা ; আপনি আমার জীবন-মরণের কাণ্ডারী। আমার মননে শীতের সূর্যাস্ত বেলায় হোগল বাদার মধ্যে বসে স্বগতোক্তি-করা ঘন-বেগুনি আর গাঢ়-লাল কাম পাখি। আমার শরীর মনের সব শীতের উষ্ণতা ; পরম দাহর প্রলেপ।

আপনার বই দিয়েই আমার জীবন শুরু এবং এই "দুয়াই" চাইব শুধু খুদাহর কাছে যে শেষের দিনে আপনার বই বুকে নিয়েই যেন মরতে পারি।

আজই, ইচ্ছে আছে, সন্ধেবেলায় যখন বইমেলায় যাব আপনাকে দেখতে, তখন আপনার "মাধুকরী" বইটি সই করিয়ে নেব আপনাকে দিয়ে। আপনার পায়ে হাত দিয়ে, হিন্দু মেয়েদেরই মতন প্রণাম করব। শুধু আদাব করে মন ভরবে না।

কিন্তু আপনি যদি আমার সঙ্গে হেসে কথা না বলেন ? যদি কথাই না বলেন ? তাহলে যে এতোদিন ধরে বুকের মধ্যে তিলতিল করে জমিয়ে তোলা সমস্ত ভালোলাগাটুকু, আপনার চেহারা সম্বন্ধে, মানসিকতা সম্বন্ধে ; সমস্ত কল্পনাই আমার ভেঙ্গে চুরচুর হয়ে যাবে !

দেখা করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভুল করলাম, না ঠিক, এখন থেকেই তা ভেবে চিন্তান্বিত হচ্ছি।

আচ্ছা ! কী করে ? এমন মনের কথা লেখেন বলুন তো ! পড়ি আর অবাক হই ; অবাক হই আর পড়ি। ভাবি, এমন নির্ভুল ভাবে আমার মনের সব কথা একজন পুরুষ হয়েও আপনি জানেন কি করে ? নিজের মনের যে-কোনো অনুভূতিই খুঁজে পাই আপনার বই খুললে। আপনি আমার মনের আয়না।

আজ 'মেলা'তে গিয়ে, চিঠিটা দিয়ে ; বইটি সই করিয়ে, আপনাকে প্রণাম করেই পালিয়ে আসব। পালিয়ে না এসে নিরুপায়ও বটে ! এতদিনের নিরুদ্ধ ঔৎসুক্য, ভালোলাগা, উত্তেজনা সব মিলে মিশে গিয়ে আমার অধীর মনেরই মতন দুটি পাও যে কাঁপবে থরথর করে ! বেশিক্ষণ দাঁড়াতেই পারব না আপনার সামনে।

এই চিঠিতে উচ্ছাস এতো বেশি হয়ে গেল যে, আপনি হয়ত আমাকে প্রগলভা ভাবতে পারেন। কিন্তু তা আমি আদৌ নই। আমার আশৈশবের বক্তব্য একটি চিঠিতে হঠাৎ ঢেলে দিতে হচ্ছে বলেই এমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছি। মার্জনা করবেন।

জানি না, আপনি কতদিন ঢাকাতে থাকবেন। ঢাকার কোনো প্রকাশকের অতিথি হিসেবেই আপনি এসেছেন শুনলাম এ বছরের ২১শে ফেব্রুয়ারীর বইমেলাতে। এতোদিন আসেননি কেন ? কতদিন হলো এই দিনটির অপেক্ষাতে বসে আছি !

বাংলাদেশে আগে কখনও এসেছেন কি ? আপনার "ঋভু", "ঋভুর শ্রাবণ", "নাজাই", "বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে" ইত্যাদি বই পড়ে মনে হয়েছে আপনার শৈশব বাংলাদেশেই কেটেছে। এই অনুমান কি সত্যি ?

"ঋভু" কি আত্মজৈবনিক লেখা ?

যদি আপনি আগামী কালও "মেলা"তে আসেন তবে আবারও আমি যাব এমন ইচ্ছে আছে। আজ আপনার সেমিনারেও থাকব। আপনি জানতেও পারবেন না।

আপনি থাকবেন পাদপ্রদীপের সামনে। যেখানে আপনার স্থান। ঝলমল করবেন আপনি। আর আমি থাকব অন্ধকারাবৃত অগণ্য মানুষের নগণ্য কালো কালো মাথার একটি মাথা হয়ে, মস্ত বড় অডিটরিয়ামে। আপনাকে আপন ভাবতে খুব ইচ্ছে করবে। কিন্তু আপনি তো লক্ষ মানুষের, আপনার অগণ্য পাঠক-পাঠিকার। আপনাকে আমার করে পাওয়াতো দূরস্থান। তা ভাবাটাও যে কষ্টকল্পনা। অন্যায়।

যাই হোক, যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ আর কোনোদিনও দেখা না-ই হয় আমার আপনার সঙ্গে এবারে, তবে এখান থেকে ফিরে যাবার সময়ে প্লেনের জানালার পাশে বসে আমার এই চিঠিটি দয়া করে আরেকবার পড়বেন। জানবেন যে, বাংলাদেশের ঢাকা শহরের এক কোণে আপনার জন্যে অনেক ভালবাসা আর শ্রদ্ধা বুকে নিয়ে, বাংলাদেশের নদীরই মতো প্রশান্তি আর দুর্দমতা নিয়ে শুধু আপনারই জন্যে একজন পাঠিকা চিরকাল অপেক্ষা করে থাকবে। কবে আপনি আসবেন, কবে আপনি থাকবেন আমার কাছে এসে, তার অপেক্ষাতে। কবে ? ধন্য করবেন আমাকে ?

আমি স্বাবলম্বী। আমার নিজের একটি ছোট্ট বাড়ি আছে এখানে। আপনার কোনোই কষ্ট হবে না। আপনি যদি সত্যিই আসেন তবে গামছা দিয়ে দই পেতে খাওয়াব আপনাকে। দই-ইলিশ। সর্ষে-কই। চিংড়ির মালাইকারী, কাউঠ্যার মাংস, কাঁকড়ার চচ্চরী। কষে পেঁয়াজ

www.boiRboi.blogspot.com

রসুন লংকা দিয়ে রেঁধে।

আপনি যে খাদ্যরসিক। জীবন রসিক। আপনি যে দুর্মর প্রেমিকও তা আপনার লেখা পড়লেই বোঝা যায়।

আজকে শেষ করলাম। পুরো ঠিকানা দিলাম আলাদা কাগজে। যদি উত্তর পাই তো ধন্য মনে করব নিজেকে। আপনার নিজের হাতের লেখা চিঠি থাকবে আমার কাছে এই ভাবনা ভেবেই উত্তেজিত বোধ করছি।

জানি না, আপনার সঙ্গে দেখা হলে কী হবে।

ইতি—
ফিরদৌসী আখতার।

পুনশ্চ ঃ উত্তর কি পাবো?

আপনার সব বই-ই যে পড়েছি এমন বলতে পারি না। তবে অনেক বই-ই পড়েছি। আপনার সব বইয়ের একটি তালিকা কি পেতে পারি?

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

ফিরদৌসী, কল্যাণীয়াসু

পরদিন তুমি আসবে বলে এলে না কেন? আশা করেছিলাম যে আসবে।

তোমার চিঠি পেয়ে আমি অভিভূত। চিঠিতো রোজ কতই পাই। যদিও সব চিঠিই আলাদা আলাদা ভাবে ভাল, আলাদা আলাদা গুণের জন্যে ভাল; কিন্তু তোমার চিঠি অন্যরকম। ব্যতিক্রমী। ক্ষণিকের জন্যে হলেও তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমিও অভিভূত।

অভিভূতির তাপাঙ্ক মাপতে সময়কালটা গণ্য বা মান্য নয়।

যখন ঘটবার তখন মুহূর্তেই ঘটনা ঘটে।

তোমার বোনকেও ভাল লাগল খুব। ওকে একটি ছেলে ডাকছিল 'কেয়া' বলে। ওর নাম কি 'কেয়া'? 'কেয়া' নামে ওকে মানায় না। ওকে বোলো যে ওর নাম দিলাম আমি 'খেয়া'। ভবের নদী, ভাবের নদী; সব নদীরই পারানি ও। তাই।

ফিকে-গোলাপি শাড়িটি পরে, খোঁপাতে রক্তকরবী গুঁজে তুমি যে-মুরতি ধরে আলোকোজ্জ্বল মেলার মধ্যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলে, সেই ছবিটি আমার মনে চিরদিনের মতো আঁকা হয়ে গেছে।

তোমার নামটিও বদলানো দরকার। তোমার দীঘল চোখ দুটি, আনত যার দৃষ্টি; তোমার ঝাঁপিয়ে পড়া মেঘ-ভাঙা বন্যার মতো কালো চুলের রাশ, তোমার পুষ্ট ঠোঁটের কোণে থমকে-থাকা হাসি, গাল আলো-করা একটি লাল তিল, এসবে আমার এই প্রত্যয়ই জন্মেছে যে, তুমি কখনও কোনো একটি ব্যক্তি বা একটি মাত্র ফুল হতেই পারো না। তুমি করৌঞ্জ নও, হিম্বা নও, যুঁই নও, গোলাপ নও, রাত-কি-রাণীও নও; তুমি ফুলের তোড়া। সমষ্টি। গুলদস্তাঁ। তুমি তবাসুম; স্বর্গীয় সুখ। ফিরদৌস্ এর সময়তো তোমার এখনও আসেনি।

তোমাকে আমি তোড়া বলেই ডাকব।

রাশ রাশ টাটকা বকুল ফুলের গন্ধবাহী মন নিয়ে তুমি এসে পৌঁছেছো আমার কাছে। এই অবেলাতে। কিন্তু তোমাকে যে দেবার মতন কিছুই নেই আজ! দেওয়া-নেওয়ার, খেয়া-বাওয়ার দিন আমার ফুরিয়েছে। প্রেম, কাম, বিরহ, বিষাদ কোনো কিছুই আমাকে এখন

www.boiRboi.blogspot.com

আর ছোঁয় না ; তোমার নবীন বয়সে, তোমাকে যেমন করে ছোঁয় তারা। ছোঁয় বলব না, বলব, আলিঙ্গন করে। এই সংসারের সমস্ত অনুভূতি, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, ভালবাসা, ঘৃণা, কৃতজ্ঞতা, কৃতঘ্নতা, শঠতা, তঞ্চকতার পরপারে এসে পৌঁছেছি এখন। অনেক দূর হেঁটে এসেছি তোড়া। ধুলো পায়ে। কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণার পরপারেও এসেছি। এও কম কথা নয়!

যদিও সাঁতরে-আসা উদবেড়ালের মতো এখনও জল ঝরছে ভেজা শরীর থেকে। কিন্তু পৌঁছে গেছি অন্য পারে। এখন সব কিছুই সমাহিত হয়ে আছে আমার ভিতরে। কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকেই আর ব্যক্তিগত মালিকানার ঘেরাটোপে বন্ধ করে না-রেখে, তাদের উড়িয়ে দিয়েছি মুক্ত আকাশের নীলিমাতে।

যা-কিছুই একদিন নিজস্ব ছিল তার সবকিছুই দিয়ে দিয়েছি চাইবার আগে, তোমারই মতো, অনেক ভালবাসার পাঠক-পাঠিকাদের।

এই নিঃস্বতার বিত্তর দাম, শুধুমাত্র একজন লেখকই জানেন!

তোমার যুবতী হাতের করপুটে আমার জন্যে যা কিছু আছে, অঞ্জলিভরে যে নৈবেদ্য এনেছ তুমি, তা তুমি তোমারই যোগ্য কোনো যুবাকে দিও। কোনো নবীন মনসুর বা মঞ্জুর-উল্, বা ফৈয়াজ বা কামালকে ; অথবা অনিরুদ্ধ, অর্যমা বা সায়নকে। তাতেই পূর্ণতর হব।

তুমি যে পাঠিকা। আমাদের সম্পর্ক প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্কর চেয়েও অনেক বড়। অনেক মধুর। এ সম্পর্ক, যেন চিরদিন থাকে।

তোমার নেমন্তন্নর কথা অবশ্যই মনে রাখব। পরের বার ঢাকাতে গিয়ে তোমার কাছেই থাকব। কিন্তু বড় চুপি চুপি যেতে হবে। ভীড় নয় একেবারেই। কাউকে জানালে চলবে না। তুমি রাঁধবে আর লেখক রান্নাঘরের দরজাতে মোড়া পেতে বসে তোমাকে গান শোনাবে। একটার পর একটা।

ভাল রান্না করা অত্যন্ত উঁচুদরের শিল্প। কবির চেয়ে, গায়িকার চেয়ে, যিনি রাঁধেন তিনি কোনো অংশেই কম বড় শিল্পী নন।

তুমি ভয় পেতে পারো হয়তো এই ভেবে যে, অকারণ যদি প্রেম হয়ে যায়?

ভয়ের তো কিছু নেই।

এখন তো অভয়ধামেই পৌঁছে গেছ।

কারণ, প্রেম তো হয়েই গেছে! এ প্রেম নয় তো; প্রেম কী।

প্রেম কি?

ভাল থেকো। তোমার বোনের নাম কি? তা জানিও।

ইতি—তোমার লেখক।

পুনশ্চ ঃ আমি বাঙাল। তখন তো বাংলাদেশের জন্ম হয়নি যখন জন্মাই আমি।

'বাঙাল' বলে আমার এক ফোঁটাও লজ্জা নেই। বরং গর্ব আছে। আমাদের আদি বাড়ি ছিল, বহুপুরুষ আগে, বরিশালে। "যাইতে শাল, আইতে শাল তার নাম বরিশাল।" বরিশালের কাঁচাবালিয়াতে। তবে সেখানের কোনো মানুষের সঙ্গেই আমাদের যোগাযোগ নেই আর। ছিল যে, এমন বাবা কাকাদের কাছেও শুনিনি। বরিশালের পর দ্যাশ আছিল ফরিদপুরে। তারপর রংপুর।

মা-ঠাকুমা প্রায় একই সঙ্গে চলে যাওয়ার পর থেকেই খাওয়াদাওয়ার সুখ চলে গেছে। হক্কেরেই চইল্যা গেছে।

সাবুর খিচুড়ি। সুজির খিচুড়ি। হবিষ্যঘরের নিরামিষ "দলা"। ডাইল ছড়ানো তরকারি। এঁচড়ের ডালনা। মোচা আর থোড়ের ঘণ্ট। থানকুনি পাতার ঝোল। পাট পাতার ঝোল, কাঁঠালের বিচি ভাজা, সজনে কুমড়ার তরকারি, কাউঠ্যার মাংস। শুঁটকি মাছ, ভাপা ইলিশ, একমন কাতলা মাছের মুড়ার মুড়িঘণ্ট। মাছের তেলের বড়া ; মাছের ডিমের বড়া। হাঁসের ডিমের কষে পেঁয়াজ-শুকনোলঙ্কা-রসুন বাটা দিয়া লাল ঝোল, সঙ্গে ডুমো ডুমো আলু। চিতল মাছের এক-ফিট চওড়া তেলওয়ালা পেটি, পদ্মা ; কী ব্রহ্মপুত্রর। মুইঠ্যা। বাটা মাছের বা ভেটকি মাছের বা পার্শে মাছের হলুদ-কাঁচালঙ্কা-ধনেপাতা দেওয়া পাতলা ঝোল। ভেটকির কাঁটা চচ্চরী।

কষা মাংস ; দই মাংস। কালোজিরে-কাঁচালঙ্কা- রসুন-পেঁয়াজ দেওয়া মুসুরির ডাল। এখনও রসুন কালোজিরে আর শুকনো লঙ্কা সমবার দেওয়ার গন্ধ ভাসে নাকে।

পুলি পিঠা, ক্ষীরের ও নারকোলের চিতই পিঠা, মাদারীপুরের ঝোলা গুড় দিয়া পাটিসাপ্টা এবং নারকোলের চন্দ্রপুলি।

আর কত্ত কম্যু কও ? মন বড় খারাপ হইয়া যায়।

সবই গ্যাছে গিয়া। বাঁইচ্যা থাইক্যা আর সুখ নাই গো কইন্যা। দুখের কথা কম্যু কারে ? বৌ ম্যামসাহেব, মাইয়ারা ম্যামসাহেব, ভাইবৌ সকলডি ম্যামসাহেব। দিশি মানষের দুঃখ কারে কই কও ?

কি করেন বাহে ?

না করি কোনো।

অর্থাৎ কিছুই করি না। এবং কিছু করতে চাইও না। বাঙালীর জাজ্বল্যমান উদাহরণ !

সেই ট্র্যাডিশনের মানুষটারে কী খাটনিই না খাটাইতেছে এই সংসারে। মাসের মধ্যে পনেরোডা দিন থাকি দিল্লি-বম্বে। আর পনেরোডা দিন সকাল নয়ডা থিক্যা রাত সাতডা অবধি জীবিকার লইগ্যা কাম করি। তার পর, জীবনের কাম। মানে ল্যাখা-পড়া, গান, ছবি আঁকা। কী খিটক্যাল ! কওতো দেহি !

বুড়া হইয়্যা গ্যালাম খাইট্যা খাইট্যা। কেউ যদি আমারে দত্তক নিতো তবে গান, ছবি আঁকা হেইসব মনের সুখে করন যাইতো। বড়ই কষ্ট আমার। নিবা তুমি ?

পদ্মাপারে যদি একফালি জমি দিতো কেউ, তবে বাকি জীবনডা সেইখানেই মাটি-কামড়াইয়া পইড়্যা থাকতাম। হত্যই কইতাছি !

তোমাগো উপর আমার খুব অভিমান হয় এই কারণে যে, তোমরা বাংলা ভাষাটা পশ্চিমবঙ্গরটাই নিল্যা পুরাপুরি।

শিখ্য ভাষাডা নিলা নিলা, ব্যাশ করছ। কিন্তু নিজেগো কথ্য ভাষাটারে গলা টিইপ্যা মাইরা ফ্যালাইতাছো ক্যান ?

"আইসেন আইসেন" ! "বইস্যেন বইস্যেন" ! কইলে যতটুক ভালোবাসা পেরকাশ পায়, যতডা আপ্যায়ন ঝরে ; পশ্চিমবঙ্গীয় নুন, নেবু, নঙ্কা, নুচির ভাষা 'আসুন-বসুন'-এ কি

তা কখনওই বোঝান যাইব ? কথ্য ভাষাটারে পেত্যেক জিলাতেই অবশ্যই বাঁচাইয়া রাখন উচিত আছিল তোমাগো। এখনও সময় আছে। চেষ্টা কইরো।

হে মণি ! তুমি কি আমারে "খারাপ বাসো" ?

"ভালবাসা" শব্দটা পৃথিবীর সব ভাষাতেই আছে। অতি সাধারণ শব্দ। কিন্তু খারাপ-বাসা ? একমাত্র বাংলাদেশের বরিশালে। তয়, কইতাছি কি ?

এই মধুর হৃদয়স্পর্শী ভাষাকে তোমরা ফেলে দিলে ? পরের প্রজন্ম তো এইভাষাতে কথাও বলবে না আর। ভাবলেও আমার মন ভারী খারাপ হয়।

একেবারে শিশুকালে আমি রংপুরের পাঠশালায় পড়েছি। 'ধাপ'-এ ডিমলার রাজার বাড়ির ঠিক উল্টোদিকে যে পাঠশালা ছিল, সেই পাঠশালাতে।

আমাদের বাড়িও ছিল তার কাছেই। শংকামারীর শ্মশানে যাবার রাস্তায়। শেষ বাড়ি, শহরের। শুনেছি, এখন সেখানে রংপুর এয়ারপোর্ট হয়েছে।

দেখার সাধ হয় একবার।

আমরা সাধারণ মানুষ। না ছিল বিত্ত। না কৌলিন্য। যে-কোনো মানুষেরই মতো ছিলাম।

বড়লোকের ঘরে জন্মানো, বড়লোক বাবার পরিচয়টা কোনো পরিচয়ই নয়। যে-মানুষের নিজস্ব পরিচয় নেই, সে মানুষই নয়। আমি সাধারণ। সাধারণ্যেই আমার গর্ব।

পাঠশালার পাট চুকিয়ে, পরে রংপুরের জিলা স্কুলেও পড়েছি।

বরিশাল জিলা স্কুলেও পড়েছি।

রংপুরেই শেষ দেশ ছিল। বরিশালে বাবা চাকরীব্যপদেশে বদলি হয়ে গেছিলেন সেই সুবাদে গেছিলাম।

আরও কি জানতে চাও কইয়া ফ্যালাও। তোমারে জানাইমু।

ইতি—

তোমার লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com

ধানমণ্ডি
সাতাশে ফেব্রুয়ারী ১৯৯২
ঢাকা
বাংলাদেশ

লেখক,

যে ফুল হবারই যোগ্যতাই রাখেনা সে তোড়া, গুলদস্তাঁ বা তবাসুম হবার যোগ্যতা কী করে রাখবে ? তবে আপনার যা খুশি তাই হবে।

চিঠির জন্যে ডাকবাক্স দেখতে দেখতে মরে গেলাম। হাসান ভাই, আমাদের মহল্লার ডাকপিওন তো একদিন হেসেই ফেললেন আমার অবস্থা দেখে।

আরেকদিন একটা কালো বিচ্ছিরী টিকটিকির গায়ে হাত পড়লো। ম্যাগো ! গা রিরি করে উঠলো। সেটা যে কী করতে ডাকবাক্সর মধ্যে ঢুকে বসেছিল, তা সেই জানে !

আপনার "হলুদ বসন্ত" উপন্যাসে (এটিই কি আপনার প্রথম উপন্যাস ?) পড়েছিলাম যে, নায়কের খুব ইচ্ছা ছিল যে, সে নায়িকা নয়নার চানঘরের টিক্‌টিকি হয়। কিন্তু আমার কপাল ! এই বেরসিক টিকটিকিটা কেন যে ডাকবাক্সর মধ্যে ঢুকতে গেল তা কে জানে !

এতো দেরী করে উত্তর দিলে মন ভারী খারাপ লাগে। জানি যে, আমার মতো পাঠিকা আপনার অনেকই আছে কিন্তু আমার তো আপনিই একা !

আমার খুব ইচ্ছে করে, একটি একটি করে আপনি আমাকে আপনার প্রত্যেকটা উপন্যাস ও ছোটগল্পের পটভূমি এবং অনুষঙ্গ সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখুন। একজন লেখককে পুরোপুরি বুঝতে এই Information এর খুবই প্রয়োজন। আমি একটা Anthology করে রাখব তা থেকে। যা পরে আপনার সমস্ত পাঠক-পাঠিকারই এবং গবেষকদেরও কাজে লাগবে।

রাখবেন কি আমার এই অনুরোধ ?

এখন বসন্ত। বুড়ি গঙ্গার ধারে কাল বিকেলে গেছিলাম আমার এক বন্ধুর সঙ্গে। সে খুব ভাল টেনিস খেলে। সেও আপনার লেখার খুব ভক্ত। আপনি কি কখনও কোনো খেলাধুলো করেছেন ?

ও বলে, আপনার লেখা পড়ে মনে হয় যে, করেছেন। আমি বলি, এমন মনে হওয়াটা

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

বোকা-বোকা। ও বলেছে, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে। দেবেন উত্তর ?

অনেকের ধারণা মেয়েরাই আপনার লেখার বেশি ভক্ত। তাঁরা হয়তো আপনার প্রতি অবিচার করেন। কথাটা ঠিকও নয়। ঢাকাতে আমার ছোটবোন (তার নাম সরিফুন এবং কেয়া অথবা খেয়াও বটে।) এবং তাদের বন্ধুরা মিলে একটি 'ফ্যান ক্লাব' করবে মনস্থ করেছে। ওদের কি আপনি একটি আশীর্বাণী পাঠাবেন ?

এখনও বইয়ের পূর্ণ তালিকা পাঠালেন না।

"একটু উষ্ণতার জন্যের" পটভূমি সম্বন্ধে সবচেয়ে আগে জানাবেন।

ভালো থাকবেন।

ইতি—

তোড়া।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

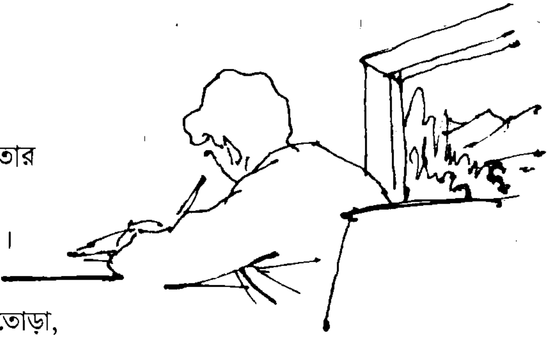

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ।

বসন্ত মার্গ
নিউ দিল্লি

কল্যাণীয়াসু তোড়া,

সরিফুনকে বোলো যে "ফ্যান ক্লাব-টাব"-এর পাগলামি যেন না করে।

সাহিত্যিকদের সঙ্গে এখনও সিনেমার নায়ক বা খেলোয়াড়দের তফাৎ আছে। এখনও আছে। কতদিন আর থাকবে, তা বলতে পারি না। থাকবে কি না, সেটা সাহিত্যিকদেরই উপরে নির্ভর করবে।

'আশীর্বাণী' কথাটা শুনলেই আমার সুড়সুড়ি লাগে। তাতো রাজনৈতিক নেতা আর আমলাদেরই প্রেরোগেটিভ।

কলকাতা থেকে এয়ারপোর্টের পথে বেরোবার মুহূর্তে তোমার চিঠিটি পেলাম। দিল্লি এসেই তিনদিন এতো কাজ ছিলো যে, বলার নয়। মক্কেলরা বাইরে নিয়ে গেলেই এমন খাটায় যে কী বলব!

দেরীর জন্যে কিছু মনে কোরো না।

তোমার পুরো পরিচয়তো দিলে না।

তুমি কি করো? কোন ডিসিপ্লিনের ছাত্রী ছিলে কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে? তোমার বাড়িতে কে কে আছেন? আমার বইয়ের সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন কে? আমার কোন কোন বই তোমার সবচেয়ে খারাপ লেগেছে?

শেষ প্রশ্নটির উত্তর পাওয়াটা খুবই জরুরী। কারণ, জানো তো, "The Strength of a Chain is its weakest link." মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান কবি, দার্শনিক, গদ্যকার কাহলিল জিব্রান (উচ্চারণটা গিব্রান না জিব্রান এ নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে। তাঁরা তাঁর কথা পড়ে থাকুন আর না থাকুন, কবির নামের সঠিক উচ্চারণটা কি? তা নিয়ে মারদাঙ্গা করতেও রাজী। কিন্তু অন্য কথা বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন :

"উ হ্যাড বীন টোল্ড দ্যাট, ইভিন লাইক আ চেইন য়্যু আর অ্যাজ উইক অ্যাজ ইটস্ উইকেস্ট লিংক।

www.boiRboi.blogspot.com

দিস ইজ বাট হাফ দ্যা ট্রুথ। উ্য আর ওলসো অ্যাজ স্ট্রং
অ্যাজ ইটস্ স্ট্রংগেস্ট লিঙ্ক।"

কী চমৎকার না?

বড়মানুষদের এই বোধহয় লক্ষণ। যুগ যুগ ধরে যা আমরা জেনে আসছি, শুনে আসছি, মেনে আসছি তাকে নিজের বিচার বিবেচনা দিয়ে চুলচেরা করে বিচার করে তবেই সেকথা মানেন তারা। অন্য সকলে মেনে নিচ্ছে বলেই যে তাকেও তা চোখবুঁজে মেনে নিতেই হবে এমন সাধারণ ধ্যান-ধারণাতে সেই সব মানুষ কখনওই বিশ্বাস করেন না। দে হ্যাভ দ্যা কারেজ অফ দেয়ার কনভিকশান।

তারপরে বলছেন ঃ

"টু মেজার উ্য বাই ইওর স্মলেস্ট ডিড ইজ টু উইকেন দ্যা পাওয়ার অফ ওশান বাই দ্যা ফ্রেইলিটি অফ ইটস ফোম।

টু জাজ উ্য বাই ইওর ফেইলিওরস্ ইজ টু কাস্ট ব্লেম
আপন দ্যা সীজনস্ ফর দেয়ার ইনকনসিকট্যান্সী"।

তুমি "একটু উষ্ণতার জন্যের" পটভূমি সম্বন্ধে জানতে চেয়েছো। বলতে হয়, এটি একটি Strange coincidence! স্বল্পদিনের মধ্যেই, এবছরেই, দোলের সময়েই হয়তো ম্যাকলাস্কিগঞ্জে যাব। এবং গেলে, সেই উপন্যাসের সুকুমার বোস যে কটেজটিতে থাকতেন, ছুটি ও রমা যে কটেজে এসে ছিলেন, যে কটেজের মালি আর মালি-বৌ এর নাম ছিলো মানি ও মুঞ্জরী, সেই কটেজেই বোধহয় গিয়ে থাকব।

যদি তাই হয়, তবে তোমাকে সেখান থেকেই চিঠি লিখবো। আমার পক্ষেও সেই যাওয়াটি এক মনোরম অভিজ্ঞতা হবে। ম্যাকলাস্কিগঞ্জ এবং ঐ কটেজটিতো "একটু উষ্ণতার জন্যে"র Frame এ চিরদিনের জন্যে বাঁধানো হয়েই গেছে।

কিন্তু তোমার লেখকের পক্ষে তা পুনরাবিষ্কার হবে।

পরে তোমাকে চিঠি দেব বড় করে।

ভালো থেকো।

এমন দায়সারা চিঠি লিখতাম না। কিন্তু পাছে আবারও অমন চাঁপার কলির মতো আঙুলে টিকটিকি কামড়ায়, সেই কথা ভেবেই তড়িঘড়ি উত্তর দিলাম।

ইতি—

লেখক।

পুনশ্চ ঃ আমি বেশি লিখি না। প্রকাশক সংখ্যাও অত্যন্তই সীমিত। মূল প্রকাশক মাত্র দুজন। তাঁদের নাম ঠিকানা নিচে দিলাম। একটি পোষ্টকার্ড ফেলে দিলেই তাঁরা শুধু আমারই নয়, হয়তো সবলেখকের বইয়েরই পূর্ণ তালিকা পাঠিয়ে দেবেন।

(ক) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা—৭০০ ০০৯

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

(খ) দে'জ পাবলিশিং

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

এঁরা ছাড়াও দুজন প্রকাশক আছেন যাঁরা আমার সামান্য কিছু বই প্রকাশ করেছেন। তাঁরা হলেন—

(১) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

(২) সাহিত্যম্

১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ

লেখক,

চিঠি পেলাম।

আপনি এতো ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করেন কেন ?

যে-ভাষার জন্যে আমরা এতো দাম দিলাম সেই ভাষার দৌর্বল্য তো নেই কিছু। তাতে ইংরিজি মেশাবার দরকার কি ?

আমি উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্রী ছিলাম। বরিশাল থেকে বি. এ পাশ করে ঢাকাতে এসে এম. এ করি। তারপর ডক্টরেট। গত তিনবছর হলো রাবার গাছ নিয়ে গবেষণা করছি। একটি বেসরকারী সংস্থাতে। পরিবেশ দূষণ রোধের জন্যে রাবার গাছ এক নতুন ভূমিকা নিয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে, আমার গবেষণা, এক বিশেষ প্রাধান্যও পেয়েছে।

আমার বাবা মনস্তত্ত্বর অধ্যাপক ছিলেন বরিশালেই। আমি যখন তিনবছরের তখনই বাবা চলে যান। বিশেষ পাইনি তাঁকে। কোনো পুরুষেরই স্নেহ, সঙ্গ অথবা সাহচর্যই পাইনি। যখন তার খুবই দরকার ছিল।

আপনি তসলিমা নাসরিনের লেখা পড়েছেন ? আমার ছেলেবেলার অনেক অভিজ্ঞতার সঙ্গেই তাঁর অভিজ্ঞতার মিল আছে। তবে তাঁর মতন ভাষা এবং সাহস আমার নেই। থাকলে, আপনিই আমাকে খুঁজে নিতেন। আমি আপনার জন্যে এতো দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে বসে থাকতাম না।

হয়তো এই কারণেই আপনার লেখা আমার জীবনে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। অবলম্বন হয়েছিল আমার। আপনার সাহিত্যের সটান ঋজু গাছটিকে জড়িয়ে ভীরু স্বর্ণলতার মতো আমি বেড়ে উঠেছিলাম।

আপনি শীগগিরি ম্যাকলাস্কিগঞ্জে যেতে পারেন এবং গেলে ওখান থেকে আমাকে লিখবেন জেনে দারুণ উত্তেজিত বোধ করছি। ওখান থেকে বড় চিঠি দেবেন। অনেকদিন পর পর লিখলেও রাগ করব না। কিন্তু আমাকে আপনি সবসময়েই বড় চিঠি দেবেন। 'তুমি কেমন আছ ? আমি ভাল আছি'র মতো চিঠি নয়। সাহিত্যিকের চিঠি। যে-কোনো প্রসঙ্গর

www.boiRboi.blogspot.com

অবতারণা করবেন তাতে।

আপনাদের মুখ থেকে আমাদের মতো পাঠিকাদের কত কীই যে জানতে ইচ্ছে করে তা কী বলব ! আপনারা তো অধ্যাপক, দার্শনিক, সত্যদ্রষ্টা এবং মনস্তাত্ত্বিকও ; সব একই আধারে।

ছোট চিঠিতে আমার মন ভরে না।

আপনার বইয়ের সব প্রকাশকদের ঠিকানা পাঠানোর জন্যে ধন্যবাদ জানবেন। চিঠি, ইতিমধ্যেই লিখে দিয়েছি। জানি না, তাঁরা পাঠাবেন কিনা। সন্দেহ হয়, পাঠাবেন বলে।

বাঙালী ব্যবসাদারেরা যদি ব্যবসাই না করতে চান তাহলে কীই বা বলার থাকতে পারে ! এমন ব্যবসাদারীর জন্যেই তো বাঙালীর এই অবস্থা আজকে।

ভাল থাকবেন।

ইতি—
ফিরদৌসী/তোড়া।

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা
৭০০ ০১৯

তোড়া,

কল্যাণীয়াসু,

তুমি ঠিকই বলেছো। ইংরিজি শব্দর মিশেল দেওয়াটা আমার অন্যায় হয়েছে। ক্ষমা কোরো।

আসলে পুরোদস্তুর লেখক তো নই! পার্টটাইম লেখক। ঐ দ্যাখো, আবার ইংরিজি ঢুকে পড়েছে। কিন্তু পার্টটাইম যে, সেকথাটা সত্যি।

যখন কলকাতাতে থাকি এবং আমার লেখালেখির (এবং শোবার ঘরও বটে!) ঘর থেকে চিঠি লিখি কাউকে, তখন একটু মনে রাখার চেষ্টা করি যে, আমি একটু-আধটু সাহিত্যকর্মও করে থাকি। তখন সচেতনভাবে চেষ্টা করি, যথার্থ কবি-সাহিত্যিকদের মতো বাংলা লিখতে।

যদিও পারি না। কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাই।

"যথার্থ" মানে, যাঁরা বাংলা নিয়েই বি. এ, এম. এ পড়াশুনা করেছেন। বাংলা সংবাদপত্রেই কাজ করেন এবং সারাদিন বাংলাতেই লেখালেখি করেন।

দিনে-রাতের দশঘণ্টা তো ইংরিজিতেই ভাবতে হয়, বলতে হয়, লিখতে বা ডিকটেশান দিতে হয়। তাই ইংরিজির বেনোজল ঢুকে পড়েই। আটকানো মুশকিল হয়।

কখনও বা আবার ভাবি, মনের যেমন দরজা জানালা, যে-কোনো ভাষারও তেমনই; সে সব খোলা থাকাই হয়তো ভাল। অন্যান্য ভাষা এসে সমৃদ্ধ করতে পারে তাহলে সেই আগল-খোলা ভাষাকে। ইংরিজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, গ্রীক, আরবি, ফারসি, উর্দু আসুকই না সব ভাষা। ক্ষতি কী! বাংলা ভাষা তো আর আগেকার দিনের হিন্দু বিধবা নয় যে, পরপুরুষকে দেখাও তার বারণ হবে।

সাম্প্রতিক অতীতে আধুনিক বাংলাভাষা যেমন অত্যধিক সরলীকৃত অবস্থাতে এসে পৌঁছেছে সেটা ভাষার ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকারকও হতে পারে বলে আমার ধারণা। ভাষা; চিন্তার বাহন। বক্তব্য-প্রকাশের বাহন।

অনেক গল্প-উপন্যাসের ভাষাই সচেতনভাবেই অন্যরকম করেছি। কোথাও হিন্দুস্থানি

www.boiRboi.blogspot.com

ও উর্দু মিশ্রিত বাংলা ব্যবহার করেছি, কোথাও সংস্কৃত ঘেঁষা সাধু বাংলা, তৎসম শব্দের প্রাধান্য যেখানে ; কোথাও দক্ষিণ বাংলা বা পূর্ব বাংলা (বাংলা দেশ) বা উত্তর বাংলার (বাংলাদেশ) ভাষা। লেখাকে জীবন্ত করতে, সাহিত্যর পাত্র-পাত্রীকে জীবন্ত করতে, স্থায়ী করতে, ভাষার হেরফের অবশ্যই করা দরকার।

এটি আমার মত। তবে সে মত ভ্রান্তও হতে পারে।

আধুনিক বাংলা ভাষাতে যে তৎসম শব্দ প্রায় ব্যবহার করাই হয় না এতে বাংলা ভাষা প্রসাধিত হয়েছে যে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চারিত্রিক সৌন্দর্য বেড়েছে কি বাড়েনি, তা নিয়ে তর্কর অবকাশ আছে। বুদ্ধির এবং চরিত্রর প্রসাধনের চেয়ে বড় প্রসাধন, কী ভাষার, কী নারীর, আর কিছুই হতে পারে না। সেই সৌন্দর্যই আসল সৌন্দর্য। এই চরিত্র বলতে "সতীপনার" কথা বলছি না। সামগ্রিক চরিত্রর কথাই বলছি। আত্মসম্মানজ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা, সাহস ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে মানুষের যে চরিত্র, ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, তার কথাই বলছি।

তবে একটা কথা ঠিকই ! বাংলাভাষা মান পেয়েছে বাংলাদেশেরই জন্যে। তোমরাই এ-ভাষাকে পৃথিবীর দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছ। বুকের রক্ত আর নারীর সম্মানের মূল্যে।

আমরা পশ্চিমবঙ্গীয় বুদ্ধিজীবিরা, যাঁরা, মাড়োয়ারী গুজরাটি পাঞ্জাবীর চাকর, যাঁরা সর্বজ্ঞ, যাঁরা রাজ্যে সিংহ এবং কেন্দ্রে মুষিক, যাঁরা রাজ্যে ঔদ্ধত্যর সংজ্ঞা আর কেন্দ্রে আশৈশব ভিক্ষাপাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ভিখিরি ; কতটুকুই বা ভেবেছি বা করেছি বাংলাভাষার জন্যে ?

আজ থেকে পঞ্চাশবছর পরে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদের অনেকেই হয়তো বাংলা পড়তে-লিখতেই পারবেন না। কে জানে ! উচ্চবিত্ত বাঙালিরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান হয়ে গেছেন। এমন "সাহেব" তুমি মারাঠী, তামিল, তেলেগু কোনো ভাষাভাষীর মধ্যেই পাবে না। এদিকে নিম্নবিত্তদের, বইতো দূরের কথা ; বাংলা খবরের কাগজ কেনারও পয়সা নেই। ভবিষ্যতে আরও থাকবে না। মাড়োয়ারী, গুজরাটির বাড়িতে ঠিকে ঝি, রাঁধুনি আর ঠিকে চাকরের কাজ করবে পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালী।

তাঁরা ভাষা চর্চা করবেন কখন ? কিভাবে ? অর্থনৈতিক অবস্থাও একটা বড় ব্যাপার।

সরস্বতীই শুধু আমাদের ছিলেন। লক্ষ্মী কোনোদিনই ছিলেন না। হঠাৎ লক্ষ্মীর দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে না পেলাম আমরা লক্ষ্মীকে আর চিরতরে হারালাম সরস্বতীকেও। এত বড় দুর্দৈব কোনো জাতির জীবনে এসেছে কিনা জানি না।

কিন্তু কার ভাবার সময় আছে তা নিয়ে ! বলো ?

ভবিষ্যতে "লিখ্য" বাংলাভাষা হয়তো বেঁচে থাকবে শুধুমাত্র বাংলাদেশেই, তোমাদেরই নিরাপদ হাতে, রাস্ট্রীয় ভাষার উজ্জ্বল মর্যাদায়। তোমাদের কাছে আমার, আমাদের, কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। যাঁরই মনুষ্যত্ব আছে, তাঁরই স্বীকার করা উচিত এই সত্যকে।

তোমাকে, তোমাদের অনেক ধন্যবাদ।

ইতি—লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা- ৭০০ ০১৯

তবাসুম,

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে যে কবিতা লিখতেন তা কি জানতে ?

গতকাল হঠাৎ একটি বই হাতে এসে গেল। কবিতা অবশ্য খুব যে একটা উচ্চমানের এমন আদৌ নয়। তবু মুহাম্মদ আলী যদি গান করেন তবে তো তাঁকে কিছুটা "হ্যাণ্ডিকাপ" দিয়েই শুনতে হবে। এক ক্ষেত্রে কৃতী মানুষের অন্য ক্ষেত্রে DABBLE করার PRE-ROGATIVE জন্মেই যায়। সদাশয় মানুষে ক্ষমার চোখেই দেখেন ঐ মাপের গুণীদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় গুণপনা।

<u>দ্যা আর্নেস্ট লিবারলেস ল্যামেন্ট</u>

"আই নো দ্যাট মঙ্কস, মাস্টারবেট অ্যাট নাইট,
অ্যাণ্ড পেট ক্যাটস স্ক্রু,
দ্যাট সাম গার্লস বাইট,
অ্যাণ্ড ইয়েট
হোয়াট ক্যান আই ডু
টু সেট দেম রাইট ?"

<u>অ্যাডভাইস টু আ সান</u>

"নেভার ট্রাস্ট আ হোয়াইট ম্যান
নেভার কিল আ য়্যু
নেভার সাইন আ কনট্রাক্ট
নেভার রেন্ট আ প্যু
ডোন্ট এনলিস্ট ইন আর্মিজ ;
নর ম্যারী মেনি ওয়াইভস,
নেভার রাইট ফর ম্যাগাজিনস,

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

নেভার স্ক্র্যাচ ইওর হাইভস্,
অলওয়েজ পুট পেপার অন দ্যা সীট,
ডোন্ট বীলিভ ইন ওয়রস,
কীপ ইওরসেল্ফ বোথ ক্লীন অ্যাণ্ড নীট
নেভার ম্যারী হোড়স,
নেভার পে আ ব্ল্যাকমেইলার
নেভার গো টু ল।
নেভার ট্রাস্ট আ পাবলিশার
অর উই উইল স্লিপ অন স্ট্র
অল ইওর ফ্রেণ্ডস উইল লীভ উ্য
অল ইওর ফ্রেণ্ডস্ উইল ডাই
সো লীড আ ক্লীন অ্যাণ্ড হোলসাম লাইফ
অ্যাণ্ড জয়েন দেম ইন দ্যা স্কাই।"

আর নাই বা শুনলে।

হেমিংওয়ে যে কবিতা বুঝতেন তার সবচেয়ে বড় প্রমান এই যে, তাঁর নিজের জীবদ্দশায় কবিতা নিয়ে আদৌ বাড়াবাড়ি করেননি। এই সংযম প্রকৃত আর্টিস্টেরই লক্ষণ।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল যে, একদিন মানিকদা আমাদের বালিগঞ্জ পার্ক রোড-এর ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। খেতে বলেছিলাম সস্ত্রীক ওঁকে।

আমি বললাম, মানিকদা, পিয়ানো আছে। একটি গান যদি আমাদের শোনাতেন!

তোমরা হয়তো জানো না কী অসাধারণ গান গাইতে পারেন উনি।

উনি না, না করলেন। "না" বলার পরও আমি পীড়াপীড়ি করাতে বললেন "দ্যাখো বুদ্ধদেব, কিছু জিনিস তো আমার নিজস্ব থাকবে।"

কথাটি এতো ভাল লেগেছিলো যে, কী বলব।

'নিজস্ব' কিছু জিনিস বাঁচিয়ে রাখা এবং লোকচক্ষুর আড়ালে রাখাটা অত্যন্তই কঠিন কাজ। চানঘরের গানেরই মতো ; ছবির মতো ; এসব অন্যকে না দিয়ে দেওয়াই ভাল।

মানিকদার অনেক গুণ নিয়ে মানুষে মাতামাতি করেন কিন্তু কেউই বলেন না যে, মানুষটি কত বড় বাঙালী ছিলেন। ওঁর শুদ্ধ বাঙালীত্বে পায়জামাটি ছাড়া আর কোনোই খুঁৎ ছিল না। অত ভদ্রমানুষ খুবই কমই দেখেছি।

যেদিন উনি আমাদের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন সেদিনই আমার বাবা না জেনে এবং ফোন না করেই আমাদের কাছে বেড়াতে এসেছিলেন।

বাবা ড্রয়িং রুমে ঢুকতেই মানিকদা দাঁড়িয়ে উঠে বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন।

যদিও বাবার সঙ্গে আমার শ্বশুরবাড়িতে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে ওঁর দেখা হয়েছিল বহুবারই তবু বাবা সেই সন্ধ্যার অভাবনীয় সৌজন্যের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। এবং

www.boiRboi.blogspot.com

সত্যিই অভিভূত হয়ে গেছিলেন।

শ্বশুরবাড়ির সূত্রে মানিকদা আমার দূরের আত্মীয়ও ছিলেন।

সত্যজিৎ রায়ের মতন পৃথিবী বিখ্যাত মানুষ সারা জীবনে নিজের জন্যে একটি নিজাবাস-এর বন্দোবস্ত করে যাননি। লক্ষ্মীর সাধনা তাঁর ছিলো না। যথার্থই সরস্বতীরই উপাসক ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রায় পরিবারের তিনপুরুষ ভাড়া বাড়িতেই কাটিয়ে গেছেন। চতুর্থ পুরুষও এখনও তাই রয়েছেন। এতে তাঁদের মান-সম্মানের কোনো লয়-বৃদ্ধি ঘটেনি।

এই কথাটি বললাম এই জন্যে যে, আকছার দেখতে পাই যে অত্যন্ত সাধারণ মানের কবি, সাহিত্যিক, গায়ক অথবা বাদক অথবা চিত্রপরিচালক সকলেই সরকারী আবাসন-এ ফ্ল্যাট বা সরকারী জমির জন্যে লালায়িত এবং তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদ যাই হোক না কেন, মন্ত্রী ও আমলাদের এ ব্যাপারে তাঁরা কেউই তৈলসিঞ্চন করতে একটুও দ্বিধা করেন না।

এখানে এখন বৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষার নয়। প্রত্যেক ঋতু বদলের সময় একবার যে-বৃষ্টি নামেই। প্রতিবছরই প্রতি ঋতুর শেষে এলোমেলো ঝোড়ো হাওয়া বয়, যে বৃষ্টি ফুল, পাতা এবং মনও ঝরায় ; সেই বৃষ্টি এখন। গ্রীষ্ম আসছে। এসে গেল।

অবশ্য এই সব প্রাকৃতিক ফেনোমেনা, যে-সব ছেলেবেলা থেকেই লক্ষ করে আসছি। তবে, এখন তো গ্রীন-হাউস এফেক্ট, সাদ্দাম হুসেনের তেলের কূপ জ্বালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদিতে কোনো প্রাকৃতিক ফেনোমেনারই আর অস্তিত্বই নেই। আবহওয়া এখন খামখেয়ালি হয়ে গেছে। সারা বিশ্বেই।

ভালো থেকো।

ইতি—লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা- ৭০০ ০১৯

তোড়া।

কল্যাণীয়াসু,

আমার গুলদস্তাঁ,

যখনই বাইরে থেকে ঘরে ফিরি তখনই লেখাপড়ার ছোট্ট কোণটিকে আরও বেশি করে ভালো লাগে।

দেশে বিদেশে যেখানে যত মানই পাই না কেন, সেই সব জায়গার কোনো জায়গাই নিজস্বতো নয়! নিজস্ব জায়গা, যে-জায়গাতে আমি টায়ে টায়ে কুলিয়ে যাই, যে জায়গাটিতে আমার প্রাণারাম ; তা এই লেখার এবং পড়ার কোণ। যাকে, ইংরিজিতে বলি "স্টাডি"।

যেমন ভেবেছিলাম, বম্বে থেকে ফিরে তেমনই দেখলাম, তোমার দুটি চিঠি অপেক্ষা করে আছে।

তুমি শুনে সুখী হবে যে, সব চিঠি ফেলে তোমার চিঠিই সবচেয়ে আগে খুলি।

তোমার নিজস্ব নানা সমস্যার সমাধান চেয়ে তুমি আমাকে দার্শনিকের, উপদেশদাতার মর্যাদা দাও। বিভিন্ন লেখা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে চেয়ে শ্লাঘা বাড়াও ; আহলাদিত করো, বাঁচার ইচ্ছা জাগাও, বোঝাও যে, কোনো বিশেষ নিজস্ব কারণে বাঁচাটা জরুরী না হলেও তোমাদের জন্যেও আমার আরও কিছুদিন বেঁচে থাকাটা অত্যন্তই দরকার। নিজের সার্থকতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ, অনিশ্চিত মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়াবার জন্যে এই বোধ যে কতখানি সহায়ক হয় ; তা তোমাকে কী বলব!

তুমি লিখেছ যে, তোমার সহোদরা সরিফুনের বিয়ে। খুবই খুশি হলাম শুনে।

সরিফুনের নাম হওয়া উচিত ছিলো প্রজাপতি। তিতলি। অথবা চিঙ্গারি। উর্দু চিঙ্গারি মানে তো বাংলাতে স্পন্দন, তাই না?

যৌবন যে বিধাতার কী অমূল্য দান তা চোখের সামনে তোমাকে বা সরিফুনকে বা আরও অন্য অনেককে দেখে নতুন করে বুঝি। এতো ভালো লাগে!

www.boiRboi.blogspot.com

যৌবনের মতো সংক্রামক অসুখও আর বেশি নেই। আমার মতো বিকেলে-পৌঁছনো মানুষকেও যৌবন যেন প্রবল পরাক্রান্ত ব্যাধিরই মতো আক্রমণ করে। অঙ্গে অঙ্গে ঝংকার তোলে। মনের তন্ত্রীতে বাঁশি বাজায়।

সরিফুনকে যেমন প্রজাপতি বলে ডাকতে ইচ্ছে করে তেমন তোমাকেও ইচ্ছে করে অন্য নামে ডাকতে। তোমার নাম তো ছিলো তোমারই। আমি তো করে দিলাম তোড়া! তুমি তো একটি মাত্র ফুল নও, অনেকই ফুলের সমষ্টি। যেদিন থেকে নতুন নাম দিয়েছি, সেদিন থেকেই ফুলদানি খোঁজার শুরু আমার।

এই নামের ব্যাপারে প্রত্যেক মানুষেরই একটু খুঁতখুঁতানি থাকেই। কারণ, নিজের নামটা তো নিজে কেউই আর দেন না। মানে, দিতে পারেন না, তাই। মা-বাবা বা, আম্মী-আব্বা, ফুফি, মুমানীজানেরাই তাঁদের ইচ্ছেমতো নাম দেন নবজাতককে।

নিজের নামটা কোনো নবজাতকেরই নিজের পছন্দ কী নয়, তা জানা বা জানানোর উপায়ও তো আদৌ থাকে না!

পোষাকি নামটা এফিডেবিট করে নিজের পছন্দমতো বদলে দেবার অধিকার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবার সময়ে কী তারও আগে প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকেই দিলে বেশ হয়। তাই না?

আফ্রিকার মাসাই উপজাতিদের মধ্যে দারুণ সুন্দর প্রথা চালু আছে একটি। তোমার বাবা-মায়ের দেওয়া নাম হয়তো "এনগাই"। তুমি 'ক' গ্রামে মানুষ খুন করে দিয়ে অথবা এক তরুণ যুবাকে বলাৎকার করে 'খ' গ্রামে চলে গিয়ে "বেনগাই" নাম নিয়ে নিলে। মানুষ-টানুষ খুন না করলেও, যখনই নিজের নামটা পুরোনো-পুরোনো বা টক-টক লাগবে অমনি তোমার খুশিমতো অন্য একটি নাম রেখে দিতে পারো, বাসি শাড়িরই মতো পুরোনো নামটি ফেলে দিয়ে।

কী চমৎকার বলো তো!

ঘরের আসবাবের অবস্থান পাল্টালেই মনে হয় নতুন বাড়িতে এলাম। আর নিজের নাম পাল্টে দেওয়া গেলে তো নিজেকে পুরোপুরি নবীকৃতই করা যায়। তাই নয়?

ব্যাপারটা ভাবলেই আমি রোমাঞ্চিত বোধ করি।

"ইলমোরাণ্দের দেশে" কি তুমি পড়েছো? পূর্ব-আফ্রিকার মাসাইদের নিয়ে অ্যানথ্রপলজিকাল কাজ ওটি। ঐরকম অ্যানথ্রপলজিক্যাল কাজ করেছি আরও কিছু উপন্যাসে। পুরোপুরি উপন্যাস না হলেও ঐ মোড়কেই পরিবেশন করেছি। কারণ অ্যানথ্রপলজিক্যাল কাজের কথা শুনলেই এমনিতে পাঠক পড়তেই চাইতেন না হয়তো। কিন্তু প্রায় সমস্ত বইই, যে-সব বইয়ে কমবেশি অ্যানথ্রপলজিক্যাল কাজ করেছি, সবচেয়ে বেশি সমাদৃত হয়েছে। তাই পাঠক-পাঠিকার উপরে আস্থা আমার দিনে দিনেই বাড়ছে।

"কোয়েলের কাছে" তে এবং "কোজাগর"-এ বিহারের পালামৌ জেলার ওরাঁও উপজাতিদের কথা আছে। ওড়িশার সুউচ্চ পাহাড়শ্রেণীতে (খন্দমাল্) বসবাসকরা খন্দ, উপজাতিদের নিয়ে লিখেছিলাম অনেকদিন আগে, "পারিধী"। "পারিধী" একটি খন্দ শব্দ।

মানে হচ্ছে, মৃগয়া। "মাধুকরী"তে, নর্মদা নদ-এর উত্তরে বসবাসকারী মুণ্ডা উপজাতিরা যারা চেহারা-আচার-ব্যবহার রীতি-নীতিতে বিহারের রাঁচী বা সিংভূম জেলার মুণ্ডাদের থেকে বেশ কিছুটা আলাদা ; তাদের নিয়ে লিখেছি। সিংভূম জেলার মুণ্ডাদের (বিরিসা মুণ্ডার অঞ্চল সুকানবুড়ু পাহাড়ের চারপাশ) নিয়েও লিখেছি "সাসানডিরি"।

"সাসানডিরি" শব্দটির অর্থ হচ্ছে, মুণ্ডা ভাষাতে ; কবরস্থান।

দেখো, কোন কথা থেকে কোন কথাতে চলে এলাম।

আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরি।

তোমার বোন সরিফুনকে দেখেছিলাম একবারই। সেই ঢাকার বইমেলাতেই। তুমি মেলার মধ্যে দ্বিতীয়দিন যে চিঠিটি দিয়েছিলে, তার উত্তরে পরদিন যে চিঠিটি লিখে, সেটি পকেটে নিয়ে ; তুমি আসবে এই অপেক্ষাতে অধীর আগ্রহে বসেছিলাম সেই সন্ধেতে আমার প্রকাশকের বইয়ের স্টলের সামনে, তখন দেখি একটি হলুদ শাড়ি আর লাল ব্লাউজ গায়ে, কাঁচা-হলুদ রঙা গাত্রবর্ণের এক তন্বী তরুণী এসে দু'চোখ টায়ে টায়ে ভরে দাঁড়িয়ে বললো, আমি, দিদির বোন।

তোমার নামোল্লেখ করলো। নিজের নাম বললো না।

তোমার চিঠিটি তার হাতে তুলে দিতেই সে একটি লাল-হলুদ প্রজাপতিরই মতো স্পন্দিত হতে হতে, ঘুরে ঘুরে ; দূরে উড়ে গেলো।

মিশে গেলো, মেলার নানারঙা ভিড়ে।

ওকে জিগ্যেস করেছিলাম, দিদি এলো না কেন ? লেখকের গণ্ডারের মতো চেহারা দেখেই কি তার এই অসূয়া ?

সে বললো, হতেও বা পারে। তবে, দিদির অবস্থা বিশেষ ভালো নয়।

বুঝলাম যে, কথাটা দ্ব্যর্থক। শুধু তাই-ই নয়। বোন তার দিদিরই মতো বুদ্ধিমতী এবং রসিকাও।

ও কিন্তু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেনি অন্য অনেকের মত। ওরা অন্য প্রজন্মের মানুষ। ভাগ্যিস !

এখন তো পাঁচবছর পরে পরেই এক-একটি আলাদা প্রজন্ম। তাই তো জীবন এতো ইন্টারেস্টিং। মানুষে মানুষে এতো তফাৎ। প্রত্যেক মানুষই এতো বিচিত্র, বিপরীতমুখী।

এই ব্যাপারটা আমার খুবই ভালো লাগে।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে এক একটি প্রজন্মর বেড়া থাকতো।

বাবাদের প্রজন্মের সকলেই বিশ্বাস করতেন যে, চরকা কাটলে আর খাদি পরলে, অথবা ট্রেনের ফিসপ্লেট সরালেই দেশ স্বাধীন হবে। এবং দেশ স্বাধীন হলেই আমাদের সমস্ত দুঃখ দারিদ্র কষ্ট অপমান দূর হয়ে যাবে।

আমরা যে কুঁড়ে, আমরা যে অনিয়মানুবর্তী, আমরা যে অসৎ, আমরা যে ফাঁকিবাজ, পরশ্রীকাতর, আমাদের যে জাতীয় কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, হলো না ; স্বাধীনতার এই পঞ্চাশ বছরেও এমন কথা বাবা-ঠাকুর্দাদের প্রজন্মর কারো মাথাতেই আসেনি। স্বাধীনতার যোগ্য

আমরা ছিলাম না বলেই তাকে সম্মানিত করতে পারলাম না আজও। স্বাধীনতা পাওয়ার পঞ্চাশবছর পরেও তাই আমাদের এমন অবস্থা। তোমরা, বাংলাদেশের মানুষেরা ভাষাকে ভালোবেসে, দেশকে ভালোবেসে, স্বাধীনতার জন্যে বুকের রক্ত দিয়েছো, নারীর সম্মান দিয়েছো, তোমরা স্বাধীনতার মূল্য অবশ্যই বোঝো। বুঝবে।

এখনকার দিনে এক বাড়িতে তিনবছরের ব্যবধানের ভাই-বোন থাকলেও তাদের প্রজন্ম কিন্তু আলাদা আলাদা। কারণ, সমাজে, পৃথিবীতে 'স্থায়িত্ব' কথাটা তামাদি হয়েই যেতে বসেছে। 'নাজাই' খাতে লেখা হয়ে গেছে 'স্থায়ী' শব্দটা। সরিফুনদের প্রজন্মর কোনোই দোষ নেই। নিজের মা-বাবা ছাড়া প্রণাম বা আদাব করার মতো মানুষ ওরা যে চোখেই দেখেনি! এই প্রজন্মের অনেক সন্তান নিজের মা-বাবাকেও পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না। বলে, তুমি তো বন্ধু। প্রণাম তো মানুষে করে দূরের মানুষকে।

তাই সকলকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে বারণ করি। বলি, একশৃঙ্গ গণ্ডার এবং প্রণম্য মানুষ বড় দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে এ দেশে।

প্রণাম যে ওরা করে না তাতে কোনোই দোষ দেখি না। বরং ওরা যে আমাদের মতো ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা নিছক আজ্ঞাবহ হয়েই যাকে-তাকে প্রণাম করে না, তাতে ওদের চরিত্রেরই একটা দিক স্পষ্ট হয়ে ফোটে। ওরা অন্যরকম। তাই ওদের কাছ থেকে অনেক প্রত্যাশা আমার।

তোমার মনে থাকতে পারে যে, আমি তোমাকেও বলেছিলাম ঃ "প্রণম্য মানুষ আর একশৃঙ্গ গণ্ডার ভারতে দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে।" 'বিপদগ্রস্ত প্রজাতি'।

নিজের মা-বাবা ছাড়া আর কারোকেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কোরো না।

ভালো থেকো।

ইতি—লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা- ৭০০ ০১৯

তোড়া, তবাসুম,

কল্যাণীয়াসু,

সরিফুনের কি পছন্দ জানিও। ওর বিয়েতে কী দেব ?

আগের চিঠিতে শুধোতে ভুলে গেছিলাম।

কী পেলে ও খুশি হয় ? কোন রঙ ভালোবাসে ? ভাবছি, একটি Gift cheque পাঠিয়ে দেব।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রীতিনীতিকেও নিশ্চয়ই বদলাতে হবে। না-বদলানোটা অশেষ মূর্খামি। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগেও কারো বিয়েতে দুলহিন্ তেরোটি ইলেকট্রিক ইস্ত্রী, পনেরোটি টেবল-ল্যাম্প, ন'টি "সাহেব বিবি গোলাম" (বিমল মিত্র), ছ'টি থার্মোফ্লাস্ক, আটটি "কত অজানারে" (শংকর), ন'টি "দৃষ্টিপাত" (যাযাবর) এবং আটটি "দেশে বিদেশে" (সৈয়দ মুজতবা আলী) অবশ্যই পেতো। তখন অপচয়ের অন্যায়কে অথবা অনাকাঙ্খিত স্বাচ্ছন্দ্যর অসহায়তাকে দূষনীয় বলে মনে করা হতো না। কিন্তু আজ হয়। আজকে কনের মা-বাবারও উচিত মেয়েকে শুধুমাত্র টাকাই দিয়ে দেওয়া। আশীর্বাদের সঙ্গে। অন্য কিছুই নয়।

বাঙালী সমাজকে আমি যতটুকু জেনেছি, তাতে আমার মনে হয়, আত্মীয়স্বজনকে খাইয়েও টাকা নষ্ট করা উচিত নয় এই বাজারে। আঁচাতে -না আঁচাতেই যাঁরা নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠেন, খুঁত ধরেন পনেরো রকমের, তাঁদেরই কাছে এবং কন্যার শ্বশুরবাড়ির মানুষদের কাছে "মুখরক্ষার" জন্যে কন্যার পিতা, তাঁর সারাজীবনের সঞ্চয় ভেঙে, ধানজমি বিক্রি করে, নয় প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের পুঁজি ভেঙে যে, আয়োজন করেছেন তাইই কিছুদিন পরই হয়তো এক হাস্যকর ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত হবে।

তাছাড়া, বিয়ে ব্যাপারটাই তো আর "স্থায়ী" নেই আদৌ। "THEY LIVED HAPPILY THEREAFTER" এ-কথা বলাটা আজ আর অতো সহজ নয়। কবে যে বিয়া ভাইঙা যাইবো আর মাইয়া চক্ষুর পানিতে ভাইস্যা ফিরা আইবো বা একা থাইকবো কুথাও, তা, না মাইয়া নিজে জানে, না জানে তার আম্মী-আব্বা। তাই, যতখানি সম্ভব, মাইয়ার ভবিষ্যতের সুরক্ষা

www.boiRboi.blogspot.com

করাটাই সকলেরই হক্ কর্তব্য। বোঝলা না!

এছাড়াও 'পছন্দ', 'অপছন্দ' ব্যাপারটাও এতোখানিই তীব্র হয়ে গেছে, এতোই বেশি ব্যক্তিগত যে ; যার বিয়ে, সে আর আর তার SPOUSE দুজনে মিলে নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দমতো ফার্নিচার, ফ্রিজ, পাখা, টিভি, মিউজিক-সিস্টেম অথবা অবস্থাভেদে এয়ার-কণ্ডিশনার ইত্যাদি ইত্যাদি কিনতে পারে। পছন্দসই জামা-কাপড়, গালিচা, ক্রকারি ; গয়না।

এ বাবদে একটি নিরুচ্চার কিন্তু জোরদার আন্দোলন শুরু হওয়া দরকার। এই নতুন রীতি ব্যতিক্রম নয় ; ঘরে ঘরে মান্য এবং চালু-রেওয়াজ হয়ে ওঠা বাঞ্ছনীয় অবিলম্বে। তাই তুমি সরিফুনকে বোলো যে, ওর নামে এ বিয়ের আগেই একটি GIFT CHEQUE পাঠাবো।

ভালো থেকো।

ইতি—লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা- ৭০০ ০১৯

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ।

লেখক,

যখনই একটু উদবৃত্ত সময় পাই তখনই আমি "কিতাবঘরে" কাটাই। আপনাদের মতো আধুনিক লেখকদের বই যেমন পড়ি তেমন পুরোনোদিনের বইও পড়ি।

আপনি কি পড়েছেন, আইন-ই-আকবরী, তকাৎ-ই-আকবরী, তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, কুরান শরিফ, হাদিস শরিফ, এমনি আরও কত বই। রিয়াজ-উস-সলতিন পড়েছেন ?

না পড়ে থাকলে পড়বেন। আপনারা এ সব পড়লে আমাদেরই উপকার। আমরা পড়ে বেশি আর কী করব !

আপনারাই শুধু সেইসব বইয়ে যা আছে তা নিজেদের মস্তিস্কর জায়মান জারকরসে জারিত করে তা থেকে নব নব ভাবনার সঞ্চার করতে পারেন।

এসবের সঙ্গে কিন্তু আমি রামায়ণ মহাভারতও পড়ি। পড়ি, তুলসীদাস। হিন্দী আমি পড়তে পারি না। বাংলা হরফে যে অনুবাদ আছে, তাই পড়ি।

আপনার কথা মনে পড়লেই আমার প্রায়ই যবন হরিদাসের কথা মনে পড়ে।

জানেন কি ? যে, যবন হরিদাস মুসলমান হয়েও ভজনা করত শ্রীকৃষ্ণর্। আমিও যবনী হয়ে আপনার ভজনা করি নিশিদিন। অনুক্ষণ। কিন্তু যবন তো তার প্রাণের মানুষকে, ধ্যানের মানুষকে পেয়েছিলো শেষ পর্যন্ত ! আমি তো তাঁর কাছ থেকে কোনো সাড়াই পাই না। দুজনের মধ্যে তফাৎ এইটুকুই।

আসতে পারেন না কি একবার। কী এমন ব্যস্ততা ? দিন তিনচারের জন্যেও ?

যদি আসতেন, তাহলে আপনি চলে যাওয়ার পরেই আমি গলা ছেড়েগাইতাম পাড়া প্রতিবেশীকে শুনিয়ে "I will never trade all my to-morrows for a single yesterday."

আপনি ভাবছেন, বাবা ঃ ! খুবতো ইংরিজী গান গাইছি !

না-গাইব কেন ! সবই করি। কিন্তু মনে মনে আমি পুরোপুরি বাংলাদেশী। বাঙালী। সেই আমার প্রথম ও শেষ পরিচয়।

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

যা বলছিলাম, আমি কি আপনাকে সত্যিই কাছে পাবো না কখনও ? ক্ষণকালের জন্যেও ?

আপনি কি জানেন যে, একটা সময় ছিলো যখন বাংলার নবাবকেই মূলক্‌পতি বলা হতো। বাদশা জালালউদ্দিন ফতেহ্‌শাহ, খুবই বুদ্ধিমান ন্যায়নিষ্ঠ মূলকপতি ছিলেন। তাঁরই রাজত্বকালে যবন হরিদাস যবন হয়েও কৃষ্ণর ভজনা শুরু করে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী হয়েও তা করা তো অপরাধ বলেই গণ্য হবার কথা। "কাফ্বির" এর ধর্মকে আলিঙ্গন করবে, এ কেমন !

কিন্তু যবন হরিদাস বলতো, "দুয়া"তে বা "ইবাদতে"ও খুদাহকে পাবেনা কখনও। যতই সজ্‌দা করো না কেন, খুদাহকে পাবে না। যদি না, তাঁর নিজের দুয়া তোমার উপরে বর্ষিত হয়, তাঁর নিজের দয়া হয়। খুদাই যদি ইচ্ছে করে দয়া করে নিজেই কাছে আসেন তবেই পাবে। নচেৎ নিজে লাফিয়ে গেলেও নয়।

নয় ! নয় ! নয় ! আপনারা যেমন বলেন, "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর" তেমন করেই যবন হরিদাস বলতো যুক্তি দিয়ে পাবে না তাঁকে। কখনওই পাবে না। পেলে, কখনও যদি ভক্তি দিয়ে পাও। ভক্তি ছাড়া মুক্তি নেই।

নবাব জালালউদ্দিন ফতেহ্‌শাহর কানে হরিদাসের কথা পৌঁছলো। সবাই পৌনপুনিক অনুযোগ করতে লাগলো যে মূলকপতির রাজত্বে একী দুঃসাহসের কথা ! আল্লারসুল ছেড়ে হিন্দুদের কৃষ্ণকে আরাধনা করে ! এতো বড় আস্পর্ধা বদতমিজের ! হিন্দুদের কৃষ্ণ নামে দীওয়ানা হবে ? মুসলমান ?

প্রথমে নবাব তাকে বারণ করে দিলেন। এই পাপ কাজ বন্ধ করতে বলা হলো তাকে।

কিন্তু "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী"। সে যা করছিলো তাই করে যেতে লাগলো। সে বললো, যো কিসিম্‌সেভি হো কৃষ্ণর কৃপা আমাকে পেতেই হবে। কৃষ্ণের বাঁশির সুরে যে আমি আজানের ধ্বনি শুনতে পাই। যিনি কৃষ্ণ, তিনিই খুদাহ।

অতএব, কিংকর্তব্যম ? ফতেহ্‌শাহ ভাবলেন।

সে যুগে হয় কয়েদখানার অন্ধকূপে কয়েদীকে বন্ধ করে রাখা হতো, নয়তো নির্বাসনে পাঠানো হতো। নতুবা, চওকের বাজারে নিয়ে গিয়ে গুণাহ্‌গারকে বেত মারা হতো।

হরিদাসের জন্যে এই তৃতীয় শাস্তিই বরাদ্দ হলো। একে একে মূলক্‌-এর বাইশটি বাজারে নিয়ে গিয়ে বেত মেরে মেরে তার বেইমান পিঠ ফাটিয়ে দেওয়া হল। রক্তাক্ত অর্দ্ধমৃত হয়ে গেল যবন হরিদাস বাদশার পাইকদের হাতে।

রক্তের ধারা বইছে দরদরিয়ে তবুও যবন হরিদাস নির্বিকার। সে বিড়বিড় করে চোখ বুঁজে কৃষ্ণনামই জপ করে চলেছে। এতোতেও যখন ভূত ছাড়লো না, তখন তাকে রাখা হলো কয়েদখানাতে। না খানা ; না পানি তবুও সেখানেও বসে তৃষিত অভুক্ত সে রাত্রিদিন কৃষ্ণনামই জপ করে চলতে লাগলো।

এদিকে মূলকপতি একদিন খোয়াব দেখলেন যে, ঈশ্বর এসে বলছেন ঃ হরিদাসকে যদি মুক্ত না করো তোমার মূলক, তবাহ্‌ হয়ে যাবে। যত মার, যত অত্যাচার তুমি ওকে মেরেছো আর ওর উপরে চালিয়েছো সবই লেগেছে আমারই গায়ে। যা বলছি, তাই করো যদি সর্বনাশ

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com
না ডেকে আনতে চাও।

হরিদাসের এই কঠোর সাধনা দারুণ এক পরিবর্তন এনে দিল মূলকপতি জালালউদ্দিনের অন্তরে। তিনি সশরীরে জেল ফটকে গিয়ে যবন হরিদাসকে মুক্তি দিয়ে বললেন ঃ যাও হে! তুমি আজ থেকে মুক্ত। আজ থেকে কেউ আর তোমার কৃষ্ণ-আরাধনায় বাধা দেবে না।

যবন হরিদাস তখন প্রেমের হাসি হেসে নবাবকে, মূলকপতিকে বললো, আমার কৃষ্ণ আপনার মঙ্গল করবেন হুজৌর। উপরওয়ালা তো ঐ একজনই। তাঁর তো আর কোনো জাত নেই।

এই সহজ কথাটা যদি সব জাতের মানুষেরাই বুঝতো! তবে পৃথিবীটা কত সুন্দর জায়গা হতে পারতো বলুন তো!

এতবড় গল্প বললাম এই জন্যেই যে, এই ফিরদৌসী নাম্মী যবনীও নিশিদিন বুদ্ধনাম করছে, হরিদাস যেমন কৃষ্ণনাম করতো। যদি তিনি দয়া করে আসেন একবার! শুধু একবার! জাত-পাত গর্ব-অহংকার সবই গেলো আমার। নিজেকে এতো ছোট করলাম, অনুক্ষণ করছি বলে, নিজের উপর ঘেন্নাও হয় না! ছিঃ. কী নির্লজ্জ আমি!

যবন হরিদাস হিন্দু হয়ে গেছিল। আমি বৌদ্ধ হয়েছি।

দয়া কি হবে? শাক্যসিংহ?

ভালো থাকবেন।

ইতি—

ফিরদৌসী।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

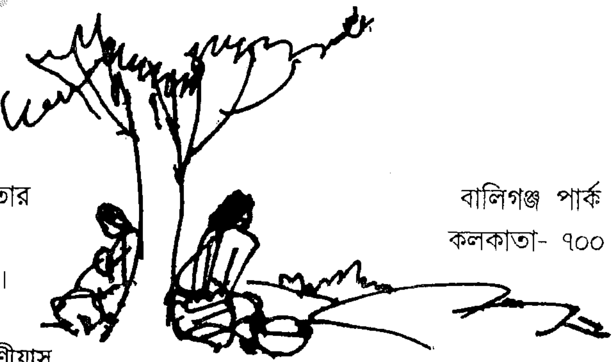

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা- ৭০০ ০১৯

তোড়া, কল্যাণীয়াসু,

তুমি তোমার শেষ চিঠিতে জানতে চেয়েছো, "কোয়েলের কাছে", "কোজাগর" এবং "ঋভু" উপন্যাসগুলির পটভূমি ও চরিত্রগুলি সত্যি কি না? ঐসব উপন্যাসের অনুষঙ্গ সম্বন্ধেও জানতে চেয়েছো।

"কোয়েলের কাছে" প্রায় তিরিশ বছর আগে লেখা। "কোজাগর" পঁচিশ বছর, আগে লেখা। অবশ্য দুটিই আজও সমান সমাদৃত ; কিন্তু তারা লেখকের কাছে, অনেক দূরে বিয়ে হয়ে চলে-যাওয়া কন্যারই মতো।

জামাতা কৃতী। নাতি-নাতনীরা মেধাবী, সভ্য ; ভদ্র। কিন্তু দেখা হয় না আর কারো সঙ্গেই। রঙিন ছবির প্যাকেট আসে মাঝে-মাঝে। ফোনে শুভেচ্ছা আসে, জন্মদিনের। তারা 'হলিডে করতে' তাহিতিতে যাচ্ছে, না সেশেল্‌স্ দ্বীপপুঞ্জে, সে খবর পাওয়া যায়। 'ক্রিসমাস গিফট' আসে। সবই হয়। কিন্তু মেয়ের মুখটি দু'হাতের পাতার মধ্যে নিয়ে তাকে চুমু খাওয়া হয় না। নাতি-নাতনীকে "হাট্টিমাটিম টিম তারা মাঠে পাড়ে ডিম, তাদের খাড়া দুটো শিঙ, তারা হাট্টিমাটিম টিম" বা "হলদে সবুজ ওরাং ওটাং ইট পাটকেল চিৎপটাং" অথবা অবন ঠাকুরের "রাজকাহিনী" পড়ে শোনানো যায় না কোনো বর্ষার মেঘমেদুর দুপুরে।

বহুদিন আগে লেখা, কিন্তু এখনও সমাদৃত, প্রায় ক্লাসিক হয়ে-যাওয়া উপন্যাসও তেমনই উপন্যাসের লেখককে এক বিধুর-মধুর স্মৃতিতে উষ্ণ করে রাখে। অথচ যা একদিন তাঁরই একার ছিলো, তাই এখন অন্যের, সবাকার হয়ে গেছে এই বোধটা লেখককে যেমন গভীর শ্লাঘা দেয় একরকম, তেমনই বিষণ্ণও করে। দূর দেশে বিবাহিত মেয়ের সুখ, উপন্যাসের জনপ্রিয়তা, বাবা বা লেখকের নিজের কাছে শুধুমাত্র প্রতিফলিত সুখ, প্রতিফলিত আনন্দ ; গৌরব।

কখনও কখনও মনে হয় যে, মেয়েকে দূরে বিয়ে না দিলেই হতো। অথবা, উপন্যাসটি মনের মধ্যে রাখলেই হতো!

যতক্ষণ না প্রকাশিত হচ্ছে ততক্ষণ উপন্যাস লেখকেরই একার। তার প্রিয় অনূঢ়া

www.boiRboi.blogspot.com

কন্যারই মতন। কিন্তু প্রকাশিত হয়ে গেলেই সে তখন পাঠক-পাঠিকাদের অনেক বেশি, অনেক কাছের ; লেখকের নিজের চেয়ে।

তাই সেইসব অনুষঙ্গ বর্ষাশেষের দূরাগত পুষ্পগন্ধেরই মতো মনে মনে নিজের কাছে ফিরিয়ে আনার মধ্যেও একধরনের গভীর সুখ আছে বইকী ! যে সুখের প্রকৃতি, শুধুমাত্র একজন লেখকই জানেন।

যা জানতে চেয়েছো, জানাবো তোমাকে তোড়া। তবে, পরে।

আজকে এখানেই শেষ করছি। অনেক চিঠির উত্তর দিতে হবে।

আমার উত্তর যখনই পাওনা কেন, তোমার চিঠির স্রোত যেন অব্যাহত থাকে। তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবো না। অনেক চিঠির হয়তো উত্তরই দেবো না। তাতে মনে কোরো না কিছুই।

তোমাকে ভদ্রতার চিঠি লিখবো না ; লিখবো, প্রাণের চিঠি। যখন বলার মতো কথা জমবে বুকে তখনই তা বলে হালকা করবো নিজেকে। তুমি যা জানতে চাও তার উত্তরে কিছু জানাবো। যা জানতে চাও না, তাও জানাবো নিজেরই প্রাণের অফুরান তাগিদের উৎসারে উৎসারিত হয়ে। আবেগের চিঠি।

যে দম্পতি রোজ একে অন্যকে আদর করেন তাঁদের আদরে একঘেয়েমি আসতে বাধ্য। যেদিন আদর করবে বা খাবে, যখন খাবে ; তখন সেই আদরের কথা পাড়া প্রতিবেশীও যেন জানে ! বাঘ-বাঘিনীর বড়-আদরের খবরের মতন।

রেশনের চালে আমার রুচি নেই। না হয় না-খেয়েই থাকবো ! কিন্তু যেদিন খাবো, সেদিন দাদখানি বা রূপশালি বা দেরাদুনের চাল। অথবা বরিশালের 'বালাম'।

মুসলমানদের আমি এই কারণে শ্রদ্ধা করি। গরীব মুসলমান মাসের উনত্রিশদিন হয়তো পেটে কিল দিয়ে বা শুধু ভাত কাঁচা-লঙ্কা-পেঁয়াজ দিয়ে খেয়ে কাটিয়ে দেন কিন্তু যেদিন মুর্গী খান সেদিন পোলাউও অবশ্যই খান অথবা ঢাকাই বা বাখরখানি রুটি। এবং ঘি, গরমমশলা কী জাফরান ঢালতে সেদিন আদৌ কঞ্জুষী করেন না।

যে-কোনো জাতির খাওয়া দাওয়ার ধরন ধারন খুঁটিয়ে বিচার করলে তার চরিত্রচিত্র সহজে ধরা পড়ে।

গত জন্মে আমি মুসলমানই ছিলাম বোধহয়। নইলে.......

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেলো। তোমাদের দেশে ঢাকাই পরোটা পাওয়া যায় কি ? ছেলেবেলাতে কলকাতার দক্ষিণের পাড়াতে খেতাম। ঘন চকচকে বুট-এর (ছোলা) ডালের সঙ্গে মুচমুচে, ফোলা, ঘি-জবজব পরোটার মতো সুখাদ্য কী আর হয় ? ঢাকাই পরোটার সঙ্গে, নানারঙা বুড়ির চুলের সঙ্গে সঙ্গে ; আমাদের ছেলেবেলাটাই হারিয়ে গেল চিরদিনের মতো।

তোমার শেষ চিঠিতে এমন আভাস ছিলো যে তোমার একজন প্রেমিক আছেন। না থাকাই তো অস্বাভাবিক। একজন কেন ? দশজন থাকাটাই স্বাভাবিক।

দুঃখের বিষয় এই যে তোমার সেই চিঠিটিই Misplaced হয়ে গেছে। প্রেমিকের খবরের চিঠি হারাতে পারে, তা বলে প্রেমিক তো আর হারাবে না !

যদিও তাঁর নাম বলোনি, নাম বলার দরকারও নেই। কিন্তু তাঁর কি খবর ? তুমি আমাকে এতো লম্বা লম্বা চিঠি লেখো এবং আমি তোমাকে এতো চিঠি লিখি বলে তোমার প্রেমিক কি রাগ করেন ?

রাগ না করলেও বিরক্ত হন কি ? জানতে ভারী ইচ্ছে করে !

তুমি উদার বলেই যে তিনিও উদার হবেনই তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই। ভালোবাসা যে সবসময়েই ঔদার্য দেয়ই এমনও নয়। অনেক সময়েই তা মানুষকে সংকীর্ণ, ঈর্ষাকাতরও করে তোলে। সেটা প্রেমিক-প্রেমিকার দোষ নয়। ভালোবেসেও পজেসিভ না-হওয়াটা অত্যন্ত উচ্চমার্গের স্ত্রী-পুরুষের পক্ষেই সম্ভব। তাই সে যদি রাগ করে আমার উপরে বা তোমারও উপরে, তাহলে তুমিও রাগ না-করে ; তাকে বোঝার চেষ্টা কোরো।

তবু বলবো যে, এমনটি কিন্তু পশ্চিমদেশে হয় না। চিঠি লেখা ও চিঠি পাওয়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এক বিশেষ দিক। চিঠি, প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষেরই মনের জানালা। চিঠি লিখতে না-পারাটা এক ধরনের অক্ষমতা, অশিক্ষাও বটে। 'স্বাধীনতা'কে কোনোমতেই বাঁধা দিতে নেই। কারো জন্যেই নয়।

আমার সঙ্গে তোমার প্রেমিকের আলাপ কোনোদিন অবশ্যই হবে। তখন হয়তো তিনি জানবেন বা বিশ্বাস করবেন যে, একজন নারী বা একজন পুরুষের উপর অন্য একজন মাত্র পুরুষ অথবা নারীর একমাত্র-অধিকার কোনোদিনই ছিলো না। এবং থাকবেও না কোনোদিনই।

যে পাখিকে প্রতি ভোরে উড়িয়ে দেওয়া যায় এবং যে সারাদিন পরে ফিরে এসে আবার দাঁড়ে বসে, সে পাখিই তো সবচেয়ে বেশি পোষা। কোনো পাখিকে পায়ে কড়া লাগিয়ে তাতে শিকল বেঁধে আজীবন খাঁচায় বন্ধ করে রাখলে মালিকানার স্থূল শ্লাঘাবোধে স্ফীত হওয়া হয়তো যেতে পারে কিন্তু ঔদার্যর শ্রদ্ধা আদৌ জোটে না।

বক্তব্য হয়তো কিছুটা স্ব-বিরোধী হয়ে গেল কিন্তু....। WALT WHITMAN-এর মতো বলতে হয় তবে, "Do I Contradict myself? Very Well! I do contradict myself." তবে আমার মনে হয় যে, অসাধারণ— তোমাকে যিনি ভালোবেসেছেন, তিনি সাধারণ হতেই পারেন না। তাই আমার বক্তব্য তিনি যে পুরোপুরি সমর্থন করবেন এ বিষয়ে আমার নিজের কোনোই সন্দেহ নেই।

তাঁর নাম-ঠিকানা জানালে তাঁকেও সরাসরি লিখতে পারি। কিন্তু যদি লিখি, তবে আমি যে তোমাকে ভালোবাসি না, তাঁর কাছে এমন মিথ্যে বলতে পারবো না। ভালোবাসার কত্বরকম হয়, কত রঙ হয়, চৈত্রবনের মতো, তা কি সবাই জানেন ? কিন্তু আমার এই ভালোবাসার তো কোনো দাবী নেই। মাঝে মাঝে তোমার কাছ থেকে চিঠি পাওয়া ছাড়া। তাছাড়া, যেখানে চেয়ে পাওয়া যে যাবে না তা যখন স্থিরই, সেখানে না চাওয়াটাই শিষ্টতা বুদ্ধিমানের কাজ। তোমার সমস্ত শরীর, তোমার সমস্ত মন তো শুধু তাঁরই হবে। তোমার মনের একটি ফালি, যে ফালিটুকুকে তোমার বুদ্ধিদীপ্ত মনের রোদ বৃষ্টি চাঁদ ঝরে ঝরে মসৃণ উজ্জ্বল করে তুলেছে, তাতেই শুধু আমার একছত্র অধিকার। তাও বহুদূর থেকে লেখা চিঠি দিয়েই তোমার মনের সেই নিভৃত গোপন নির্জন অংশটুকুকে ছুঁতে পারি শুধু।

আমার এই এতো স্বল্প পাওয়াতেও কি তিনি ঈর্ষান্বিত হবেন ?

সরিফুনের স্বামীরও ঠিকানা দিও। চিঠি লিখবো তাঁকেও অভিনন্দন জানিয়ে। কী যেন নাম লিখেছিলে ? কীর্তি কি ? জানিও।

তাঁর কীর্তি অক্ষয় হোক। কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটোনোর সাধনা তাঁর যেন সার্থক হয়, এই প্রার্থনা করি।

ভালো থেকো।

তোমাকে যখন প্রথম এবং শেষবার দেখেছিলাম তুমি কি তার চেয়েও বেশি সুন্দরী হয়েছো ? ভাবলেও উত্তেজিত বোধ করি।

তুমি লিখেছো, "মাধুকরী"র কুর্চি হতে ইচ্ছে করে তোমার। এবং 'কুর্চিবন' কখনও দেখোনি। ইচ্ছা রইলো কখনও দেখাবার। যদি সুযোগ সুবিধে হয়। "কুর্চিবনে গান" উপন্যাসটি কি পড়েছো ? "পঞ্চপ্রদীপ" সংকলনে আছে। তাতে আছে "ঋক" এবং "স্বপ্নের দেশের জন্যে"ও। যদি জোগাড় করতে না পারো, তাহলে জানিও ; পাঠিয়ে দেবো।

এ প্রশ্ন তোমাকে আগেও করেছি কি ? আজকাল স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করে।

গভীর রাতে, নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত স্নিগ্ধ আকাশের দিকে চেয়ে, জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, অথবা বৃষ্টিশেষের হাওয়ায় হঠাৎ ভেসে আসা মিশ্রফুলের গন্ধে, তোমার কখনও কি গর্ব হয় একথা ভেবে যে, তুমি একজন ঔপন্যাসিকের, সাহিত্যিকের অনুপ্রেরণা হয়েছো ? ভালোবাসা পেয়েছো ?

গর্বিত হওয়ার এর চেয়েও বিশিষ্ট কারণ আর কি আছে কিছু ?

জানলে, জানিও।

ইতি—লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

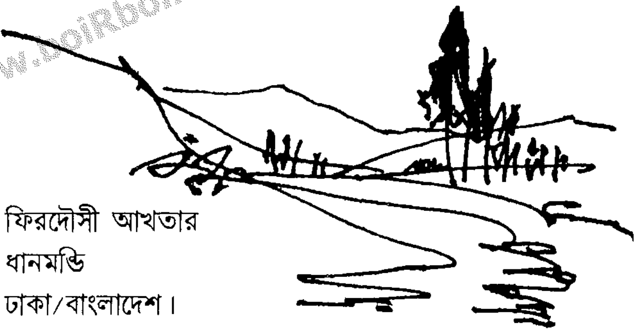

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ।

কঙ্কা
পোঃ ম্যাকলাস্কিগঞ্জ
বিহার

তবাসুম, কল্যাণীয়াসু,

গতকাল বিকেল-বিকেল ম্যাকলাস্কিগঞ্জে এসে পৌছলাম।

এই পৌছনোটা সাধারণ পৌছনো নয়। যাকে খবরের কাগজের ভাষায় "প্রত্যাবর্তন" বলে, এ একেবারে তাই।

আমি হয়তো চিতায় জ্বলে ছাই হয়ে যাব কিছুদিন পরেই কিন্তু ম্যাকলাস্কিগঞ্জ জীবন্ত হয়ে থেকে যাবে "একটু উষ্ণতার জন্যে" তে। বহু বহু বছর। থেকে যাবে, তোমারই মতো অগণ্য পাঠক-পাঠিকার মনে।

"প্রত্যাবর্তন" কেন বললাম, এখন তাই খোলসা করে বলি।

কটেজটি আমি কিনেছিলাম মিস্টার কাব্রাল নামের এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোকের মেয়ের কাছ থেকে। ওই বাড়িতেই মিস্টার কাব্রাল তাঁর দেহ রেখেছিলেন সম্ভবতঃ ষাটের দশকের শেষের দিকে। তাঁর জামাই ছিলেন মাইনিং এঞ্জিনীয়র। ওঁরা অস্ট্রেলিয়াতে সেটল্ করবেন বলে চলে যাচ্ছিলেন ম্যাকলাস্কিগঞ্জ ছেড়ে। ওঁদের কাছ থেকেই আমি কিনি ষাটের দশকের শেষে।

কটেজটির লাগোয়া হাতাতে চোদ্দবিঘা জমি ছিল। পঞ্চাশটির বেশি আমগাছ ছিল। দুটি কুঁয়ো ছিল। কটেজ-এর হাতার তিনদিক দিয়ে বয়ে গেছিল একটি পাহাড়ী ঝর্ণা, সীমানা চিহ্নিত করে। আর ছিল শাকুয়া, অগণ্য পলাশ, কেঁদ, খয়ের-এর স্বাভাবিক জঙ্গল। লিট্পিটিয়া আর রাহেলাওলার ঝাড়। নালার মধ্যে শেয়াল। রাতে টহল দিতে আসতো চিতাবাঘ।

এ-সবই তুমি পড়েছো "একটু উষ্ণতার জন্যে"তে। কটেজটির দুটি মেইন বেডরুমের সঙ্গে লাগোয়া দুটি বাথরুম ছিল। কিন্তু মিসেস ও মিস্টার কাব্রাল শুধুই ডানদিকের উইংটা ব্যবহার করতেন। বাঁদিকের বাথরুমটি ছিল তাঁর কার্পেনট্রি শপ।

রিনা, মানে অভিনেত্রী অপর্ণা সেন, "সানন্দার" সম্পাদক, তার ইনকামট্যাক্সের ঝামেলা নিয়ে আমার কাছে যখন আসে তার কিছু আগেই মুকুল শর্মাও ভালোবাসা নিয়ে রিনার

www.boiRboi.blogspot.com

জীবনে এসে পৌঁছেছে। ওদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার কিছুদিন পরেই মুকুলের সঙ্গে বিয়ে হয় রিনার। ওদের বিয়ের পরে ওরা হানিমুনে যাবে বলল, ম্যাকলাস্কিগঞ্জে। যখনকার কথা বলছি তখন 'সানন্দা'র জন্ম হয়নি।

খুবই খুশি হলাম। বললাম, অবশ্যই যাবে।

খুব আনন্দ করে ফিরে আসার পর রিনা একদিন ফোন করে বলল, "লালাদা, ইফ ইউ এভার টয় উইথ দ্যা আইডিয়া অফ সেলিং দ্যা প্লেস, প্লিজ, গিভ ইট ট্যু মী।"

বললাম, ঠিক আছে।

"একটু উষ্ণতার জন্যে" লিখে ফেলার পর ম্যাকলাস্কিগঞ্জ সম্বন্ধে আর তেমন কোনো ইন্টারেস্টও ছিল না আমার। মানে, ফ্রম লিটারারী পয়েন্ট অফ ভিউ।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে বলতেন ঃ "আ রাইটার শ্যাল নেভার বী টায়েড ডাউন ট্যু ওয়ান প্লেস। হি শ্যাল বী আ ওয়াণ্ডারার। লাইক আ জিপসি।"

আমি সেই কথাতে বিশ্বাস করি।

নানা কারণে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম জায়গাটার উপরে। বাড়িঘরের মালিকানা বদলাচ্ছিল। জায়গাটার চরিত্র বদলাচ্ছিল। চুরিডাকাতি শুরু হয়েছিল। তখন বয়সও মোটে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। রিটায়ারমেন্টের কথা তখন ওঠেই না। তাছাড়া স্বভাবটিও যে অমনই ! বেশিদিন যে কোনো জায়গাতেই ভাল লাগে না। কোনো মানুষকেও। নতুন চকচকে সুন্দর কিছু, অথবা ব্যতিক্রমী কোনো মানুষ দেখলেই ছেলেমানুষের মতো আকৃষ্ট হই। পাওয়ার জন্যে একধরনের জেদ চাপে। পাওয়া হয়ে গেলে, মোহ কেটে যায়। পাওয়া না হলেও, চাওয়া পুরোনো হওয়ার আগেই চাওয়াকে ফিরিয়ে নিই নিজ থেকেই। নিজেকে ডেকে বলি। "বিবাগী হিয়া কিসের খোঁজে বাহির পথে গেলি, আয়, আয়রে ফিরে আয়।"

এটা দোষগুণের কথা নয়, এই আমার স্বভাব।

কোনোরকম জাগতিক, পার্থিব, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতেই আমার বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না কোনোদিনও। আজও নেই। সত্যিই বলছি, নেই। কোনো মানুষের উপরেও লোভ নেই ; বিশেষ আসক্তি নেই। কী পুরুষ কী নারী !

ইংরিজিতে যাকে তোমরা "পজেসিভনেস" বলো, তা কোনো ব্যাপারেই নেই। এবং যাদের মধ্যে এই ব্যাপারটি আছে তাদের আমি আদৌ পছন্দ করি না।

তবে বাড়ি বিক্রি করার পরে পরে একবারই মাত্র গেছিলাম ও বাড়িতে। দ্বারিকদার সঙ্গে।

দ্বারিকানাথ মিত্র। গ্রেট দ্বারিকদা ! "ঝাঁকিদর্শন" পড়েছো কি ? "ঝাঁকিদর্শন" দ্বারিকদা আর বৌদিকে নিয়েই লেখা, ওঁদের যসিডির বাড়ি, 'চিড়িয়াখানা' নিয়ে। যে দ্বারিকদাকে আমি চিনতাম সেই দ্বারিকদার চেহারা গ্রেগরী পেকএর মতো, আর্থিক অবস্থা হায়দরাবাদের নিজামের মতো। হৃদয়, সমুদ্রের মতো এবং তিনিই একমাত্র বাঙালী, যাঁকে কারোই নিন্দা করতে শুনিনি। সে তিনি যতবড় কৃতঘ্নই হন না কেন
ওঁর ঔদার্যটি প্রকৃত ছিল। ভান ছিল না।

সেবারে গেছিলাম বাড়ি বিক্রী হয়ে যাওয়ার পর ; কিছু ব্যক্তিগত জিনিস, চিঠিপত্র উদ্ধার করে আনতে। তোমারই মতো অনেকের অনেক চিঠি বন্ধ ছিল ড্রয়ারে। একটি গল্পের

খসড়াও। অনেকদিন পরে সে গল্পটি ঘষামাজা করে আনন্দবাজার অথবা দেশ-এর শারদীয় সংখ্যায় ছাপতে দিই। নাম "এজমালি।"

"তোমারই মতো" বলাটা বোধহয় ঠিক হলো না। তোমার মতো সুন্দর চিঠি আর ক'জন লিখতে পারে? তবে তখন তোমার চিঠি ছিল না। তোমাকে তো চিনতামই না তখন।

যখন দোর বন্ধ করে ফিরে আসছিলাম, তখন, মনে আছে; বুকের মধ্যে হঠাৎই বড় মোচড় দিয়ে উঠেছিল। আচম্বিতে বুঝেছিলাম যে, জমি-বাড়ি মানুষকে বড় দুর্বল করে দেয়, শিকড়ের জন্ম দেয় বুকের মধ্যে তারা; অজানিতে।

একদিন যাকে অনেক ভালোবেসেছি অথচ আজ যাকে আর ভালোবাসার সুযোগ একটুও নেই, অথবা যে এখন পুরোপুরিই পরেরই হয়ে গেছে; তেমন কোনো নারীর সঙ্গে যখন দেখা হয় দীর্ঘদিন পরে, তার কাছ থেকে চলে আসার সময়ে বুকের মধ্যেটা তখন যেমন হঠাৎই মুচড়ে ওঠে, এই মোচড়ও অনেকটা তেমনই।

এই ম্যাকলাস্কিগঞ্জ জায়গাটি তিনটি গ্রামের সমষ্টি। কঙ্কা, লাপরা এবং হেসালঙ। কঙ্কাতেই কাব্রাল সাহেবের কটেজ। আগে কটেজটির কোনো নাম ছিলো বলে জানি না। আমি নাম রেখেছিলাম "THE TOPPING HOUSE"। ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়ের আইডাহোর (কেচাম্-এর) বাড়িরই নামে। তাঁর ঐ বাড়িতেই হেমিংওয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। পাহাড় ও ঘন জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে এঁকে-বেঁকে যাওয়া SNAKE RIVER-এর পাশেই ছিলো সেই কটেজ।

যখনই আমার আত্মহত্যার ইচ্ছাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতো তখনই মনে হতো, আত্মহত্যা যদি আদৌ করতেই হয়, তবে ম্যাকলাস্কিগঞ্জের মতো সুন্দর জায়গা আর দুটি নেই।

কাছের মানুষদের অনেককেই তখন লিখেওছিলাম যে, যদি আমি এখানে মরি, মৃত্যু যেভাবেই আসুক না কেন; আত্মহননের চকিত মৃত্যু অথবা দরজার পাল্লাতে চাপা-পড়ে ধীরে-ধীরে—মরা অসহায় টিকটিকির মতো ক্লান্তিকর, বিলম্বিত মৃত্যু; আমাকে যেন চেরী গাছদুটির ঠিক মাঝখানটিতে কবর দেওয়া হয়।

তখন কত যে পাখি আসতো চেরী ফল খেতে। বনের বুক উজাড় করে বনের পাখিরা আসতো। ওরা হয়তো জানতো যে, এ বাড়িতে এমন একজন মানুষ থাকে যে, পাখিকে ভালোবাসে, বনকে ভালোবাসে, গাছকে ভালোবাসে, ফুলকে ভালোবাসে; নারীকে ভালোবাসে এবং প্রজাপতিকেও।

রিনার কাছ থেকে বেশ কয়েকবছর পরে এই কটেজই কিনলেন শ্রীগুণেন মিত্র। তাঁর একমাত্র সন্তান সোমনাথ, দক্ষিণ কলকাতার একটি স্কুলের মালিক ও প্রিন্সিপ্যাল। বয়স তিরিশ-বত্রিশ হবে।

যেদিন গুণেনবাবু বাড়িটি কিনলেন সেদিনই রাজা বসন্ত রায় রোডে আমার বাবার বাড়িতে বেড়াতে গেছিলাম। বাবাকে দেখতেও। সোমনাথও তখন এসেছিলো সেই বাড়িতে। ভায়েদের কাছে। ভায়েদের সূত্রেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ।

সোমনাথ বলল, তুমি, "তোমার বাড়িতে" কবে যাচ্ছো দাদা?

মুগ্ধ হয়েছিলাম ওর আন্তরিকতাতে। আমি তো কেউই নই! কবে সেই বাড়ির মালিক

www.boiRboi.blogspot.com

ছিলাম। এমন করে কেই বা বলে আজকাল! যা আমারই একদিন ছিলো, এতোদিন পরে সেই বাড়িতেই কোনোদিনও যাওয়ার বা থাকার কোনো সম্ভাবনার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। আর সেই বাড়িকেই 'তোমার বাড়ি' আখ্যা দিয়ে যাওয়ার নেমন্তন্ন কেউ করবে তাও তো স্বপ্নের অতীত ছিল।

অবশ্য এখানে একথা না বললে অন্যায় হবে যে, রিনাও বলেছিল, বাড়ি কেনার সময়ে, বারে বারেই যে, "বাড়ি তোমারই থাকলো লালাদা। তুমি যখন খুশি, তখনই যেও।"

কিন্তু যাইনি। যাওয়া হয়ে ওঠেনি, ওঠে না। নিজের ভেতরেও একটি বাধার দেওয়াল গড়ে ওঠেই। "যাবেন" বললেই যাওয়া যায় না। যাঁরা জানেন, তাঁরাই জানেন।

আমি হেসে সোমনাথকে বলেছিলাম, তুমি সঙ্গে করে যেদিন নিয়ে যাবে সেদিনই যাব।

অনেকদিন আগে পালিয়ে-যাওয়া পাখির দাঁড়ে ফিরে আসারই মতন "সেদিন" অনেকই বছর পরে, হঠাৎই এক ঘোরা, বিবশ-করা বসন্ত-দিনে ফিরে এলো।

সফল-হওয়া ভোরের স্বপ্নের মতন।

ইতি—

লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদোসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯·

তোড়া,

কল্যাণীয়াসু,

এক বাসন্তী সকালে, অবিশ্বাসের সঙ্গে চোখ-কচলে সত্যিই দেখলাম যে, সোমনাথের ছাই-রুপোলি-রঙা এয়ার-কণ্ডিশানড্ গাড়ির সামনের সীটে বসে আছি। সোমনাথ গাড়ি চালাচ্ছে। আর পেছনে ওর পরমা সুন্দরী এবং সরল স্ত্রী শর্মিলা। এবং ওদের একমাত্র কন্যা, সাড়ে তিন বছরের গুড্ডু।

গাড়ি চলেছে।

হাইওয়েতে পড়তেই মনটা ভীষণ ভালো হয়ে গেলো। কতদিন যে যাকে ছুটি বলে, তা নেওয়া হয়নি!

মনের উপর থেকে হঠাৎই যেন কলকাতার কলুষিত পরিবেশের ঢাকনা খুলে গেল। কলকাতায় শুধু বায়ুদূষণ, শব্দদূষণই নয় ; চরিত্র-দূষণ, মন দুষণেরও যে শেষ নেই! সেই দূষণ, সেই কলুষ নিয়ে কোনো সেমিনার হয় না, খবরের কাগজে লেখালেখি হয় না।

ডিজেলের কালো ধোঁয়া দেখা যায় সাদা চোখে। কিন্তু এই অদৃশ্য দূষণ? এই দূষণই ইঁদুরের মতো কেটে যাচ্ছে মানুষের মন, ভালত্ব, সারল্য, সততা, বিশ্বাস প্রতি মুহূর্তে।

তোমাদের ঢাকাতে কি এই দূষণ নেই? জানতে ইচ্ছা করে।

গাড়িটা বম্বে রোডের আন্দুলে বা বালির ব্রিজ পেরিয়ে দিল্লি রোডে পড়লেই খাঁচা-বদ্ধ পাখির মতো মনটা মুক্তির আনন্দে, নীলাকাশের দিকে চেয়ে চিৎকার করে, শীৎকার করে উঠতে চায়।

রোদ পড়লে, আমরা জামশেদপুরে পৌঁছেছিলাম। বেশি জোরে গাড়ি চালায়নি সোমনাথ। তাছাড়া বহড়াগড়ার আগে হাইওয়ের যে অবস্থা! অভাবনীয়!

সোমনাথের অতিথি হয়ে যাচ্ছি, তাই ওরই বিশেষ পরিচিত দত্তদের বাড়িতে, মানগোতে, উঠতে হয়েছিল।

তারা দারুণ ব্যাপার করলো রাতে। জামশেদপুরের বহু মানুষকেই নেমন্তন্ন করেছিলো।

www.boiRboi.blogspot.com

আমি যাচ্ছি এক রাতের জন্যে, সেই উপলক্ষে।

রবি মুখার্জি, টেলকোর। ডঃ গৌতম দাশগুপ্ত এবং তাঁর স্ত্রী কল্যাণী।

মায়া, রবির স্ত্রী, ভারী সরল মেয়ে। সে যে কতবড় ভক্ত আমার তা কী বলব ! কল্যাণীও ভক্ত। সে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী। ভারী সুন্দর চিঠি লেখে। প্রায় তোমারই মতো। মায়াও ভালো চিঠি লেখে, আন্তরিকতাতে উষ্ণ।

অনেক কথা মনে ভীড় করে এলো। আসছে, এই চিঠি লিখতে বসে। কত ঋণ, কী বিপুল কৃতজ্ঞতাবোধ যে, জমা রইলো, তাই ভাবি। এ জীবনে সেসব শোধ করার কোনো উপায় তো নেইই, হয়তো যথার্থভাবে স্বীকারও করা হয়ে ওঠে না। তাই বড়ই লজ্জাবোধ করি।

মায়া-রবির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয় কমল চক্রবর্তী। কৌরব পত্রিকার সম্পাদক। 'কৌরব' জামশেদপুর থেকেই বেরোয়। দেখেছো কি কখনও ? সুদর্শন কাঁচা-পাকা দাড়িঅলা কমল একসময়ে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে শুনেছি।

কমল একবার 'কৌরবের FUND RAISING -এর জন্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও বিখ্যাত অনেককে নিয়ে যায় জামশেদপুরে। আমাকেও নিয়ে যায় সঙ্গে, গাধাবোট করে। গান গাইবার জন্যে। বড় কবিরা কবিতা পড়েন আর অখ্যাত অ-কবিকে গান গাইতে হয়।

অনেক যত্ন-আত্তি করেছিলো কমল। সেবারেই রবি-মায়া তাদের বাড়িতে প্রথমবার নেমন্তন্ন করেছিলো আমাদের সবাইকেই। সেই প্রথম আলাপ। মায়া যে কী ভালো লুচি-বেগুনভাজা, মাংস রাবড়ি খাইয়েছিলো তা কী বলব ! সে রাতে যা হৈ-হুল্লোর গান-হাসি হয়েছিল, তা আর বেশিবার হবে বলে মনে হয় না। সেই সুখস্মৃতি মনে থাকবে বহুদিন। কল্যাণী ও গৌতমদের সঙ্গে এবং আরও অনেকের সঙ্গে মায়া-রবিই আমার আলাপ করিয়ে দেয়।

কয়েকবছর পরে অন্য এক শীতে হঠাৎই নিজেই গাড়ি চালিয়ে না-বলে-কয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম জামশেদপুরে। একটি রাত মায়াদের সঙ্গে থেকে পরদিন "গোলমুড়ি ক্লাব"-এ উঠেছিলাম গিয়ে। খুবই মজা হয়েছিলো সেবারে। দল্‌মা পাহাড়ের চুড়োয় পিকনিক হয়েছিলো শীতের দুপরে।

সেই বারের যাওয়ার পরই লিখি "কুর্চিবনে গান"। জানি না, পড়েছো কি-না। "পঞ্চপ্রদীপ" বইয়েতে আছে, তাতে পাঁচটি ছোট উপন্যাস আছে।

কত মানুষের কাছ থেকে যে কত অকৃত্রিম ভালবাসা, আদর যত্ন, সহমর্মিতা পেলাম এ জীবনে, তার খতিয়ান ক্রমশঃ ভারী হয়ে উঠছে। ঋণের বোঝার ভার চেপে বসছে বুকে। কিন্তু শোধ করার তো কোনোই উপায় নেই। তবে স্বীকার করি। ওঁরা কেউই জানবেন কী, জানি না, সবসময়ই স্বীকার করি। ঈশ্বরের দিব্যি। স্বীকার করি আর কষ্ট পাই।

মায়া, কল্যাণী বা তোমার চিঠিও যখন পাই তখন বারেবারেই মনে হয়, তোমরা সকলেই বাংলাটা আমার চেয়ে অনেকই ভালো লেখো। কত যে শিখি তোমাদের কাছ থেকে কত যে শিখলাম ! বাংলাদেশের সব ছেলে-মেয়েই কিন্তু বাংলাটা, পশ্চিমবঙ্গীয় গড়— বাঙালীদের

চেয়ে ভালো লেখেন। তাঁদের হাতের লেখাও মুক্তোর মতো। প্রত্যেকেরই।

কত উপমা, কত অভিব্যক্তি, প্রকাশভঙ্গীর কত নিত্যনতুন নতুনত্বে চমকে দাও তোমরা। আমি তো বাংলার ছাত্র ছিলাম না কোনোদিনই। শুনে শুনে, পড়ে পড়েই যতটুকু বাংলা শিখেছি। বাংলা ব্যাকরণেরও কিছুমাত্রই জানি না। তাই তোমাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতাটা অনেকই বেশি। আন্তরিক।

কল্যাণী একবার লিখেছিলো, "শুনলাম আপনি এদিকে এসেছিলেন, অথচ আমাদের কাছে এলেন না ? বুদ্ধদেবদা, আপনি কি ভেবেছিলেন আসার কথাটা গোপন থাকবে ? আপনার আসা তো নয়, সে যে আবির্ভাব !"

ত্রিপুরার আগরতলা থেকে মিতালী গাঙ্গুলি লিখেছিলো, (আগরতলা বইমেলাতে আলাপ হয়েছিলো ওর সঙ্গে) আমার লেখা চিঠি অন্যদের পড়ায় বলে আমি রাগ করাতে ; যে, "চানঘরে যখন মানুষে যায়, তখন একলাই যায়। কিন্তু সমুদ্রস্নানে ? আপনার চিঠিতে অবগাহনের যে সুখ, তা একা একা পাওয়া আদৌ উচিত নয়। সেটা স্বার্থপরতারই নামান্তর।"

চমৎকার লিখেছিলো। সত্যি ! আমার চিঠির এমন প্রশংসা আগে এমনভাবে কেউই করেনি।

স্বপনরা সে রাতে যে সম্মান দিল তা ভোলবার নয়। সবসময়েই আমি সবাইকেই বলি যে, রক্তসূত্রের বা বৈবাহিকসূত্রের যে আত্মীয়তা তা ষোলো আনাই পড়ে-পাওয়া। তাতে ব্যক্তির বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব যেমন নেই, অকৃতিত্বও নেই। যে-আত্মীয়তা আমার সঙ্গে তোমার বা অন্যদের সঙ্গে আমার, সে-আত্মীয়তা অর্জন করতে হয়েছে দু পক্ষকেই। সে আত্মীয়তা আত্মার কাছের আত্মীয়তা, তাই অনেকই বেশি দামী। গর্বিত হবার।

স্বপনের স্ত্রী পৃথা বেশ মেয়ে। ওর গায়ের রঙটি জামের মতো। বেগুনির হালকা আভা। আশ্চর্য ! এমনটি গায়ের রঙ কোনো নারীরই দেখিনি। সুন্দর ফিগার। কত যে যত্ন করলো ওরা বাড়িসুদ্ধু মানুষ, কী বলব। মায়া আর কল্যাণীর কথা মনে হচ্ছিলো বারবারই। মায়ার লুচি-বেগুনভাজারই মতো কল্যাণীর চিড়ে-কড়াই শুঁটি ভাজার কথাও মনে আছে।

জামশেদপুর ছেড়ে আসার আগে, সকালবেলাতে ওরা সকলেই ফোন করেছিল।

জানি না তোড়া, তুমি আমাকে যত্ন করার, আদর করার সুযোগ যদি এ-জীবনে একদিনও পাও বা আমিও পাই তা গ্রহণ করার এবং ফিরিয়ে দেওয়ারও সুযোগ ; তবে তার রকমটা কেমন হবে।

এই স্বপ্নিল সম্ভাবনার কথাটা যে কখনও বেশ জম্পেস করে ভাববো একা, তার সময়টুকুও কি ছাই আছে।

যা কিছুই পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু পাওয়া হয় না, হয়নি ; সেই প্রাপ্তির ভাবনাটুকুর মধ্যেই এক গভীর আনন্দ আছে। তাই নয় ? সেই আনন্দ হয়তো পাওয়ার আনন্দের চেয়েও অনেকই বেশি।

শৈশবে যখন মাসছয়েক ছিলাম বরিশালে ; তখন দেখেছিলাম, তোমাদের বাংলাদেশের বরিশালের মানুষেরা ভাত খেতে বসে পাতে বা ভাতে লেবু ব্যবহার করেন না। মেঝের উপরে মস্ত বড় কাঠের বারকোষে, গোটা কুড়ি-পঁচিশ বড় বড় গন্ধরাজ লেবু কেটে সাজিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

রাখতেন তাঁরা। আর তার তিনপাশে গোল হয়ে পিঁড়ি পেতে বসে ঝকঝকে কাঁসার অথবা সাদার উপরে লাল-নীল-হলুদ ফুল তোলা চকচকে সাদা কলাইকরা থালাতে খাওয়া হতো। কালো-জিরে কাঁচা-লঙ্কা ফোড়ন দেওয়া উপাদেয় মুসুরীর ডাল, তেল-কই আর কাউঠ্যার মাংস। লেবুর গন্ধে গন্ধে ম' ম' করতো রান্নাঘর।

সত্যি কী সব প্রাচুর্যের দিন ছিলো!

আজকে ভড্‌কা বা জিনের সঙ্গে একটু গন্ধরাজ লেবু খেতে চাইলে কত কৈফিয়ৎই দিতে হয় পৃথিবীকে।

আমার ঐ বরিশালিয়া ব্যাপারটা ভারী ভালো লাগতো।

লেবু কচলালে তেতো যে হয়ে যায়, একথা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু লেবু যে হাত দিয়ে চিপেও খেতে নেই, একথা ক'জনে জানে?

ভালোবাসা, প্রেম, আদর, যত্ন এই সবকিছুই হচ্ছে ভরা-বর্ষার মেঘ-মেদুর দুপুরের, পরিপূর্ণভাবে ফোটা গন্ধরাজ লেবুর সুগন্ধেরই মতো। লেবুতে হাত দিতে নেই, পাতে নিতে নেই লেবুকে। দূরে রেখে, তাকে না-ছুঁয়ে, তার গন্ধে আমোদিত আহ্লাদিত হয়ে জীবনকে উপভোগ যাঁরা করতে পারেন, শুধুমাত্র তাঁরাই উঁচুদরের আর্টিস্ট।

স্পর্শনে, ঘর্ষণে ; স্বপ্ন অবশ্যই দলিত, গলিত হয়। আমার পর্নমোচী মনের ভিতরে যে স্বপ্নমালা! তাকেই জপমালা করেছি যে! তাই পারি না অনেক কিছুই। এক আদিগন্ত কচি-কলাপাতা সবুজ-রঙা "চরাগাহর" মধ্যে যেন এক চিঙ্গারিরই মতো চমকে চমকে বেড়ালাম আমি সারাটা জীবন। তবাসুম কাকে বলে তাই জানা হলো না, জানো, তবাসুম!

আদর-যতন করতে কি সকলেই জানে? ভাবে, যে জানে। আসলে খুব কম মানুষই তা জানে। মানুষটা কোন ধরনের তা তার লেবু খাওয়ার ধরণ দেখেই বোঝা যায়। ঠিকই বোঝা যায়!

এই আদর-যতনের প্রসঙ্গে, আঙুরবালা দাসীর গাওয়া একটি গানের কথা মনে পড়ে গেলো।

"আমি জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি, তুমি যেন ঘৃণা কোরো-না
আদর-যতন করিতে যেমন সে-বাঁধনে যেন ছিঁড়ো না।
আমি আপন আর পর সবারে চিনেছি, হৃদয়ের বীণা ভাঙিয়া ফেলেছি
তবু তুমি থেকো, দুটো কথা কোয়ো ; ভুলে যেন তুমি যেও না।
আমি জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি, তুমি যেন ঘৃণা কোরো না।"

এই গানটিই ক'দিন আগে শুনলাম বহুবছর পরে, তোমাদের ঢাকারই এক মহিলার গলাতে। মানে ক্যাসেটে। ইফফাত আরা খান। কী ভালো যে লাগল কী বলব তোমাকে! এমন হাস্‌কি, সেক্সী গলা বহুদিন শুনিনি। গান শুনেই প্রেমে পড়ে গেছি। চোখেও দেখিনি কখনও তাঁকে।

তুমি ভাবছো, এ তো বিপদের কথা বড়। নাজনীন, নাসরীন, সালমা, সরিফুন, তবাসুম, ইফফাত সকলেরই প্রেমে পড়ে গেলে বোঝা যাবে যে, আমি একটি ফ্লার্ট। আসলে কারো প্রেমেই আমি পড়িনি।

www.boiRboi.blogspot.com

না, সে কথা ভুল। প্রেমে যিনি পড়েছেন তিনিই জানেন যে, প্রেমে পড়াটাই একটা আর্ট। প্রেমের গন্তব্য দিয়ে প্রেমিকের মনে বেড়া বোনা যায় না। তা তুলতে যাওয়া উচিতও নয়।

গানই হচ্ছে আমার চিরদিনের "একীলিসেস হিল"—।

কী করব বলো! শুদ্ধ ও কোমল স্বর, স্নিগ্ধ সুর আমাকে যে-ভাবে তাৎক্ষণিক ভাবে বিদ্ধ করে, তেমন ইংলিশ ইলী-কীনক্ কোম্পানীর তাজা কার্তুজও পারে না।

এই ক্ষততে রক্তক্ষরণ হয় না। বাইরে থেকে এই ক্ষত দেখাও যায় না। যারা গান শুনে কখনও মরেছে, সেই মৃতরাই শুধু জানে এই মৃত্যুর কোমল অমোঘতার কথা।

অনেকদিন পরে, অনেকক্ষণ ধরে; তোমাকে মস্ত চিঠি লিখতে পেরে বড় স্বস্তি বোধ করছি। পাপের বোধহয় কিছুটা প্রাশ্চিত্ত হলো। হলো না?

ম্যাকলাস্কিগঞ্জের মতো জায়গাতে বসেই তো চিঠি লিখতে হয় প্রিয়জনকে। পড়তে হয়, গান গাইতে হয়; গান শুনতে হয়।

তালিবে দুয়া। খুদাহ্ হাফিজ।

ভাল থেকো।

ইতি—লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জ
"ছবি"
কঙ্কা

তোড়া, কল্যাণীয়াসু,

সোমনাথের মা তাঁর মায়ের নামে বাড়ির নামকরণ করেছেন এখন। "ছবি"

গত রাতে দুটি কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়েছিলাম ! ভাবতে পারো ? মার্চ মাস। দু'দিন পরে দোল।

এই হচ্ছে ম্যাকলাস্কিগঞ্জ !

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সন্ধের পরে এখানে বাইরে বসাই যায় না একটি গরম চাদর গায়ে না-দিয়ে। মাথার চুল বিরল হলে, টুপি না-পরেও বসা যায় না। তবে আমি যখন এখানে নিয়মিত আসতাম তখন ঠাণ্ডা অনেকই বেশি ছিলো। বন অনেক গভীর ছিলো। প্রতি বাড়ির হাতাতে গাছ-গাছালির ভীড় ছিলো নিশ্চিন্ত। নিবিড়।

দোষ অবশ্য শুধু ম্যাকলাস্কিগঞ্জেরই নয়। সারা দেশই এমনি নিঃস্ব রিক্ত হয়ে উঠেছে। হয়তো পৃথিবীও।

সবকিছু সম্বন্ধেই হুঁশ হলো। কিন্তু বড় দেরী করে। বিশেষ করে আমাদের দেশে। হুঁশিয়ারিতে তখন কান দেননি কেউ, "বন সংরক্ষণ করো, গাছকে ভালোবাসো, বন্য-প্রাণী সংরক্ষণ করো" বলে রব উঠেছে এখন। ওয়ার্লড ওয়াইল্ড লাইফ-ফান্ড, ওয়ার্লড কনফারেন্স অন এনভায়রনমেণ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি ঘটনাও ঘটেছে এবং ঘটছে। অতীব আনন্দর কথা।

পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে যখন "কোয়েলের কাছে" বা "পারিধী"র মতো উপন্যাস লিখি তখন থেকে এই সংরক্ষণের ও প্রকৃতিকে ভালোবাসার যাথার্থ্য সম্বন্ধেই যতভাবে পারি এই অধমের অক্ষম কলমের মাধ্যমে বারে বারেই বলেছি। প্রতিটি বড় গাছ যে মায়েরই মতো, প্রেমিকার মতো, প্রতিটি বড় গাছে কুঠার পড়ার বা হ্যাকস-ব্লেড চালানোর আওয়াজে যে আমার নিজের শরীর আতঙ্কে শিউরে ওঠে একথাও বারবার বলেছি। সে সব কথা, সেই সবদিনে ; অশ্রুত ছিল। কিশোর কিশোরীদের মনে বনজঙ্গল ও প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রথম থেকেই এক গভীর ভালোবাসা জাগাতে চেয়েছি, "ঋজুদার" বিভিন্ন গল্পর মাধ্যমে। পেরেছি কি না, তার বিচার তোমরাই করবে।

www.boiRboi.blogspot.com

তোমরা স্বাধীনতা পেয়েছিলে নারীর সম্মান আর পুরুষের বুকের রক্ত দিয়ে, তাই আমার ধারণা ; তোমাদের স্বাধীনতা থাকবে। প্রার্থনা করবো যে, থাকুক।

বাংলা ভাষা, বাংলা গান, বাঙালী সংস্কৃতি তো বাঙলাদেশেই নতুন করে শিকড় পাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত উচ্চবিত্ত বাঙালীরা, যাঁরা সমাজের নেতৃত্ব দিতে পারতেন, তাঁদের কথা মনে করলেও দুঃখ হয়।

ভাল থেকো।

ইতি—লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জ
"ছবি"
কঙ্কা

প্রিয় মানুষী,

আজ শেষরাতে ঘুম ভাঙল একজোড়া র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গোর আওয়াজে। ওদের আওয়াজ এমন যে, মনে হয় যেন কোনো কাঁচের বাসন ভেঙ্গে টুকরো হয়ে যাচ্ছে। অথচ সেই আওয়াজে অত্যন্ত লালিত্য-মাধুর্যও আছে।

এই পাখিগুলো শেষ রাতে জাগে। বনমোরগ জাগারও অনেক আগে।

শুধু এখানেই নয়, কলকাতাতেও আমাদের ফ্ল্যাটের পাশে জে. কে. ইন্ডাস্ট্রিজের সিংহানিয়াদের আর বালিগঞ্জ পার্কের দেবসাধন বোসদের (গোপাল বাবু) বাড়ির গাছে গাছে র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গোর আওয়াজ পাই।

গতবছর গ্রীষ্মে রাণীক্ষেতে ক'দিন গিয়ে ছিলাম ভারী নির্জন এলাকাতে পাইন, হর্স-চেস্ট-নাট, চিড় আর নানা হরজাই বনে ঘেরা সুন্দর "WESTVIEW" হোটেলে। সেখানেও শেষ রাতে র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গোরা এমন করেই ঘুম ভাঙাতো। এই পাখিদের ভারতের প্রায় সব বনেই দেখা যায়।

সোমনাথ-শর্মিলা অঘোরে ঘুমোচ্ছিলো তখন। ঘুমোচ্ছিলো কাজের লোকজনও।

আমি দরজা খুলে শালটি গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এলাম।

আঃ। কী ভালো যে লাগলো! কত পুরোনো কথাই যে মনে পড়ে গেল।

চাঁদ ঝুলে আছে পশ্চিম দিগন্তে। একটু পরেই খসে যাবে বলে। পুবে, সূর্যের আভাস তখনও জাগেনি। সূর্য উঠলে, তবেই চাঁদ যাবে। চাঁদ যেন, পৃথিবীর বেবি-সিটার।

আর আছে পশ্চিমাকাশের সেই উজ্জ্বল তারাটি। যে সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমাকাশে সুন্দরী কুমারীর ফর্সা সিঁথির নিচের কাঁচপোকার টিপ-এরই মতো প্রতি সন্ধেতে দেদীপ্যমান হয়।

শেষ রাতের বাসন্তী বনের গন্ধ ভাসছে বিশ্বচরাচরে। হরজাই গন্ধ।

এখন হাওয়া নেই। চৈত্র মাসে রাতের এই শেষ প্রহরে হাওয়া থাকে না এদিকে। বৈশাখে

www.boiRboi.blogspot.com

শুরু হবে হাওয়া। জোর হবে ভোরের থেকে। তারপর ক্রমশ জোর হতে হতে 'লু' হয়ে উঠবে।

কত গাছ, পাতা, ফুল, ঘাস ; কত লতার গন্ধে, শিশিরের গন্ধে, লাল মাটির গন্ধে, পাহাড়ের শিলাজতুর কত শতাব্দী ধরে জমে-থাকা কামের গন্ধে, মিলে মিশে সেই চাঁদ-পাহারার নক্ষত্র-জ্যোৎস্নায় হাসছে সমস্ত প্রকৃতি।

হাসছে পর্ণমোচী বন ; আমার পর্ণমোচী মন।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জ যেন আমায় বললো, নিরুচ্চারে, এসেছো? এসো, এসো। বললো, সুপ্রভাত! সুপ্রভাত! তুমি আমাকে বড় ভালোবেসেছিলে একদিন। জানি, জানি। ভালোবাসার দাগ যে থেকে যায় দুর্মর কালিরই মতো। দূরে গেছো তো কী হয়েছে! আমি তোমাকে ভুলিনি। এসো, এসো, আরো কাছে এসো।

আমি বললাম, অস্ফুটেও নয় ; নিরুচ্চারে, ধন্যবাদ! ম্যাকলাস্কিগঞ্জ ধন্যবাদ। কঙ্কা, লাপরা, হেসালঙ! তোমাদের অনেক ধন্যবাদ।

বললাম, ধন্যবাদ মিসেস কার্নি, মিস্টার প্যাট গ্লাসকিন, মিস্টার বয়েলস, ধন্যবাদ, মানি ; মুঞ্জরি।

কালকে লক্ষ করিনি। আজ লক্ষ করে দেখলাম, চেরী গাছ দুটোর একটাও নেই।

মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। ফলসা গাছ দুটোও নেই। ওরা যে আমার পরমাত্মীয় ছিলো। কত রকম পাখি যে এসে বসতো ঐ চেরী দুটো আর ফলসা গাছ দুটিতে! বারবেট, মিনিভেট, প্যারাকিট, বুলবুলি। যত না খেতো, তার চেয়ে নষ্ট করতো বেশি ওরা। হানিসাক্‌ল, মৌটুশকি নানারকমের। পাখির ডাকে সন্ধে হতো ; পাখির ডাকে ভোর।

অপর্ণা সেন-এর আমলে বা তার মালিকানাতে যখন এ বাড়ি ছিলো তখনই বাড়ির মালি নাকি গাছগুলিকেও কেটে বিক্রি করে দিয়েছিলো। পরে শুনলাম, সোমনাথের কাছে। মালকিন অবশ্যই জানতেন না মনে হয়।

কিছুদিন হলো মানুষের সর্বগ্রাসী খিদে আর লোভ বনের গাছ তো নষ্ট করেছেই, ঘরের গাছ পর্যন্ত নষ্ট করেছে। মানুষে বাস্তুসাপকে পর্যন্ত এক বিশেষ চোখে দেখতো চিরদিন ; সেই সাপ বিষধর হলেও তাকে মারতো না আগে। আর আজ বাস্তু-গাছেরও নিস্কৃতি নেই মানুষের হাতে।

এই সমস্যার কথা বিরিসা মুণ্ডার এলাকার পটভূমিতে মুণ্ডাদের নিয়ে লেখা "সাসান্‌ডিরি" উপন্যাসে স্পষ্ট করে বলেছি। জানি না, পাঠক-পাঠিকাদের কানে সেই স্বর পৌঁছেছে কিনা। চেঁচিয়ে বললেই যে সবসময়ে তা শোনা যাবেই এমন তো নয়!

কিন্তু বললে কী হবে! যা হবার, যা অনিবার্য ; তাই ঘটছে ভারতের সর্বত্র।

আমার মনে হয়, মানুষে আর গাছের এবং মানুষে-মানুষের সম্পর্ক সমগোত্রীয়। গড়ে তুলতে, ভালোবাসা দিয়ে পুষ্ট করতে লাগে দীর্ঘকালের যতন, আদর ও প্রয়াস। আর নষ্ট করতে লাগে মাত্র পাঁচ মিনিট। কে বোঝে বলো! যাঁরা বোঝেন বা বুঝেছিলেন তাঁদের কণ্ঠস্বর সময়ে কেউই শোনেননি। এখনও যে সকলে শুনছেন এমন নয়।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জ-এর কঙ্কার সোমনাথদের বাড়িটি ; যার নাম আমার মালিকানার সময় রেখেছিলাম 'THE TOPPING HOUSE' তার প্রকাণ্ড হাতার মধ্যের ঝাঁটি জঙ্গলে অগণ্য

তিতির (PATRIGE) ও বটের (QUAIL) ছিলো।

একবার পুজোর ঠিক পর পর হাজারীবাগ থেকে আমার শিকারী ও অ্যাকাউন্ট্যান্ট বন্ধু গোপাল সেন, গোমিয়ার ইন্ডিয়ান একসপ্লোসিভস-এর সুব্রত চ্যাটার্জি (সেও হাজারীবাগেরই বন্ধু) এবং মহম্মদ নাজিমের সঙ্গে (হাজারীবাগী) একই সঙ্গে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে এসেছিলাম।

গোপাল ছিলো ইনকরিজিবল পোচার। আপত্তি করলে, তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতাতে সে বলতো, ছাড়ো তো তোমার বকোয়াস ! যে দেশে পথের উপরে মানুষে মরে পড়ে থাকে, কাকে চিলে খুবলে খায় মৃতদেহ, যে-দেশে এক মানুষের পশ্চাৎদেশ আকছার ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে গুলিতে অন্য মানুষে, অন্য মানুষদের তাতে একটুও মাথা ব্যথা হয় না, সে-দেশে একটু-আধটু আইন ভেঙে দু চারটে তিতির-বটের শিকার করলে কী এমন ইমানদারীর ইন্তেকাল হবে ? সব ব্যাপারই রিলেটিভ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করো।

কথাটা অবশ্য একেবারে ফেলনা নয়। স্বাধীনতার পর থেকে এই উপমহাদেশে কোন আইনটাই মান্য করেছে মানুষে ? শুধু আইন-ভাঙা শিকারীদের উপরই এতো রাগ করার কি আছে ! খুদাহকি কসম্। আমি কিন্তু ১৯৭২-এর পরে আমার বন্দুকে বা রাইফেলে একটি গুলিও ছুঁড়িনি। পিস্তল ছুঁড়েছি, ছুঁড়ি ; হাত ঠিক রাখতে। যাতে খারাপ মানুষকে উদ্দেশ্য-করা গুলি না ফসকায়।

গোপাল ম্যাকলাস্কিগঞ্জে পৌঁছেই উল্লসিত হয়ে বলেছিলো, বাঃ ! এমন তো কোথাওই দেখিনি গো লালসাহেব। কোনো বন-বাংলোতেই নয়। জানালা দিয়ে নল গলিয়ে ঘোড়া দাবালেই তো তিতিরের গুষ্টি-নাশ। বটি-কাবাব আর গুলহার-কাবাব খাওয়া যাবে হুইস্কির সঙ্গে।

হেসে ওকে নিবৃত্ত করে বলেছিলাম, তা পাওয়া এবং খাওয়াও যাবে। কিন্তু বাংলোর হাতার মধ্যে যে গুলি ছোঁড়া বারণ।

গোপাল বলছিল, কোন আইনে ? শিবঠাকুরের দেশ নাকি ? কিসকা কানুন ?

হেসে বলেছিলাম, লালামিঞার কানুনে।

অগত্যা ওরা বাড়ি থেকে হেঁটে কিছুটা গিয়ে তিতির বটের মেরে নিয়ে এসেছিল।

বাবুর্চিখানাতে নাজিম সাহেব আর ও মিলে 'বটি-কাবাব' বানিয়েছিল। ওসব কাবাব বানাতে যা আদর-যতনের প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ আদর যতনে একটি সুন্দরী কন্যার জন্ম দেওয়া যায় অবহেলায়। শিককাবাবকে গোপাল আর নাজিম সাহেব কাবাবের মধ্যে গণ্য করতেন না। ওঁরা ছিলেন রান্নার পার্টনার। আমি আর সুব্রত ছিলাম খাওয়ার পার্টনার।

আজকে নাজিম সাহেব নেই। গোপালও চলে গেলো গত পুজোর আগে হ্যাপী-হান্টিং গ্রাউন্ডস্-এ। চলে গেছে ইজাহার, টুটিলাওয়ার জমিদার। চলে গেছে শামীম মিঞা, গরীব ঘড়ির দোকানী। আমিও গিয়ে পৌঁছলেই একেবারে দোজখ্ গুলজার হয়। ওরা নিশ্চয়ই অধীর প্রতীক্ষাতেও আছে। অনেক গল্প হবে, খাওয়া-দাওয়া ; রসিকতা। ফিরে আসবে পুরনো সব দিন ; সুখস্মৃতি। মিশ্র খুশবু।

গোপাল আর নাজিম সাহেব দুজনেই বড় রসিক মানুষ ছিলেন। সুব্রতও রসিক। তবে গোপাল-সুব্রতর মধ্যে "তিড়ি" মারাতে কে যে বেশি দড় ছিলো তা আমি আজও বুঝে উঠতে

www.boiRboi.blogspot.com

পারিনি। দুজনেই প্র্যাকটিকাল জোকস-এ একেবারে ডক্টরেট।

দ্যাখো, কত কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে এলোমেলো।

তুমি যদি আমার লেখা মনোযোগ সহকারে পড়ে থাকো তবে তো এঁদের ভাল করেই চেনো। আসলে, চলে-যাওয়া অথবা বর্তমান বন্ধুদের সম্বন্ধেও দুটো ভালো কথা বলার সুযোগ এলে, বলে, ঋণ স্বীকার করতে চাই। অন্যভাবে তাদের ঋণ শোধার কোনোই তো উপায় নেই আমার। সঙ্গ যে দেবো, সে সময়টুকুও নেই।

বিশ্বাস করো। থাকলে তো তোমার কাছে কবেই চলে যেতাম। গামছা দিয়ে পাতা দই খেতাম, তোমার হাতের রান্না ইলিশ খেতাম বরিশালের "বালাম" চাল দিয়ে, আর রান্নাঘরে মোড়া পেতে বসে তোমাকে গানের পর গান শোনাতাম।

জীবনে সময়ের চেয়ে মহার্ঘ্য আর কিছুমাত্রই নয়। তোমার বয়স যত বাড়বে ততই তা বুঝতে পারবে। এখন বুঝবে না, চেষ্টা করেও।

"THE TOPPING HOUSE" এ এতোদিন পরে ফিরে না এলে তো এতো সব পুরোনো স্মৃতি মনেও আসতো না।

"বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে", "জঙ্গল-মহল", "বনবাসর" ইত্যাদি বহু লেখাতেই গোপাল, সুব্রত এবং নাজিম সাহেবের প্রসঙ্গ এসেছে ঘুরে ঘুরে। তুমি ওঁদের নিশ্চয়ই চেনো। তাই ওঁদের কথা বললাম। এমনকি "মাধুকরী"তেও। ছদ্মনামে। লেখার মতো সব লেখাই জীবন থেকেই উঠে আসে। পৃথিবীর সমস্ত মহত্তম সাহিত্যই আত্মজৈবনিক।

গোপালদের হাজারীবাগের বাড়ি "পূর্বাচল" তো আমার বহু লেখার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। প্রথম যৌবনের বেহিসাবী দিনগুলির স্মৃতি তো আমৃত্যু জ্বলজ্বল করবে। তা তো ভোলার নয়!

আমার চলে-যাওয়া বন্ধু গোপালের প্রসঙ্গ ওঠাতে মনে পড়ে গেল, "বনবাসর" বইটির উৎসর্গ ছিলো এইরকম ঃ

"টিটি পাখি,
গেরুয়া মাটি,
কুসুমভার নিমগাছটি,
টাটিঝারিয়ার চা,
টুটিলাওয়ার চাঁদ
এবং
হাজারীবাগের গোপাল সেনকে।"

দে'জ পাবলিশিং এখনও সমানে বিক্রী করে যাচ্ছেন "বনবাসর"। তিরিশ বছর আগে প্রকাশিত বইটি।

গোপাল হাজারীবাগের বাসিন্দা ছিলো না। তবে বছরের বেশ অনেকটা সময় সেখানেই কাটাতো। তার প্রথম এবং শেষ প্রেম ছিলো হাজারীবাগ। কলকাতাতে বেশিদিন থাকলে ওর দমবন্ধ হয়ে আসতো।

সিঁদুর গাঁ, বনগাওয়াঁ আর কুসুমভা ছিলো ওর স্বপ্নের দেশ।

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

হাজারীবাগের মন্থর জীবনযাত্রার মধ্যে ওর "লেট-লতিফ" লাইফ-স্টাইল স্বস্তিও পেত। বেহেস্ততে যদি তড়ি-ঘড়ি সব কিছু করতে হয়, ঘড়ি ধরে চলতে হয়, তবে বন্ধু আমার স্বর্গে গিয়েও সুখে থাকবে না। বেচারী! ঘড়ির সঙ্গে ওর ছিল জাত-দুশমনি। প্রচণ্ড নফরৎ।

তোমরা হয়তো অনেকেই জানো না এবং জানবার কথাও নয়, যে মহাশ্বেতাদিও (ভট্টাচার্য) ম্যাকলাস্কিগঞ্জে একটি বাড়ি কিনেছিলেন আমার বাড়ি থাকাকালীনই। অসিতবাবুও আসতেন। সুদর্শন, সৌম্য, সভ্য, মিতভাষী, ভদ্র পুরুষ।

মহাশ্বেতাদিদের বাড়িটি ছিলো খুবই ছোট। সম্ভবত এক কামরার। কোনোদিনও ভিতরে যাইনি। ফরেস্ট অফিসের ঠিক উল্টোদিকে। বাড়িটাতে একটাই অসুবিধে ছিলো, যদি তাকে অসুবিধে বলা যায়; যে, কুঁয়ো ছিলো না। ফরেস্ট অফিসের কুঁয়ো থেকে জল আনতে হতো।

যখন যুগান্তর গোষ্ঠীর 'অমৃত' সাপ্তাহিকে "একটু উষ্ণতার জন্যে" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছিলো তখন একদিন মহাশ্বেতাদির সঙ্গে হঠাৎ দেখা শিশিরমঞ্চের এক অনুষ্ঠানে। এক কোণে ডেকে নিয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করে বললেন, তুইই সর্বনাশ করলিরে জায়গাটার লালা। তোর এই উপন্যাসই ম্যাকলাস্কিগঞ্জের "কাল" হবে। ট্যুরিস্ট স্পট হয়ে উঠবে জায়গাটা। আমাদের পালাতে হবে।

মহাশ্বেতাদির ভবিষ্যৎবাণী ফলেছে। ম্যাকলাস্কিগঞ্জের হয়তো "কাল" হলেও হতে পারে আমার কিন্তু খুবই আহ্লাদ হয়েছে জেনে যে, আমার কলম তাহলে সামান্য ক্ষমতা ধরে! কোনো স্থানকে বিখ্যাত বা কুখ্যাত করার ক্ষমতাও তো ক্ষমতা। তবে ম্যাকলাস্কিগঞ্জে থাকার জায়গা নেই বললেই চলে। তাই এই "খ্যাতি" বহু মানুষকে দুর্ভোগেও ফেলেছে।

মহাশ্বেতাদি অবশ্য ম্যাকলাস্কিগঞ্জে ট্যুরিস্ট স্পট হয়ে ওঠার অনেক আগেই সম্পর্ক ছেদ করেছিলেন ও-জায়গার সঙ্গে।

পালামৌর বেতলা, আজ যে এত বিখ্যাত ট্যুরিস্ট স্পট তার পেছনেও হয়তো অবদান সামান্য কিছু আছে, এই অধমের।

বছর সাত-আট আগে শেষ যেবারে গেছিলাম পালামৌতে এবং কেঁড় বাংলোতে ছিলাম ("জঙ্গলের জার্নাল"-এ লিখেছি) তৎকালীন গেম-ওয়ার্ডেন সঙ্গম লাহিড়ী আমাকে বলেছিলেন যে গত পুজোর আগে প্রত্যেক বাঙালী ট্যুরিস্টকে ওঁরা একটি কোয়েশ্চেনেয়ার দিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে নব্বুই ভাগই বলেছেন, যে "কোয়েলের কাছে" এবং "কোজাগর" উপন্যাসদুটি পড়েই তাঁরা ঐ অঞ্চলে এসেছেন।

শুনে, খুবই আনন্দ হয়েছিল। চোখে জল এসে গেছিল। যে-লেখককে আর কোনো পুরস্কারই কেউ দেয়নি, তার কাছে পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ের এই উচ্চতম পুরস্কারই তো সবচেয়ে বড় পুরস্কার! এর চেয়ে মূল্যবান পুরস্কার আর কীই বা হতে পারে!

আমতলিতে সোমনাথদের দ্বিপ্রাহরিক প্রাক-হোলি আড্ডার আসর সাজানো হচ্ছে। অবশ্য আজ অবধি মানুষ তো আমরা তিনজন। গুড্ডুকে বাদ দিলে, সোমনাথ, শর্মিলা আর আমি। ডাক পড়েছে। যেতে হবে। এখন থামি।

পরে আবার লিখব। আজ না পারলে, কাল।

www.boiRboi.blogspot.com

কালকে বিলম্বিত সকালে সোমনাথের কিছু অতিথি আসবেন। শুনে পর্যন্ত রীতিমতো কুঁকড়ে আছি।

আগে জানতামও না। জানলে, হয়তো আসতামই না। তাঁদের যদি আমার পছন্দ না হয়, অথবা তাঁদের যদি আমাকে পছন্দ না হয়; তবেই দুঃখের ব্যাপার হবে।

কথা বলতে বসে, কত অপ্রাসঙ্গিক কথাই তোমাকে বললাম। এ-তো কথা নয়; এলোমেলো, এলেবেলে।

যেন, চানঘরে গান।

ইতি—

তোমার লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জ
"ছবি"
বিহার

তোড়া,
কল্যাণীয়াসু,

জানি, কোলকাতা ফিরলে একসঙ্গে তোমার অনেকগুলি চিঠি জমে থাকবে আমার জন্যে। কিন্তু তোমাকে এতো বড় বড় চিঠি লিখলাম এখান থেকে, তাই কিছুদিন হয়তো চিঠি পাবে না আর।

নীড়ে-ফেরা পাখি যেমন নীড়ে ফিরে, তার নীড়ের উচ্চাসনে বসে চারধারে চেয়ে খুশি হয় ; ঘরে-ফেরা আমিও খুশি হই অপেক্ষমান চিঠির পাহাড়ের দিকে চেয়ে। এ আমার বিশেষ অর্জন। এ পারিবারিক বা পৈতৃক সম্পত্তি নয়। এ একেবারেই অন্য অর্জন। এর জন্যে নিজস্ব যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।

চিঠি পেতে পেতে এমনই অভ্যেস হয়ে গেছে, বিশেষ করে তোমার চিঠি ; যে চিঠি না পেলে মনে হয়, দিনটাই বৃথা গেলো।

কম করে, গড়ে, প্রতিদিনে দশ থেকে পনেরোখানি চিঠি পাইই, উত্তরও তো দিতে হয় ! মুশকিল হয়, কোলকাতা ছেড়ে বাইরে বেরুলে। আর বেরুতে তো হয় প্রায়ই। গড়ে দশ দিন অন্তর। ফিরে এসে চিঠির উত্তর দিতেই সময়ের সিংহভাগ চলে যায়। লেখা হয় না ; পড়া হয় না। গান হয় না, আঁকা হয় না, হাঁটা হয় না, কাজ হয় না। বাইরে থেকে যেদিন ফিরি, সেদিন রাত দুটো বেজে যায়ই ঘুমুতে যেতে, সব চিঠি পড়ে। কিন্তু তবু চিঠি যে পাই, এতো চিঠি ; এতোজনের কাছ থেকে, এ জন্যে ভারী কৃতজ্ঞ লাগে। আমার পাঠক-পাঠিকারাই তো আমার সবটুকু জোর ; আমার মেরুদণ্ড। তাঁরা আছেন বলেই তো আমি আছি।

"আমি মেয়েদের লেখক" এমন একটি অনুযোগ প্রায়ই আজকাল করা হয়। তুমিও এর উল্লেখ করেছিলে। যদি তাই সত্যি হয়, তবে আমি গর্বিত বলে মনে করি নিজেকে।

www.boiRboi.blogspot.com

মেয়েরা অন্য কোনো প্রজাতিতো নন ! তাই যাঁরা এমন অভিযোগ করেন তাঁদের শিক্ষা এবং মানসিকতার মান সম্বন্ধে স্বভাবতই সন্দেহ জাগে।

তাছাড়া, আমি মনে করি, যুগে যুগে, কালে কালে, সাহিত্য-কাব্য-সংগীত-শিল্পকলার ক্ষেত্রে মেয়েদের মতটাই প্রণিধানযোগ্য এবং স্থায়ী বলে প্রতীয়মান এবং প্রমাণিত হয়ে এসেছে সব দেশেই।

কাল রাতে যে কী জ্যোৎস্না ফুটে ছিলো তা তোমাকে কী বলব ! যেন শান্তিনিকেতনের কোপাই-এর পাশের কাশফুল। চাঁদের আলোতে ফুটফুট করছিল চারদিক। বন-প্রান্তর, পাহাড়শ্রেণী ; বনবাস-এর হাতার বনবীথি সব যেন ভেসে যাচ্ছিলো এই জ্যোৎস্নাতে। বাড়ির সামনের দিকের সব বিজলী আলো নিভোনো ছিলো। সোমনাথ ঠিক তখন কোথায় ছিলো, বলতে পারব না। শর্মিলা একটি কমলা আর সবুজ মেশানো শাড়ি পরে আমার সামনে বসেছিলো। মুখোমুখি, ইজিচেয়ারে ; বাড়ির বাইরে। কী ভালো যে দেখাচ্ছিলো ওকে কী বলব ! সবে চান করে উঠেছিলো। বনজ মিশ্রফুলের গন্ধ ও ওর গায়েমাখা সাবানের গন্ধে ম' ম' করছিল চারদিক। খুব লম্বা, অক্টাগনাল দুটি ইমিটেশন-জুয়েলারীর দুল পরেছিলো। রুপোলি। ওর মাথা নাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দুলদুটি চিকচিক করছিল চাঁদের আলোয়।

আমার বাবা বলতেন, সৌন্দর্যও বিধাতার এক বিশেষ দান ! সৌন্দর্য আদৌ অবহেলার বস্তু নয়।

বাবা অবশ্য একথা বলতেন আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্যে। তখন এক তরুণী তন্বী সুরুচিসম্পন্না কন্যার গান শুনে এবং ফিগার দেখে তাঁকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করব না এমন ধনুকভাঙ্গা পণ করেছি। বাবা-মাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, বিয়ে যদি আদৌ করি তাহলে সেই মেয়েকেই করব। নচেৎ চিরকুমার থাকব। "খেলা যখন" পড়েছো ? পড়েছো নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতের বহু মানুষই আছেন তাতে।

তখন আমার বয়স পঁচিশ। এবং সেই মেয়েটির সঙ্গে পরিচয় বলতেও কিছুমাত্র ছিলো না। তবে দেখা হতো মাঝে-মধ্যে। গানও শুনতে পেতাম। তবে ভীড়ে। আমাদের যৌবনে অধিকাংশ মূঢ় যুবকই মোহকে, INFATUATIONকেই প্রেম বলে জানতাম। যুবতীরা যুবকদের চেয়ে চিরদিনই বেশি বুদ্ধি ধরেন। তাঁরা কী ভাবতেন তা বলতে পারব না। COURTSHIP করার সুযোগও ছিলো না। অন্ততঃ আমার। কারণ আমার পরিবার ছিলো প্রচণ্ড রক্ষণশীল। সেই কারণেই প্রেম-বিবাহতে এত আপত্তি ছিল।

বাবার বাড়ির উল্টোদিকের বাড়ির একতলাতে সেই সময়ে জনৈক মিস্টার ঘোষ সপরিবারে ভাড়া থাকতেন। তাঁদের বাড়িতে, ভদ্রলোকের তিন বোনঝি প্রায়ই বেড়াতে আসতো। তিন বোনই ছিলো পরমা-সুন্দরী। ডানা-কাটা পরী। প্রেম-বিবাহের যাবতীয় অশুভ প্রভাব থেকে আমাকে বাঁচাতেই এই প্রাণান্তকর চেষ্টা ছিলো বাবা-মায়ের। বড় মেয়েটিকে বাবা-মায়ের খুবই পছন্দ হয়েছিলো। সৌন্দর্যেরই কারণে। ছোট বোনটি, নুপূর ; এখন আই. পি. এস. রজত মজুমদারের স্ত্রী।

যাই হোক ; বাবা মা, অনেক চেষ্টা করেও আমাকে ফেরাতে পারেননি।

তবে আমার পঁচিশ বছর বয়সের সমস্ত মেধা-বুদ্ধি জড়ো করেও তো বাবার পঞ্চান্ন বছরের

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

বুদ্ধির এবং জীবনের অভিজ্ঞতার সমান সমান হতো না !

উদ্ধত, গর্বিত, অনভিজ্ঞ তারুণ্যের সঙ্গে বুনো শুয়োরের খুবই মিল আছে।

এখন বুঝি।

তখন বুঝতাম না।

এখন পেছন ফিরে তাকিয়ে ভাবি, বিয়ে করা আর সাঁতারু মিহির সেনের সারা অঙ্গে গ্রিজ মেখে ইংলিশ-চ্যানেল পেরুবার জন্যে শীতের দিনের বরফ গলা জলে ইংল্যান্ডের ডোভারে কিংবা বেলজিয়ামের অস্টেন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়া ; প্রায় সমগোত্রীয় অ্যাডভেঞ্চার।

বাবার কথা মনে পড়ে গেছিলো, সেই সন্ধেতে শর্মিলার সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে। দেখছো তো ! একেই বলে GRASSHOPPER MIND. আজকাল এমনই ফড়িং-মনা হয়ে গেছি যে, বলার নয়। মনটা কেবলই মেঘলা দুপুরের জামতলিতে এক্কা-দোক্কা খেলে বেড়ায় ছায়াতে-রোদ্দুরে। এক ভাবনা টপকে অন্য ভাবনাতে পৌঁছয়। কোনো কাজ, কোনো ভাবনাই শেষ হয় না ; এটা ছেড়ে ওটা, ওটা ছেড়ে এটা। ফলে, হয় না কোনো কাজই।

কী বলছিলাম ? হ্যাঁ ! শর্মিলাকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছিলো সেই চাঁদের আলোতে !

ফুলের গন্ধ, বনের গন্ধ, মনের গন্ধ সেই রূপোঝুরি রূপবন্ধর মধ্যে এমন এক আমেজ, আবেশ সৃষ্টি করেছিলো যে, মনে হচ্ছিলো অনন্তকাল ওর সামনে অমন করেই বসে থাকি। রূপসুধা পান করি নিরবধিকাল। অনন্তকাল বসে থাকতে থাকতে ফসিল হয়ে যাই। প্রস্তরীভূত হয়ে যাই। যাই, যাই ; কয়লা হয়ে যাই। আগামীকাল কোল ইন্ডিয়ার অম্লান বোস এসেই খুঁড়ে বের করুক ফসিল হয়ে যাওয়া আমাকে !

কিন্তু অত হাজার বছর অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরেই সোমনাথ এসে চটকা ভাঙিয়ে দিয়ে বললো, কী করছো দাদা ?

ভাবলাম, কিছুক্ষণ মট্‌কা মাইর‍্যা ইজিচেয়ারে পইড়্যা থাকি। কিন্তু হইলো কই আর ? সোমনাথ আইস্যা কইলো, ঠাণ্ডা ধইর‍্যা যাইব গিয়া। ইট্টু সোমরস খাইবা না কি কও ? দাদা। খাইলে আম্মো ইট্টু পেরসাদ পাই।

"দুষ্টর ছলের অভাব নাই।"

তা, আমি কইল্যাম, তাইলে হউক।

"হউক তাইলে।"

সোমনাথ রিপিট করলো।

হোলির গান ভেসে আসছে কঙ্কাবস্তির দিক থেকে। তবে এ গান ওরাওঁদের গান নয়। স্থানীয় বিহারী গোয়ালারা গাইছে মাদল বাজিয়ে। একটি পংক্তিই বারে বারে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছে। তারই কী গমক, ঠমক, ঘটাকারী—যেন হীরে চমকাচ্ছে। পংক্তিটি হলো "প্রীত ভইল্ মধুবনোঁয়া রামা তোরা মোরা।" পরের বার চড়িয়ে আরেকজন গাইছে "প্রীত ভইল মধুবনোঁয়া রামা তোরা মেরা"। দেখতে দেখতে এমন করেই সুর চড়তে লাগল যে তারসপ্তকে আর সে গলা আঁটবে বলে মনে হলো না। একজন আবার মাঝে অন্য স্বরে OBLIGATO র বা হার্মোনির এফেক্ট আনছিলো। তবে, স্বেচ্ছায় কী না, জানিনা।

শর্মিলা বললো, ওরা কি খেয়েছে গো লালাদা ? মহুয়া ?

www.banglaboi.blogspot.com

আমি বললাম, না। কয়েৎবেল। নয়তো পোড়া মবিল।

আমার চোখের ফ্রেমে শর্মিলার যে ছবিটি বাঁধা পড়েছিলো, তার চারপাশে সবে কল্পনার ফ্রিল লাগিয়ে লাগিয়ে ছবিটিকে সম্পূর্ণ করছিলাম ঠিক সেই সময়েই সোমনাথ এসে কথা বলায় ছবিটা নড়ে গিয়েই ভেঙে গেলো। যেমন করে, শীতের দুপুরের রোদ-পড়া পাহাড়ী নালার উজ্জ্বল স্বচ্ছ জলের মধ্যে কুচো মাছের ঝাঁক ভেঙে যায় ; হঠাৎই খুশি অথবা দুখী হয়েছে বলে।

ভাগ্য ভালো যে, গুলি করেনি সোমনাথ আমাকে। পিস্তল সঙ্গে নিয়ে এসেছে ও। আগে জানলে, আমিও আমারটা আনতাম!

কথাটা চিন্তার। আমাকে দেখে নাকি কোনো জ্যোতিষী ছেলেবেলায় বলেছিলেন যে, আমার মৃত্যুর কারণ হবে হয় গাড়ি, নয় নারী ; নয় বন্দুক।

কী সাংঘাতিক সাসপেন্স। এই কারণেই শিশুকাল থেকে নারীদের ভয় পেয়ে আসছি।

অন্তত তুমি আমার মৃত্যুর কারণ হয়ো না তোড়া।

ইতি—লেখক

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জ
"ছবি"

তোড়া, ঈত্বরগন্ধী,

সবে আমরা পেয়ারাতলিতে প্রাতরাশ খেয়ে উঠেছি। সোমনাথের অতিথিরা এসে পৌঁছলেন বেলা দশটা নাগাদ।

অম্লান এবং তাঁর স্ত্রী সুলোচনা। ওদের দুই কন্যা। বাসু।

সুবীর ও ঝুনু। ওদেরও দুই কন্যা। ঘোষ।

তাপস ও টুটু। মুখার্জি। দুজনেই আর্কিটেক্ট। ওঁদের দুই কন্যা, সঙ্গে এক কন্যা গেছিল।

সুবীর, ইন্টিরিয়র ডেকরেটর। অম্লান, কোল ইণ্ডিয়াতে আছে।

সোমনাথের চরিত্রে এক আশ্চর্য চৌম্বকশক্তি আছে। সববয়সী মানুষই ওকে বন্ধুভাবে দেখেন। সারাদিনে রাতে হয়তো ও কুল্লে দশটি "বাক্যি" বলে। তাও বলে কিনা সন্দেহ। খুবই স্বল্পবাক, বুদ্ধিমান এবং অ্যামিয়েবল্ ছেলে। আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। বলেছিলাম কি আগে? মালয়ালা মনোরমার তাপস গাঙ্গুলির কথাতে ঃ "হি গ্রোজ ইনটু আদার্স।"

অম্লান, গড়িয়াহাট বাজার থেকে ইয়া ব্বড় বড় কই মাছ নিয়ে এসেছিল মস্ত এক হাঁড়ি। ম্যাকলাস্কিগঞ্জ হচ্ছে গরু, শুয়োর, মুরগীর জায়গা। এখানে মাছ খুব কমই পাওয়া যায়। রাঁচী থেকে আনলে তবেই জোটে। তাই কইমাছ এখানে অবশ্যই "ডেলিকেসি"। তেল-কই রান্না হয়েছিলো দুপুরে। সুলোচনা আর ঝুনু দুজনে মিলে রেঁধেছিলো। টুটু বুদ্ধি জুগিয়েছিলো।

ওরা সকলেই একই সঙ্গে রাঁচী এক্সপ্রেসে পৌঁছে রাঁচী থেকে গাড়ি নিয়েই এসেছিলো।

আরও এনেছিলো "লাউডন স্ট্রিট ডেইলি" থেকে শুয়োরের নয়, চিকেন-সসেজ। এবং সালামি। দিল্লীর কাছের ওবেরয়-এর ফার্ম থেকে ওগুলো আনায় "লাউডন স্ট্রিট ডেইলি ;" লাউডন স্ট্রিটের নতুন-হওয়া দোকানটি। খুবই একস্পেন্সিভ। কিন্তু অনবদ্য। ইয়ারোপিয়ান বা ইংলিশ বলে অনায়াসে চালিয়ে দেওয়া যায় ঐসব প্রডাক্ট। বড়লোকদের সঙ্গে বেড়াতে গেলে খুবই মজা। নানা দুর্লভ খাদ্য—পানীয়ে সবসময় তুরীয় হয়ে থাকা যায়।

এবারে সত্যিই যাকে বলে, পুরো "বডি ফেলে" দিয়েছিলাম ওদের উপরে। গাড়িতে

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

সোমনাথদের সঙ্গে কলকাতা থেকে ম্যাকলাস্কিগঞ্জ এবং সেখান থেকে গাড়িতে রাঁচী। আবার গাড়িতে রাঁচী এবং ফার্স্ট ক্লাস এ. সি. তে অম্লান এবং সুবীরদের সঙ্গে কলকাতা ফেরা। পাঁচ নয়াও খরচ করতে দেয়নি ওরা।

সংসারে বোধহয় এমনই ঘটে। অগণ্য মানুষদের সঙ্গে করে বিভিন্ন জায়গাতে বেড়াতে নিয়ে গেছি। তারা পকেট থেকে পার্স বের করতে চাইলেই বলেছি ঃ "এবার তোমরা আমার অতিথি। একবার আমাকে তোমরা কোথাও নিয়ে যেও। সেবারে আমার পার্স আমি কলকাতাতেই ফেলে আসব।"

কিন্তু আজ অবধি তেমন করে আমার দুই জঙ্গলের বন্ধু গোপাল সেন আর সুব্রত চ্যাটার্জি ছাড়া একমাত্র সোমনাথই নিয়ে এলো। অবশ্য ভায়েরাও করে।

যাদের কাছে প্রত্যাশা থাকে অনেক তাদের কেউই প্রত্যাশা পূরণ করে না। যাদের কাছে আদৌ থাকে না, দেখা যায় ; তারাই ঝাঁপিয়ে পড়ে করে। ভারী অবাক লাগে। অনেকই কৃতজ্ঞতা জমলো।

টুটু মুখার্জি স্বয়ম্ভর নারী। সপ্রতিভ ; ব্যক্তিত্বময়ী, সুরুচিসম্পন্না ও সুন্দরী, যাদের দেখার চোখ আছে, তাদের কাছে। তার স্বামী তাপস, ভারী ভালোমানুষ। রাম-ভক্ত। RUM। সোমনাথের মতো। স্বল্পবাক। চেইন- স্মোকার। দুবাইতে থাকেন। তিনিও আর্কিটেক্ট।

টুটুর সঙ্গে আলাপিত হবার বছর পনেরো কী তারও আগে এই ম্যাকলাস্কিগঞ্জেরই আদলে পুরোপুরি কল্পনা করে নেওয়া ব্যাকড্রপ, "পলাশতলির" পটভূমিতে লিখেছিলাম একটি উপন্যাস। নাম "পলাশতলির পড়শি" তাতে দুটি নারী চরিত্র ছিলো। টিটি ও টুঁই। আশ্চর্য! তারাও আর্কিটেক্ট। তাই মনে পড়ে গেলো। তুমি পড়েছো কি "পলাশতলির পড়শি"?

একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। আজকে বাইরে চাঁদের আলোতে ওদের জোর আড্ডা বসবে। তাঁবুও খাটানো হয়েছে একটা। ক্যাম্পফায়ারের আয়োজন হচ্ছে তারই সামনে। ততটা আগুনের উত্তাপে মৃদু শীতের মোকাবিলা করার জন্যে নয় ; যতটা বার-বী-কিউ করার জন্যে। একটি "সাকলিং-পিগ" যোগাড় করেছে সোমনাথের মালি। মহামূল্যে।

জীবনে আড্ডা মারার সময়ে আড্ডা মারার সুযোগই পাইনি এবং বাবার অত্যন্ত কড়া শাসনের জন্যে আদৌ মারতে পারিনি। তাছাড়া, স্কুলের গণ্ডী পেরুনোর পর থেকেই তো অফিসে ঢুকতে হয়েছিলো। স্কুল জীবনেও অত্যন্ত কড়াকড়ি ছিলো। প্রথম যৌবন থেকেই আমার জীবনের আঠারো ঘন্টা নিশ্ছিদ্র ছিলো কাজে ও খেলাতে। কাজ বলতে, শুধু পড়াশুনো নয়, অনেক কিছুই বোঝাচ্ছি। সেগুলোও তো কাজই! এবং খেলাও বটে। তবে তফাৎও ছিলো। বাবা বলতেন ঃ "কাজের সময়ে কাজ, খেলার সময়ে খেলা।" এ দুটিকে না-মেলানোর শিক্ষা ছেলেবেলা থেকেই গড়ে উঠেছিলো। এখন ভাবি যে, আড্ডা যে মারিনি ; একদিক দিয়ে তা ভালোই হয়েছে। আপশোষ-এর প্রয়োজন নেই কোনো। একা না-থাকতে শিখলে ; নিজে নিজের সঙ্গে একাঘরে কথা বলতে না শিখলে, গভীর অন্তর্মুখিনতার প্রাপ্তি এ জীবনে অসম্পূর্ণই থাকতো।

বার্টাণ্ড রাস্‌েল এই একা থাকার শিক্ষার উপর চিরদিনই জোর দিয়ে গেছেন। বলেছেন, সব শিশুকে একা ঘরে বন্ধ করে রেখে তাকে একাকিত্বে অভ্যস্ত করালে তার ব্যক্তিত্ব

www.boiRboi.blogspot.com

যথার্থভাবে গড়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবলতর হয়। একা যে-মানুষ থাকতে ভালোবাসেন না তাঁর মনুষ্যত্ব প্রায়ই অসম্পূর্ণই থেকে যায়।

তাখড়া আড্ডার যে সবই গুণ, দোষ নেই; একথাও জোর করে বোধহয় বলা যায় না। আড্ডার মধ্যে থেকে নিজের উন্নতি ঘটানোর মতো উপাদান না সংগ্রহ করতে পারলে, নিজের চেয়ে উন্নত, বেশি অভিজ্ঞ, মেধাবী মানুষদের সঙ্গ না পেলে, আড্ডা মানুষের অবক্ষয়ের কারণও সহজেই হতে পারে। আমাদের মধ্যে 'আড্ডা' নিয়ে যে উৎসাহর আতিশয্য আছে তা আমাদের উন্নতি, এমনকি জ্ঞানবৃদ্ধিতেও সহায়ক হয়েছে কী হয়নি এ নিয়েও যথেষ্ট গবেষণার অবকাশ আছে। "আড্ডাবাজ" হয়ে বাঙালী নিজের উন্নতি যতটুকু না করেছে, ক্ষতি করেছে হয়তো তার চেয়ে অনেকই বেশি।

শরীরের উপরে নানাবিধ অত্যাচার যে হচ্ছে সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু মনেরও যে পাখা গজাচ্ছে! নবীকৃত হচ্ছে, মরচে-ধরা মন। সেটাই বা কম কী। সেটাও তো একটা মস্ত লাভ!

কী বল?

তুমি যদি এখানে সঙ্গে থাকতে। কী ভালোই না হতো তোড়া!

এ জীবনে কোনোদিন কি এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না? একবারের জন্যেও?

ইতি—লেখক

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

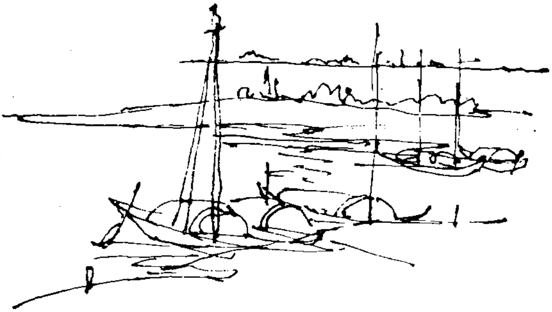

ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

লেখক,

ব্যাপারটা কি ?

বাকি জীবনটা কি ম্যাকলাস্কিগঞ্জেই থেকে যাবেন না কি ?

অসুস্থ হয়ে পড়লেন কি না, তাও অজানা। যদি কলকাতাতে না থাকেন তবে ফিরেই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবেন। পোস্টকার্ড এ অন্ততঃ। যাতে নিশ্চিন্ত হতে পারি।

আসলে আপনার চিঠি পেতে পেতে অভ্যেস এমনই খারাপ হয়ে গেছে যে, মাঝে মাঝে মনে হয়, চিঠি পাওয়া আর তার উত্তর দেওয়াই যেন এখন আমার জীবনের প্রধান কাজ। আর সবই গৌণ।

কোনো কোনো দিনে, বিশেষ করে ছুটির দিনে, খাওয়া-দাওয়ার পরে, দুপুরের অবকাশে মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আপনার চিঠি গুলি নেড়ে-চেড়ে দেখি। প্রথম চিঠি থেকে শেষ চিঠি। মনে হয় যেন অ্যালবাম দেখছি।

আপনার প্রথম চিঠিটি হাতে নিয়ে স্থবির হয়ে যাই। বইমেলার উজ্জ্বল আলোর মাঝে জীবন্ত আপনাকে দেখতে পাই চোখের সামনে। সুতীর একটি সবুজাভ পাঞ্জাবী আর সাদা পাজামা পরে আপনি বসে আছেন ! কত নারী পুরুষ ভীড় করছে, সই নিচ্ছে, কথা কইছে। তারপর সরে যাচ্ছে।

আপনি জানেন না, সেদিন ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকেই আপনাকে লক্ষ করছিলাম দূর থেকে। পা দুটোকে কে যেন পাথর করে দিয়েছিল। শত চেষ্টা করেও এগোতে পারছিলাম না আপনার দিকে। অথচ সপ্রতিভ, রসিকা বলে আমার খ্যাতি আছে।

কেন এমন হয় বলুন তো !

দূর থেকে আপনাকে দেখে মনে হচ্ছিলো যে পরজন্মে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নয় ; (এমন একটি উচ্চাশা ছিল আমার কিশোর বয়সে) আমি লেখিকাই হব।

তারপর....। একসময়ে এগিয়েই গেলাম। একটি কী দুটি কথা হলো, কী হলো না ; তাতেই যা হবার হয়ে গেলো এ জন্মের মতো।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রেমিক আমার অনেকই ছিলো। ভবিষ্যতে অনেক হবেও। তাদের ঠিক প্রেমিক বলবনা, বলব দয়াপ্রার্থী। প্রত্যেক মেয়েরই যেমন থাকে। তাদের মধ্যে কারোকে কারোকে যে পছন্দ করিনা এমনও নয়। কিন্তু আপনি তো আমার প্রেমিক নন। আপনি যে সব কিছু। আমার সর্বস্ব।

আপনাকে একবার পেয়েছি যখন, তখন হারাতে চাই না।

ভালো থাকবেন। ভালো থাকবেন। ভালো থাকবেন।

দয়া করে উত্তর দেবেন।

"না বাঁচাবে আমায় যদি মারলে কেন তবে"।

ফিরদৌসী

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জ
"ছবি"
কঙ্কা

তোড়া,

কল্যাণীয়াসু,

আজকে দোল পূর্ণিমা।

ম্যাকলাস্কিগঞ্জের দোল পূর্ণিমা।

বাক্যিটা বাগাড়ম্বরের মতো শোনালো কি? বলতে চাইছিলাম, যে গ্রামে-গঞ্জে, জঙ্গলে-পাহাড়ে, বনে-বাদায় যেখানেই বিজলি বাতি অঢেল নয় যেখানেই প্রকৃতি এখনও সবল এবং মানুষ দুর্বল, সেখানেই পূর্ণিমার রূপ এখনও উপভোগ করা যায়। হয়তো অমাবস্যারও।

স্কুলে পড়ার সময়ে 'THE STATESMAN'-এর সম্পাদককে চিঠি লিখেছিলাম এই বক্তব্য জানিয়ে যে, যোগ্য স্থানে বলে কয়ে এমন আইন অবিলম্বে বলবৎ করা দরকার যে, শুক্লপক্ষে, পূর্ণিমার রাতে এবং আগের দু রাতে কলকাতার কোনো পথেই বাতি জ্বালানো চলবে না এবং গৃহস্থদেরও, যুদ্ধের সময়ে যেমন বাতি ঢেকে রাখতে হতো, তেমন করেই ঐ তিনদিনও সব বাতি ঢেকে রাখতে হবে।

উদ্দেশ্য, চাঁদের আলো উপভোগ করা।

চিঠিটি ছাপা হয়নি। পত্রলেখকের ইংরিজি জ্ঞানের দৌর্বল্যেরই কারণে, না তার বক্তব্যর ভারহীনতার জন্যে; তা আজও সঠিক জানি না। তবে, খুবই দুঃখ হয়েছিলো। জ্যোৎস্না দিয়ে ভাত মেখে খাওয়ার মতো অতি-রোমান্টিক না হলেও জ্যোৎস্না আমি ভালোবাসি। বনজ্যোৎস্নাতো অবশ্যই।

কালকেরই মতো আজ দুপুরেও পেয়ারাতলিতে জোর আড্ডা ও গানের আসর বসেছিলো। রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদ, নিধুবাবু এবং আরও কতজনের গান।

তোমাকে বলাই হয়নি, পড়শু রাতে, শর্মিলা একটি রাজস্থানী ঘাগড়া পরেছিলো। ম্যাজেন্টা-রঙা। সোমনাথ গভীর মনোযোগের সঙ্গে মস্ত একটি মোরগ বার-বী-কিউ করছিলো গনগনে আগুনের সামনে বসে। আর শর্মিলাও সেই আগুনের পাশেই বসেছিলো ঠিক আমার

www.boiRboi.blogspot.com

মুখোমুখি। পাশে ওদের শিশুকন্যা, গুড্ডু।

শর্মিলার ঘাগড়ার চুমকিগুলি আগুনের শিখাতে ঝিকমিক করছিলো।

সোমনাথকেও চমৎকার দেখাচ্ছিলো।

শুধু মনই খুলিয়ে দেয় না নির্জনতা, চোখও খুলিয়ে দেয়। কালও সোমনাথের পাশ-ফেরানো চুল, কাটা-কাটা নাক-চিবুকে, দাড়িতে, মধ্যযুগের কোনো ব্যারণের মতো দেখাচ্ছিলো। যদিও ওর রঙ বাদামী। ফর্সা নয়।

আগুনের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও কান তুলে নিচ্ছিলো নিঃশেষে। ক্ষুদকুঁড়ো বাকি না রেখে। আগুনে কাঠ পোড়ার ফুট-ফাট শব্দ হচ্ছিলো। দীর্ঘ গ্রীষ্মরাতে বিলাপ-করা কোনো বুড়ির স্বগতোক্তির মতো অস্ফুট সেই শব্দর টুকরো-টাকরা ঝিঁঝিঁ-ডাকা, ডাইনি-জ্যোৎস্নার আলোতে এক অন্য মাত্রা যোগ করেছিল। সেই রাতের অপার্থিব রহস্য যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল সেই অস্ফুট রূপোঝুরি বনের শব্দ। পেছনের কুঁয়োর পাশে, নালা আর জঙ্গলের দিক থেকে একটি টিটি পাখি ডাকছিলো, হট্টিটি-হুট্-টি-টি-টি-হুট্। ডিড-উ্য-ড্যু-ইট? ডিড-উ্য-ড্যু-ইট?

ভাবলাম, বলি, নোপ্ বার্ডি! আই ডিড নট ড্যু এনিথিং। অথবা অ্যামেরিকানরা যেমন করে বলে, ভাবলাম; তেমন করেই বলি। নোপ বার্ডি! আই ডিড নট ড্যু নাথিং।

জীবনে কত কিছুই তো করার ছিলো, করার মতো, কত জায়গাতে যাবার সাধ ছিলো, কত কিছু পাওয়ার বাসনা ছিলো, কিছুই হলো না। হয়নি। এই রাত, আগুনের শব্দ, সোমনাথের দুর্ভেদ্য নীরবতা, শর্মিলার ঐশ্বরিক অথবা দানবীয় সৌন্দর্য অথবা ঐ রেডওয়াটেলড্ ল্যাপউইঙ্গ এর "ডিড উ্য ড্যু ইট" ডাক, নানা প্রশ্নই ছুঁড়ে দেয় বুকের মধ্যে আচমকা তীরেরই মতো। তীরবিদ্ধ হয়ে প্রশ্নশয্যায় শুয়ে থাকি; যেন দ্রোণাচার্য ভীষ্ম। এই আমি।

শুয়ে আছি যেন যুগযুগান্ত ধরে। আমি এই।

কতক্ষণ ধরে যে বার-বী-কিউ করলো সোমনাথ খাঁটি গাওয়া ঘি ঢেলে ঢেলে মোরগটাকে, তার কোনো হিসেব রাখিনি। নৃত্যরতা আগুন, বাইরের বন্য প্রকৃতির অবশ-করা প্রভাব, ডাইনী-জ্যোৎস্না, বনবাসনার মিশ্রগন্ধর অমোঘতা আমাকে বোবা করে রেখেছিলো কতক্ষণ যে, তা জানি না।

জানি যে, স্পর্শকাতর তুমি, ঈর্ষাকাতর হচ্ছো শর্মিলার কথা এতোবার এতোভাবে বলছি বলে। একথা ভালো করেই জানা উচিত যে, শর্মিলা, অথবা শর্মিলারই মতো অগণ্য অন্য নারীরা, এমনকি তুমিও আমার কেউই নও। কেউ হবেও না কোনোদিনও। তবু তোমাদের সৌন্দর্য, তোমাদের অশেষ গুণ, তোমাদের সারল্য, তোমাদের বুদ্ধি, মেধা, এমনকি কখনও কখনও বোকামিকেও নিয়ে আমি আমার মনের ল্যাবরেটরিতে কতরকম যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারি, কত কী যে সৃষ্টি করতে পারি; ভাঙতেও পারি, তা যদি জানতে!

প্রকৃতি যেমন গ্রীষ্মদিনের উষর দুর্দমতার মধ্যেই নিহিত রাখেন হর্ষকাম অদৃশ্য বর্ষার শ্যামলিমা, সবুজের সমারোহের নিরুচ্চার অলীক হাততালি; তেমন করেই কী থেকে যে কি গড়ে নিতে পারি, তা শুধু আমিই জানি! চিরদিনের কেউ বা একদিনের কেউও হবার

আদৌ প্রয়োজন কি তোমাদের কারো ? কেউ না-হয়েও তো তোমরা আমার কাছে অনেক ! মহার্ঘ্য তোমরা। তোমাদের AMPLIFY করে নেবার ক্ষমতাও যেমন আমার আছে, MUTE করে দেবার ক্ষমতাও আছে। আমি তো অন্য দশজনের মতো সাধারণ মানুষ নই। আমি যে একজন লেখক। আমার মধ্যে বহু মিলন, বিরহ, চাওয়া পাওয়া সব শিলীভূত হয়ে গেছে। তারা অহল্যার মতো শিলীভূত, অনড় পড়ে আছে। থাক। যখন যে অনুভূতিকে ফিরে চাইব, পদাঘাত করব শিলাতে।

পড়শু রাতের সেই সন্ধের শর্মিলার যে-ছবিটি অথবা তার আগের বা পরের রাতের ছবিটি, মুখের উপরে আগুনের শিখা দাপাদাপি-করা সোমনাথের সৌম্য চেহারাটি আমার চোখের ক্যামেরার ২.৮ লেন্স, তুলে নিয়ে, মস্তিস্কর ডার্করুমে রেখে দিয়েছে।

কোন সকালে, কোন আলোতে যে আমি সেই নেগেটিভগুলি বের করে সযতনে ডেভালাপ করে এনলার্জ করবো ; "ম্যাট"-এ করবো না "গ্লসী"তে, তা আমিই শুধু নিজে জানি।

একজন লেখকের প্রাপ্তি, আর একজন সাধারণ মানুষের প্রাপ্তি তো এক নয় ! লেখক মরুভূমির মধ্যে তাঁর কলম দিয়ে মরূদ্যান সৃষ্টি করতে পারেন। তিনি যে জাদুকর ! নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় পথ দেখে এগিয়ে গিয়ে তিনি ঘোরান্ধকার রাতে আলো-ঝলমল হাজারদুয়ারি গড়ে দিতে পারেন তাঁর পাঠক-পাঠিকার মনের মধ্যে। তিনি যে ঈশ্বরের দূত, তিনি যে চিরন্তন প্রেমিক ; আদিম বিরহী। লেখক তো মিলন এবং বিচ্ছেদও। তিনি যে নারী এবং পুরুষও। তাই তো, অর্দ্ধনারীশ্বর।

এতো কথা বললাম শুধু এইটুকু বোঝাতে যে, সোমনাথ বা শর্মিলার মতো বা তোমারও মতো অগণ্য পুরুষ বা নারীর নৈকট্যে ছেলেবেলা থেকেই এসেছি আমি কিন্তু তাঁদের কাউকে আঁকড়ে ধরে বা তাঁদেরই ব্যক্তিত্ব বা সৌন্দর্যর মধ্যে মুখ-থুবড়ে আজীবন পড়ে থাকার জন্যে আদৌ তাঁদের কাছে যাইনি বা তাঁদের কাউকেই কাছেও টানিনি।

কাছে এসেছি, তাঁদের "জলছবি", নিজের হৃদয়ে হুবহু তুলে নেবারই জন্যে। কিছুক্ষণের জন্যে, কিছুদিনের জন্যে কাছে থেকেছি, কাছে রেখেছি ; যাতে অন্যতর মাত্রা যোগ করে তা আমার অন্য পাঠক-পাঠিকার হৃদয়ে পরে নিপুণভাবে টায়ে টায়ে সেঁটে দিতে পারি। এক জলছবিকে স্থানান্তরিত করতে পারি অন্য জলছবিতে।

এইতো লেখকের সাধনা।

এবং হয়তো সিদ্ধিও।

ইতি—

তোমার লেখক

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

কল্যাণীয়াসু ফিরদৌসী,

তোমার S.O.S. পেয়েই তড়িঘড়ি লিখছি।

হাতের কাছে পোস্টকার্ড ছিলো কিন্তু পোস্টকার্ডে লিখছি না। পোস্টকার্ড বড় বে-আব্রু, ন্যাংটো। কেজো চিঠি ছাড়া কখনওই লিখিনা। কিন্তু তোমার যেমন তাড়া। হাতের কাছে অন্য কিছুই নেই। চিঠি শেষ করে ডাকে ফেলতে নিজেরই পোস্ট-অফিসে যেতে হবে।

খামে লেখাও বিপজ্জনক। বিশেষ করে, আমার নাম লেখা খামে। আগরতলার সাহিত্য-বোদ্ধা পাঠিকা মিতালী গাঙ্গুলী এবং তার বাবাকেও লেখা অনেকগুলি চিঠি একেবারেই নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। টেলিভিসানে বিজ্ঞাপন দেবো কি না ভাবছি!

এখন বাধ্য হয়ে সাধারণ খামেই লিখি।

দেশে দুটি সরকারী বিভাগ ছিল, সৎ, পরিশ্রমী এবং দক্ষ। একটি ডাক ও তার বিভাগ। অন্যটি দমকল। দ্বিতীয়টির কথা জানিনা। তবে প্রথমটি গোল্লায় গেছে। কী আর হবে! চোখের সামনে টেলিফোন বিভাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে যে!

কিছু বলার নেই। লজ্জা পাওয়া ছাড়া ব্যক্তির আর কি করার আছে এখন মহান গণতন্ত্রে! প্রতিবাদ বা সাধুবাদ জানাতে হবে। কিন্তু নির্বাচনের সময়ে সব দলেরই (অধিকাংশ সময়েই) প্রার্থী এমন আহামরি ব্যক্তি হন যে, তাঁকে ভোট না দিয়ে ছুটির দিন হিসাবে দিনটি কাটানো অনেকেই শ্রেয় বলে মনে করবেন।

চিঠি পেলে কি না জানিও।

বাকি জীবনটা ম্যাকলাস্কিগঞ্জে থেকে যেতে পারলেতো ভালোই হতো। কিন্তু তার কী উপায় আছে?

তুমি ক্রমশই এমন স্ফীত করে তুলছো যে নিজের সম্বন্ধে মিথ্যে শ্লাঘা না জন্মে যায়।

প্রশংসা, যে-কোনো মানুষেরই বেঁচে থাকবার জন্যে খাদ্য ও জলের মতোই প্রয়োজন। কিন্তু প্রশংসার আধিক্য হলে, সাপের বিষের মতো তা মাথায় উঠেও যেতে বা পারে। সেটা

www.boiRboi.blogspot.com

অত্যন্ত বিপজ্জনক !

তুমি প্রেমের কথা বলেছিলে, প্রেমিকের কথা ; তোমার আগের চিঠিতে।

তোমাকে বলি, হে বালিকা ! প্রেম কোনো খেলা নয় ; প্রেম মরণ ! সর্পদ্রংষ্ট হবার মতো সুতীব্র যন্ত্রণায় মরবে তুমি, তেঁতুলে-বিছে কামড়ানো ধবলা গাভীর মতো ছটফট করবে তুমি যন্ত্রণায় ! প্রেম কল্পনাতেই ভালো। ও পথে যেওনা। এতো খেলা নয় ; খেলা নয় !

'অববাহিকা'তে একটি কবিতা আছে শেষের দিকে : "ভালোবাসা কোনো বিলাস নয়, ভালোবাসা একটি আঙ্গিক ; যা নইলে ব্রহ্মা জগন্নাথ হতেন।"

প্রেম নিয়ে খেলতে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কামড় যে খেয়েছে, একবার সেই জ্বলনের রকমটি জানে।

ইতি—

লেখক

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ

লেখক

"ম্যাকলাস্কিগঞ্জ" থেকে লেখা আপনার তিনখানি চিঠির জন্যে ধন্যবাদ।

সত্যিই শহরের চিঠি থেকে বাইরের চিঠি অনেকই আলাদা।

"একটু উষ্ণতার জন্যে" যখন পড়েছিলাম, এখনও পড়ি মাঝে মাঝে ; তখন তার লেখককে তো জানতাম না ! আপনাকে জানার পর, ম্যাকলাস্কিগঞ্জ থেকে লেখা আপনার চিঠিগুলি পড়ার পর, সেই উপন্যাস যেন অন্য এক মাত্রা পেল।

চোখের সামনে আগেই দেখতে পেতাম জায়গাটিকে কিন্তু চিঠিগুলি পড়ার পর যেন হাত দিয়ে ছুঁতে পারছি। গন্ধ পাচ্ছি নাকে। কানে শুনতে পাচ্ছি হাওয়ার চিরুণি বোলানো বনের বনমর্মর। মৌটুসী পাখির ডাক।

এখন, আপনার বই পড়ে পড়ে শুধু আমিই নই, আমার মতো, অনেক পাঠক-পাঠিকাই বিশ্বাস করি যে ; প্রকৃতিই আমাদের মা।

প্রকৃতি আপনাকে যে প্রশান্তি দেয়, যে প্রগাঢ় নির্লিপ্তি ; তার বৃতি থেকেই উঠে আসে আপনার নিভৃত পর্ণমোচী মনের নানারঙা ফসল।

আমরা আহ্লাদিত হই।

আপনার প্রকৃতি-প্রেম অব্যাহত থাকুক, তা বিকীরিত হোক আমাদের মতো অগণ্য মানুষের মনে। ব্যবহার করে করে আমরা আমাদের পুরোনো পৃথিবীকে প্রাচীনা দেহপসারিণীর অবস্থাতে পর্যবসিত করেছি। আজকের দিনে প্রকৃতি-প্রেম আর বিলাস নয় কোনোমতেই। সার্থক ভাবে, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার সঠিক ঠিকানা।

আমি জানি যে, আপনি এ বাবদে বাঙালী পাঠক-পাঠিকার জন্যে কী করেছেন। বাঙালী শিশু কিশোর যুবক বৃদ্ধদের জন্যেও বা কী করেছেন।

লোকমুখে শুনলাম যে, আপনি নাকি একবছর কোথাওই এক লাইনও লিখছেন না। গতবছর পুজোতেও তো কোথাওই লেখেননি কোনো উপন্যাস। কিন্তু কেন ? কার উপরে

www.boiRboi.blogspot.com

এই অভিমান ?

আমরা কী দোষ করলাম যে, একবছর আপনার লেখা পড়তে পাবো না ?

এও শুনলাম যে, আপনার ক্যাসেট বেরুচ্ছে। কে বের করছেন ? কী গান গাইছেন ? সব কিন্তু জানাবেন।

এ কথা জানবেন যে, ফিরদৌসী আখতার আপনার পাবলিসিটি অফিসার, বিনা মাইনের ; বাংলাদেশের। আপনার সব খবর আমার মাধ্যমে পুরো বাংলাদেশে জেনে যাবে।

সত্যজিৎ রায়ের শরীরের খবর দেখি রোজই একইরকম থাকছে। প্রকৃত খবরটা জানাতে পারেন কি ? মনটা ভারী খারাপ হয়ে রয়েছে অনেকদিন ধরেই। এই টানা-পোড়েন আর ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে মনে হয়, একটা ইসপার-এসপার হয়ে গেলেই ভাল। তাছাড়া কষ্টও তো পাচ্ছেন!

হাসপাতালে কি মানুষে সখ করে যায় ?

আমার একবার অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশান হয়েছিলো। চারদিন ছিলাম। তাতেই ভয় ধরে গেছে।

আমি তখন কলকাতাতে। হঠাৎই ব্যথা ওঠে। আপনাদের পি. জি. হসপিটালে অপারেশান হয়। জ্ঞান হবার পরে, দেখি, অপারেশান হলো তলপেট আর মাথায় ব্যাণ্ডেজ!

বললাম, এ কী! কোথায় অপারেশান হলো ? হলোটা কি আমার ?

ওঁরা বললেন অপারেশান ভালই হয়েছে। তবে অপারেশান থিয়েটার থেকে ওয়ার্ড এ আনবার সময় স্ট্রেচার থেকে আপনাকে সিঁড়িতে ফেলে দিয়েছিল। সিঁড়িতে এক গড়ান দেওয়ায় মাথা ফেটে গেছে। তাই ব্যাণ্ডেজ।

মরে গেলেও আর কলকাতার হাসপাতালে যাব না।

আজকে শেষ করছি। ভাল থাকবেন।

ইতি— ফিরদৌসী

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

তোড়া
কল্যানীয়াসু,
চিঠি পেয়েছি পড়শু।

কিছু মনে কোরো না, উত্তর দিতে দেরী হলো বলে। নানা ঝামেলাতে ছিলাম। গত রবিবার রাতে দিল্লী গেছিলাম। সোমবারে সেখানের কাজ শেষ করে মঙ্গলবার সকালের দ্বিতীয় ফ্লাইটে বম্বে। বম্বেতে মঙ্গলবার কাজ করে বুধবার সকালে আপীল সেরে সেদিনই বিকেল চারটের ফ্লাইট ধরে কলকাতা।

আজকাল তারুণ্য আর নেই বলেই বোধহয় এতো ঘোরাঘুরি আর ভাল লাগে না। পঁচিশ বছর বয়স থেকে দিল্লী, পাটনা, শিলং, গৌহাটি, ধুবড়ি, রাঁচী, আসানসোল, বর্ধমান, ধানবাদ, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, জামশেদপুর, চরকি মেরে মেরে একেবারেই ক্লান্ত।

অল্পবয়সে একধরনের বাহাদুরী-প্রবণতাও থাকে, "ফীলিং অফ ইমপর্ট্যানস।" সেই সব মিথ্যা নির্মোক এখন ঝরে-খসে গেছে। চারদিকে বাজনা আর নিঃশব্দ কল্পনার হাততালি।

এখন ঘরে ফেরার দিন, ঘরে থাকার দিন। সত্যি! অনেকই দৌড়েছি! একেবারেই ভাল লাগে না আর। তবু এখনও মাসের মধ্যে পনেরোদিন এমন করেই ঘুরতে হয়।

অভিশপ্ত এই জীবন!

আগে বম্বে যেতে হতো না। বছর বারো হলো গড়ে প্রায় প্রতিমাসেই বম্বে যেতে হচ্ছে। বম্বের এয়ারপোর্ট থেকে যে-কোনো হোটেলই এতোই দূর যে, সে আরেক যন্ত্রণা! দিল্লী-কলকাতার এয়ারপোর্ট থেকে শহর অত দূরের পথ নয়। তাছাড়া ক্রমাগত জেটট্র্যাভেল-এ শরীরের যন্ত্রপাতি, মেটাবলিজম্ ও সব গড়বড়-সরবর হয়ে যায়। নানা উপসর্গ জোটে।

এডমণ্ড হিলারী আর তেনজিং নোরগে উনিত্রিশহাজার দু ফিটে পা রেখে "স্যার" হলেন আর মাসে কম করে বার আষ্টেক অথবা আরো বেশিবার একত্রিশ হাজার ফিটের উপরে মেঘের মধ্যে বসে থাকি এয়ারবাসে। খোদার উপর খোদকারী করলে গুণাহতো লাগবেই।

www.boiRboi.blogspot.com

পাপ করলে, পাপের প্রায়শ্চিত্ততো করতে হবেই!

তুমি কি ভেবেছে বলত ? তোমার সব চিঠিতেই জেরায় জেরায় একেবারে জেরবার করে তুলছো আমাকে!

গতবছর পুজোয় কেন কোনো উপন্যাস লিখিনি এবং এবারেও কেন লিখব না তা জানতে চেয়েছো তুমি।

কারণ, ছুটি নিয়েছি। ছুটি! ছুটি! ছুটি, যাকে পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয়ের PARLANCE এ বলে, SABBATICAL LEAVE'।

তাছাড়া বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে অন্য কেউই এই নিরীক্ষা করেছেন বলে তো জানা নেই। যখন কোনো লেখকের চাহিদা থাকে, পাঠক-পাঠিকারা, প্রকাশকরা তাঁর বইএর জন্যে সমান চাপ দেন ঠিক তখন তেমন লেখকের লেখালেখির জগৎ থেকে একবছরের জন্যে সরে দাঁড়ানোটা একটি অভিনব ইতিহাস হয়ে থাকবে।

VARIETY IS THE SPICES OF LIFE। উদবৃত্ত সময়ে এখন গান গাইছি, চানঘরে। মাঝে মধ্যে ছবিও আঁকছি। অনেকবছর বাদ গেছিল। নিজের যে খুবই ভাল লাগছে এটুকুই শুধু বলতে পারি। আর কোনোদিনও লিখতে নাও পারি। তাতে তোমাদের দুঃখ হলেও অনেকের গভীর আনন্দও হবে!

অবসর নিলেতো মাল্যবান অবস্থাতে নেওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। বঙ্গভূমে অতুল্য ঘোষ, চুনী গোস্বামী, এবং আমার পিতৃদেব এস. এন. গুহ ছাড়া আর কাউকেই তো সময়ে অবসর নিতে দেখলাম না!

বৃদ্ধর মৃতদেহ কি দেখার মতো ? তাঁর যৌবনের জ্বলজ্বলে ছবিটিকেই অন্যের মনে বাঁচিয়ে রাখা উচিত।

"অবরোহী"তে এই কথাই বলতে চেয়েছি। আরোহণের পরই অবরোহণ হওয়া উচিত স্বাভাবিক নিয়মে। পাহাড়চূড়াতো পতাকা পুঁতে দিয়েই নেমে আসার জন্যেই। সেখানে মৌরসী-পাট্টা গাড়ার তো কথা নয়! পাহাড়চূড়ো তা মান্যও করে না কখনও। একথাটা যে জ্ঞানী-গুণী মানুষেরাও বোঝেন না কেন, এইটে ভেবেই অবাক হই।

মানুষের সৃষ্টিশীলতার প্রথম অভিব্যক্তি হচ্ছে তার ছবি। স্পেনের আলটামিরার গুহাগাএ, মধ্যপ্রদেশের ভীমবৈঠকার প্রস্তরাশ্রয়ে আঁকা সব শিকার-দৃশ্যই তার প্রমাণ। শিকার ও ছবি আঁকা মানুষের আদিমতম পেশা এবং নেশা। ছবি আঁকাতে যা আনন্দ, যত তীব্র ভাবে নিজেকে নিঃশেষিত, রিক্ত করা যায়, চরম আনন্দর সঙ্গে; তা সম্ভবতঃ নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনের চরমপুলকেও হয় না। "একস্ট্যাসীর" পর্যায়েই পড়ে সেই আনন্দ। নিছক সাদামাঠা আনন্দ নয়! আনন্দর উদারা, মুদারা, তারার শেষতম পর্দাতে বাজে সে স্বর।

কেন লিখছি না, সে সম্বন্ধে আর কিছু বলার সময় এখনও আসেনি। যদি না বলে উপায় নাই থাকে, তখনই দেখা যাবে।

ফ্রান্সের নেপোলিয়ান একবার বলেছিলেন, "I hear, that there are no poets in france! What is the minister for Interior doing? হায়!

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

মূর্খ, মূঢ় সম্রাট ! কোনো সম্রাটই কবি সাহিত্যিকের জন্ম কখনই দিতে পারেন না। পারবেনও না কোনোদিন। যদি কেউ তার চেষ্টা করেন, দম্ভ ভরে যদি কেউ বলেন যে, তা পারেন ; তবে তাঁর বা তাঁদের থুথু নিজেদেরই গিলতে হবে।

নেপোলিয়নের মূঢ়তা আর ঔদ্ধত্যর কথাতো শুনলে।

জার্মানীর বীটোভেন আর গ্যেটে দুজনেই বন্ধু ছিলেন। যদিও বীটোভেনের বন্ধু বান্ধব বেশি ছিলেন না। আমার মনে হয়, জীবনে যাদের কিছু করার আছে, ব্রত আছে কোনো, তাঁদের কোনোদিনও গণ্ডা-গণ্ডা বন্ধুবান্ধব থাকে না ; থাকা সম্ভবও নয় আদৌ ! বেশি বন্ধু-বান্ধব থাকে জাগতিকার্থে "সুখী" মানুষদের ; স্থূল মানুষদের। প্রকৃতই যাঁরা বড়মাপের মানুষ তাঁদের বন্ধু থাকে না। শত্রু থাকে অনেকই।

বন্ধু যে নেই, তা নিয়ে অবশ্যই সেই মানুষেরা কখনওই কোনো দুঃখও পোষণ করেন না। কাজই তাঁদের সখা, প্রেমিকা ; বন্ধু, আত্মীয় সব। তাঁদের মানসিক সমতার মানুষ পান না বলেই বন্ধুত্ব হয় না। বন্ধুর বা আত্মীয়র বিকল্পে যে স্বল্পসংখ্যক সম্পকর্কে তাঁরা কাছের করে পান, তাঁরাই হয়তো তাঁদের সব অভাব মিটিয়ে দেন।

যাই হোক, বীটোভেন আর গ্যেটে দুজনে হাতে হাত দিয়ে এক বিকেলে স্কোয়ারে বেড়াচ্ছিলেন, এমন সময়ে দুরে দেখা গেল তৎকালীন জার্মানীর রাজা আসছেন সপরিবারে। পায়ে হেঁটে। সমবেত জনগণ রাজাকে দেখামাত্র সঙ্গে সঙ্গে দুপাশে ভাগ হয়ে সরে গেলেন। মাথার টুপি খুলে ফেলে সার সার দাঁড়িয়ে পড়লেন দুপাশে। তাই দেখে, গ্যেটেও একপাশে সরে গেলেন। মাথায় হাত দিলেন। টুপি খোলার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে বীটোভেন তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, করো কি ? করো কি ? ওহে গ্যেটে, তুমি যে দার্শনিক ! তুমি যে লেখক ! এমন রাজা কত আসবে কত যাবে। তুমি রাজাকে দেখে মাথার টুপি খুলতে যাবে কোন দুঃখে। চলো চলো, আমরা এগোই। ওঁদের দিকেই যাই। আমাদের চিনতে পারলে ওঁরাই আমাদের সম্মান জানাবেন।

গ্যেটে বীটোভেনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, না, না, তা কি হয় ? রাজা যে রাজাই !

এদিকে বীটোভেন, জনগণ দুভাগ হয়ে যাওয়ায় যে মধ্যবর্তী স্থান শূন্য হয়ে গেছিল তার একেবারে মধ্যে দিয়ে সোজা শোভাযাত্রা করে আসা রাজপরিবারেরই দিকে এগোতে লাগলেন। সবচেয়ে প্রথমে ওঁকে দেখতে পেলেন রানী। দেখেই, রাজাকে বললেন, চিনতে পেরে। রাজপরিবারের পুরুষেরা মাথায় টুপি খুলে বীর্টোভেনকে "উইশ" করলেন। বীটোভেনও করলেন ওঁদের। তারপর যার যার পথে এগোলেন।

বীটোভেন পরে মহাকবি গ্যেটেকে ভৎর্সনা করে বলেছিলেন, কোথায় রাজা ! আর কোথায় কবি ! ছিঃ ছিঃ তুমি এমন ! তা আমি জানতাম না।

আর্কিমিডিস একদিন সমুদ্রতীরের বালুবেলায় বসে বালিরই উপরে অংক কষছিলেন। প্রতিপাদ্য বিষয়ে আঁকিবুঁকি করে উপপাদ্য রচনা করছেন রোদে বসে। এমন সময়ে তাঁর সামনের বালুবেলার বালির উপরে হঠাৎই ছায়া পড়ল এক ফালি। গ্রীসের রাজা, নাম ভুলে গেছি ; রাজাদের নাম তাঁর প্রজারাই মনে রাখে ; তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁকে কর্মরত অবস্থাতে লক্ষ করছিলেন।

আর্কিমিডিস বিরক্ত হয়ে মুখ তুলতেই রাজা গর্বভরে বললেন, আপনার জন্যে কি কিছু করতে পারি আমি? আমি এই রাজ্যের রাজা। গ্রীসের রাজা।

রাজার মুখে একবার চাইলেন আর্কিমিডিস। একমুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, হ্যাঁ, করতে অবশ্যই পারেন।

রাজা বললেন কি?

দয়া করে সরে দাঁড়ান এখান থেকে। ছায়া পড়ছে আমার অংকর উপরে।

লক্ষ্ণৌর বিখ্যাত গায়ক সিড়ে হায়দারী খাঁ-এর গল্প বলেছি "অবরোহী" তে।

লক্ষ্ণৌর নবাবের খুব ইচ্ছে যে, সিড়ে হায়দরীর গান শোনেন। আবদুল হালিম শরর সাহেবের "পুরাতন লক্ষ্ণৌ" বইতে এই কাহিনী আছে। 'সিড়ে' কথাটার মানে হচ্ছে, ক্ষ্যাপাটে; ছিটেল। গুণী মাত্রই ছিটেল হন কমবেশি।

একদিন নবাব চলেছেন তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গ মোসাহেবেদের নিয়ে। চেলারা হঠাৎ চেঁচিয়ে বললো, ঐ যায়! ঐ যায়!

গায়ক প্রকৃত গুণী। চেলা-চামুণ্ডারা চিনতেন তাঁকে। নবাব চিনতেনই না। তাঁরা ঐ যায়! ঐ যায়। বলতেই, নবাব বললেন, ভালোই হলো, ধরে সঙ্গে নিয়ে চলো, আজই শুনবো গান।

নবাব ধরে আনতে বললে, চেলারা আর চামচেরা বেঁধে আনে। এই চিরদিনের নিয়ম। তারা গিয়ে পাকড়াও করল 'সিড়েকে'।

সিড়ে হায়দরী খাঁ নবাবকে বললেন, বাপু, তোমার সঙ্গে যে যাব আমি, তা তোমার বাড়ি কোন মহল্লায় হে? থাকাটা হয় কোথায়?

নবাবের প্রাসাদে পৌঁছে সিড়ে বললেন, তুমি কী করো হে? বেড়েতো বাড়িখানা দেখছি তোমার!

তারপর নবাবের আলবোলার উমদা তামাকের গন্ধে বেজায় খুশ হয়ে সিড়ে শুধোলেন, আরে ইয়ার! তোমার এই তামাক কেনো কোন দোকান থেকে? ভারী খুশবুদার তো!

নবাব মনে মনে চটছিলেন।

তাঁরই প্রজা আর তাঁকেই চেনে না! তাঁর কাছেই মাথা নোয়ায় না, কুর্নিশ করে না। আহম্মক! দুর্বিনীত! আদব তহজিব্ জানে না, তাঁকে সালাম-কুর্নিশও বাজালোনা। ব্যাটা ভারী বদ্‌তমিজ।

গান গাইতে বলাতে সিড়ে বললেন, গান-ফান অমনি হয় নাকি। আগে রাবড়ি আর জিলাবি খাওয়াও। মাগনা গান শুনবে?

নবাবের সাগরেদরা পাশের ঘরে গিয়ে সিড়েকে রাবড়ি জিলাবি খাওয়ালো। নবাব চটলেন। সিড়ে আবার তার বিবির জন্যেও তখুনি পাঠাতে বললেন রাবড়ি জিলাবি। ভালো জিনিস একা খেতে মনে লাগত।

খাওয়া হয়ে গেলে গাইলেন গান। গানের মতো গান! নবাব তো অভিভূত।

এবারে নবাব নিজের নবাবী জাহির করে বললেন, দ্যাখো হায়দরী খাঁ। এবারে এমন গান শোনাও যাতে আমার চোখ দিয়ে আঁসু বেরোয়। কাঁদাও আমাকে। আর যদি না কাঁদাতে

www.boiRboi.blogspot.com

পারো তবে তোমাকে কোতল করে, ঐ যে দেখছো গোমতী নদী ; তাতেই ছুঁড়ে ফেলব।

হায়দরী খাঁ কিছুক্ষণ ভীত সন্ত্রস্থ চোখে চেয়ে রইলেন অপরিচিত ঝলমলে পোষাক আর হীরে-জহরত পরা মানুষটার মুখে। এতক্ষণে বুঝলেন তিনি যে, না জেনে এই প্রাসাদে কোনো ঘামন্ডওয়ালা মানুষের সামনে এসে পৌঁছেছেন।

নবাব বললেন, কিন্তু যদি কাঁদাতে পারো হায়দরী খাঁ, তবে তুমি যা চাইবে আমার কাছে তোমাকে তাই দেব। যাই চাও, জায়গীর চাও, জেবর চাও, খাবসুরত জেনানা চাও ; যা তোমার ইচ্ছে। দিল্ যা করবে, কোনো দ্বিধা কোরো না চাইতে।

সিড়ে হায়দরী খাঁ চুপ করে চেয়ে রইলেন। একটু পরে বললেন, আবার রাবড়ি আর জিলাইবি খাব।

চেলারা আবার পাশের ঘরে নিয়ে গেলো তাঁকে।

খাওয়া দাওয়ার পর গান যা গাইলেন হায়দরী, তা বলার নয়। গান শেষ হলে, নবাব চোখের জলে ভেসে বললেন, তুমি এবার তোমার মনোবাঞ্ছার কথা বলো হায়দরী। তুমি যা চাও, আমি তাই দেব। যা, চাও। আমি নবাব। কী আমি না দিতে পারি তোমাকে!

হায়দরী খাঁ কিছুক্ষণ কুৎতকুতে চোখে নবাবের মুখে চেয়ে থেকে বললেন, একটাই মাঙনি আছে আপনার কাছে। জবান দিন যে, তা রাখবেন।

জবান? তুমি সামান্য 'সিড়ে' হায়দরী, "জবান" চাইছ আমার?

জী। হ্যাঁ। নবাব সাহেব।

হায়দরী বলল, সে গান গায়। সরস্বতীর নিজস্ব অঙ্গনে তার বাস। সে কওনসী নবাবের পরোয়া করে এই দুনিয়ায়! ফাঁকা-গুণী তো সে নয়?

বলো, কি চাও? নবাব বললেন। চটে গিয়ে।

ধনীর দান ফিরিয়ে দিলে, অশিক্ষিত ধনী বড় অসহায়, অপমানিত বোধ করে।

হায়দরী খাঁ একবার গলা খাঁকড়ে বললেন, আমি এইটুকুই চাই যে, আপনি আমাকে আর কোনোদিনও ডাকবেন না। একদিনও না। গান শোনাতে বলবেন না আপনি আমাকে।

সে কী! একী কথা! তোমার গান শুনে মোহিত হয়েছি বলেই না তোমাকে এই প্রস্তাব দিলাম।

নবাব অত্যন্ত আহত হয়ে বললেন।

বেশক্! তা দিলেন। কিন্তু আপনি তো এও বলেছিলেন আমাকে যে, না কাঁদাতে পারলে আমাকে কোতল করে নদীর জলে ফেলে দেবেন। কি? বলেননি?

হ্যাঁ। তা বলেছিলাম বটে।

আমি আপনাকে আর কোনোদিনই গান শোনাব না।

কেন?

কোনোদিন আপনি হয়তো সত্যিই আমাকে কোতল করে দেবেন। আপনার আর কী! আপনি নবাব। আপনি মরে গেলে আপনার ছেলে বে-কায়দা বে-মুসিব্বৎ নবাব বনে যাবে। দেশে নবাবের কি অভাব। নবাব হতে বাহাদুরীই বা কতটুকু লাগে! কিন্তু সিড়ে হায়দরী খাঁ একটাই জন্মেছিল। সে মরে গেলে আরেকটা আর জন্মাবে না। কোনোদিন জন্মাবে না।

বুঝলে তোড়া, আর্কিমিডিসদের, বীটোভেনদের, সিড়ে হায়দরী খাঁয়েদের এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে। সবিশেষ, পশ্চিমবঙ্গে।

কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-বাদক-চিত্রকরের যদি "অভিমান"ই না থাকে, তবে তিনি কিসের সারস্বতসাধনা করেন?

ইতি--

লেখক

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমন্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

লেখক

গানের কথা লিখলেন না? ক্যাসেটের কথা?

"অবরোহী" করে বেরুবে। কোন প্রকাশক বের করবেন?

'দেশ' এ অবরোহী শেষ হবার পরই যে নিন্দাবাদের ঝড় বয়ে গেছিল তা আমারই মতো আপনার বহু পাঠক-পাঠিকাকেই অত্যন্ত আহত করেছে।

লেখাটিতে তথ্যগত ভুল ছিল অবশ্যই কিছু কিছু কিন্তু চিঠির মধ্যে অধিকাংশই তো লেখকের ব্যক্তিসত্তার নিন্দা করে। সে সব তো 'সমালোচনা' নয়। উদ্দেশ্যপ্রসূত অবমাননা। চরিত্রহনন। ওকে কি সমালোচনা বলে?

সবচেয়ে অবাক হয়েছি একথা ভেবে যে, 'দেশ' এর মতো কাগজ দিনের পর দিন ঐ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক সব চিঠি ছাপলেনই বা কেন? এমন করলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিতো হবে কাগজেরই! লেখক যদি লিখতে পারেন, তাঁর লেখা যদি মানুষে পড়তে চান, তবে এই সব করে কি তাঁকে আটকে রাখা যাবে?

জানি না। খুবই আশ্চর্য লেগেছিল পুরো ব্যাপারটাই।

আপনিও তেমন। চুপ করে ঐ অপমান সইলেন?

অবশ্য কিই বা করবেন! আমার এবং আমার পাঁচজন বন্ধু (পাঠক এবং পাঠিকা উভয়ই) "দেশ"-এ 'চিঠি' দিয়েছিলাম প্রতিবাদ করে কিন্তু তার একটি চিঠিও ছাপা হয়নি।

'দেশ' আমাদের অত্যন্ত প্রিয় পত্রিকা। সেই পত্রিকাতে এমন সব ঘটনা ঘটবে সেটা আদৌ অভিপ্রেত নয়। আমাদের বক্তব্য কি আপনি 'দেশ' এর সম্পাদক অথবা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনতে পারেন না?

গানের কথা জানাবেন।

"কখন বসন্ত গেল এবার হলো না গান" চলে আসুন না একবার কাউকে না জানিয়ে।

www.boiRboi.blogspot.com

প্রায়ই কল্পনা করি যে, এক সন্ধ্যেতে আমি কাজ থেকে ফিরলেই আমার কাজের মেয়েটি, ফতিমা, বলবে, তার ফিসফিসে সন্দিগ্ধ গলাতে, "একজন মিঞা আইস্যা বইস্যা আছে। আপনেরে চায়। আপনেরে চিনেন কইতাছে।"

আমি অবাক হয়ে বলব, কোন মিঞা?

তারপর ঘরে ঢুকেই.......চেঁচিয়ে উঠে বলব ঃ আপনি!

আমার স্বপ্ন সত্যি করবেন?

ভালো থাকবেন।

ইতি—

আপনার তোড়া।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৯

তোড়া, কল্যাণীয়াসু,

তোমার চিঠি পেলাম আজ। ভারী খুশবু ছিলো চিঠিটিতে। কোনো আতর মাখিয়েছিলে কি? না তোমার করতলেরই সুগন্ধ?

দুর্গাপুর থেকে গতকাল নিভা দে চিঠি লিখেছেন। ভদ্রমহিলা নিজে একজন কবি। একটি লিটিল ম্যাগাজিন চালান।

"অবরোহী" যখন 'দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে শেষ হলো এবং যখন নিন্দার ঝড় বয়ে গেলো তখন উনি একটি সুন্দর চিঠি লিখেছিলেন আমাকে। সেই থেকেই আলাপ। 'দেশ'-এর দপ্তরেও লিখেছিলেন। "অবরোহী" লেখাটি অত্যন্তই অমনোযোগ এবং পেশার কাজের অপরিসীম ব্যস্ততার মধ্যে লিখেছিলাম। তাই, এখন তাকে মনোযোগ সহকারে মেরামত করছি। মনোমতো মেরামত করা হলে, আনন্দ পাবলিশার্স থেকেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে। সম্ভবত কলকাতা বইমেলা নাগাদ। ১৯৯৩-এর।

যে-সংখ্যাতে 'দেশ'-এ "অবরোহী" শেষ হলো তার পরের সংখ্যাতেই বিরাট শিরোনাম দিয়ে : "অবরোহী প্রসঙ্গে" দশটি নিন্দার চিঠি বেরিয়েছিলো। তার পরে পরে আরও অগণ্য চিঠি। সব দেখার দুর্ভাগ্য হয়নি। কারণ, প্রবাসী বাঙালীদের নিমন্ত্রণে অ্যামেরিকায় চলে যেতে হয়েছিলো দেড়মাসের জন্যে।

ব্যাক্তি-আমার অথবা লেখক-আমারও কোনোরকম মিথ্যে গুমোর নেই। ঈশ্বর করুন যেন তা কোনোদিনও না গড়ে ওঠে।

তাছাড়া আমার ব্যক্তি-চরিত্রে কী লেখক-চরিত্রে নিন্দনীয় কিছুই নেই এমন মনে করার মতো মেগালোম্যানিয়া কিংবা মূর্খামি আমার কখনওই ছিলো না। আমি মানুষ। অতি সাধারণ, ভঙ্গুর একজন মানুষ; দোষে-ত্রুটিতে ভরা। "অবরোহী" যে ভাবে ছাপতে দিয়েছিলাম সেই কপিতে অনেকই ভুল-ত্রুটি ছিলো।

কিন্তু, প্রথম দশটি চিঠি পড়ে আমার কিন্তু বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় নি যে, দশটির

www.boiRboi.blogspot.com

মধ্যে ছ-সাতটি "লেখানো" চিঠি। লেখার সমালোচনা নয়, লেখকের চরিত্র-হনন।

চিঠিপত্র যখন কোনো পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয় তখন কোথাওই পুরো ঠিকানা থাকে না। তাই 'দেশ'-এ ফোন করলাম। চিঠিপত্র বিভাগ যিনি দেখেন তাঁকে অনুরোধ করলাম যে, পত্রলেখকদের পুরো ঠিকানা যদি আমাকে দয়া করে পাঠান তাহলে বাধিত হবো। উনি আমার লোককে পাঠাতে বললেন। লোক পাঠাতেই, উনি স্বহস্তে লিখে পুরো ঠিকানা, ঐ দশজন পত্রলেখকেরই ; আমাকে পাঠালেন।

সঙ্গে সঙ্গে স্টেনোকে ডেকে ডিকটেশান দিয়ে প্রত্যেকেরই নামে চার লাইনের চিঠি টাইপ করতে বললাম।

লিখলাম ঃ "চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। আপনি যে আমার লেখা পড়েছেন এবং চিঠি দিয়েছেন সেজন্যেও ধন্যবাদ। পরে আবার আমি যোগাযোগ করবো।"

প্রতিটি চিঠি রেজিস্ট্রি করে, উইথ অ্যাকনলেজমেন্ট ডিউ, পাঠালাম। প্রায় একমাস অপেক্ষা করার পর মাত্র তিনটি এ. ডি. প্রাপকের স্বাক্ষর নিয়ে ফিরে এলো। অন্যগুলিও ফিরলো, তবে পোস্টাপিসের এইরকম মন্তব্য নিয়ে ঃ "ADRESSE NOT KNOWN" অথবা "ADDRESS INCOMPLETE" ।

অনেক কিছুই বলতে পারতাম তোমাকে কিন্তু আবিল করতে চাইনা স্মৃতি। তাছাড়া, আমার যতটুকু প্রাপ্য ঠিক ততটুকুই পাব। এক কণা বেশিও নয় ; কমও নয়।

ছোট কথা, ছোট জিনিস নিয়ে নিজেকে ছোট করে লাভ কি? "অবরোহী" যখন বই হয়ে বেরুবে তখনই বোঝা যাবে কী সত্য, আর কী মিথ্যা!

জীবনের সবক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা থাকেই। সে প্রতিযোগিতা, কোনো মানুষ এড়াতে চাইলেও থাকে। কিন্তু নীচুতে নামার একটা সীমা আছে। কোনো প্রতিযোগিতাতেই আমার জেতার ইচ্ছা নেই আদৌ, যদি নিজেকে অত নীচে নামাতে হয়!

ছেলেবেলায়, রংপুরের 'ধাপ'-এর ফুটবল মাঠ-এ দূর গ্রাম থেকে হারাগাছার ফুটবল টিম খেলতে আসতো। তাদের প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই ষাঁড়ের ডালনা খাওয়া চেহারা ছিলো। অস্ট্রেলিয়ানদের মতো। লুঙি পরে নামতেন প্রত্যেকে ফুটবল খেলতে। কিন্তু ফুটবল খেলাটা ছাড়া তাঁরা আর সবকিছুই জানতেন। তাঁরা বিপক্ষ টিমের কাছে গোল খাওয়ামাত্রই তাঁদের ক্যাপ্টেন লুঙি কষে বেঁধে নিয়ে অর্ডার করতেন ঃ "বল ছাড়ি, ম্যান ধরো বাহে"।

আর দেখতে হতো না। বল, বলের মনে মাঠের এক কোণে অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে থাকতো আর হারাগাছার ষণ্ডা-গুণ্ডা খেলোয়াড়েরা 'ধাপ'-এর খেলোয়াড়দের পায়ের গোছ তাদের মোটা মোটা জবরদস্ত বাঘের মতো পায়ের গোছ দিয়ে ফুটি-ফাটা করতেন। খেলাটা আর খেলা থাকতো না, সেটা মারামারিও হতো না। হতো, যাকে বলে, একতরফা মার।

'অবরোহী' সম্পর্কিত চিঠিপত্রের বেলাতেও সে কথা প্রযোজ্য। *

কিন্তু সব ক'টি উল্লেখযোগ্য "বড় উপন্যাসই" হয় 'যুগান্তর গোষ্ঠীর' 'অমৃত'-তে নয়তো অন্যান্য অখ্যাত বা স্বল্পখ্যাত পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক মণীন্দ্র রায়, আমাকে অত্যন্ত সম্মান দিয়ে পরপর অনেক উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে ছেপেছিলেন। তারপরে তো অমৃত উঠেই গেল।

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

আনন্দবাজার পত্রিকা এবং রমাপদ চৌধুরীই আমাকে লেখক করেছেন যে, একথা সবসময়েই কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। যতদিন বাঁচি, করবও।

অনেকদিন লেখালেখি করার পর আজ এটুকু প্রত্যয় জন্মেছে, প্রগাঢ় প্রত্যয় ; যে, কোন পত্রিকায় কোন লেখা প্রকাশিত হয়েছিলো সে-কথা পাঠক-পাঠিকা আদৌ মনে রাখেন না। মনে রাখেন শুধু লেখাটিকেই। মনে রাখার মতো লেখা হলে তাঁরা অবশ্যই মনে রাখেন!

অবশ্য একথাও একশবার সত্যি যে, প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া বাবদে মেডিয়া অত্যন্তই বড় ভূমিকা নেয়। আনন্দবাজার পত্রিকা এবং রমাপদ চৌধুরীর অকুণ্ঠ অকৃপণ সহযোগিতা না পেলে লেখক পরিচয়ই আমার হতো না কোনোদিনও। সে কারণে, আবারও বলছি, তাঁদের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা রাখি। এবং আজীবন রাখবও।

মেডিয়া অত্যন্তই শক্তিশালী সন্দেহ নেই। কিন্তু মেডিয়ার মধ্যে কোনো বিশেষ-গোষ্ঠীর যদি কোনো বিশেষ ভাগ্যবানের উপর অশেষ কৃপাদৃষ্টি থেকে থাকে তাতেও সেই ভাগ্যবান লেখক হয়ে উঠবেনই যে, এমন কথা জোর করে বলা যায় না। তাঁকে সুউচ্চ সুবর্ণ দেউলের উপরে চড়িয়ে চারধার থেকে তাঁর মুখে আলো ফেলে রেখে বড়জোর স্বল্প সময়ের জন্যে তাঁকে 'প্রণিধানযোগ্য' বলে সাধারণের কাছে 'প্রতিপন্ন' করানো গেলেও যেতে পারে কিন্তু আলো সরে গেলেই তিনি বা তাঁরা নড়ে উঠে ধপ্ করে মাটিতে পড়ে যাবেন।

ইতিহাস অন্তত তাই বলে।

অবশ্য যা তোমাকে লিখলাম তা আমারই নিজস্ব বিশ্বাসের কথা। সেই বিশ্বাস অভ্রান্ত নাও হতে পারে।

এ সব কথা দশজনকে বলার নয়। অথচ হাজারজন প্রশ্ন করেন। একান্ত এবং গোপন কথা। তোমাকে আজ বলে ফেলতে পেরে হালকা বোধ করছি।

সব কথা বলার সময় এখনও আসেনি। না বলতে হলেই খুশি হব।

খুদাহর কাছে আমার জন্যে দুয়া চেও। এই দুয়া, যেন, আমার আত্মবিশ্বাস চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে। আমি এ পৃথিবীতে হারতে আসিনি তোড়া। জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই।

আমার এই স্পর্ধা যেন অব্যাহত থাকে, যতদিন বাঁচি।

এই দুয়া চেও।

ইতি—লেখক

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৯

তোড়া, কল্যাণীয়াসু,

আজ সকাল থেকেই মনটা কবিতা কবিতা করছে। একটু গান গানও। এই কবিতাটি কেমন ?

"বৃক্ষের মতো মানুষ দু'চারজনই আছে
খুঁজে খুঁজে ফেরো তারে সহস্র মুখের ভিড়ে
যদি পেয়ে যাও ছায়াতে দাঁড়িয়ে তার
অগ্নি ও অশ্রু সব জমা করে দিয়ো
মানুষকে ভালোবেসে যদি যেতে চাও বহুদূর
এ ভাবেই খুঁজে খুঁজে থেমে থেমে যেও।"

দুর্গাপুরের কবি নিভা দের। ভাল নয় ?

যদি কখনও এ-জীবনে তোমার সঙ্গে দেখা হয় আবার তবে একটি শোনাবো তোমাকে। তোমার মুখটি দুহাতের পাতার মধ্যে নিয়ে চুমু খাবো। তারপর সবকিছু ছেড়ে দেব অনুষঙ্গর উপরে, প্রকৃতির উপরে ; তোমার মন-শরীরের আবহাওয়ার উপরে। ইংরাজিতে যাকে বলে, leaving the rest to the elements.

আঙ্গুরবালা দাসীর গাওয়া একটি গানও তুলেছি। লক্ষ্মীর বন্দনা। তার সুরটিও যে কী সুন্দর তা কী বলব ! কথাও চমৎকার। বাংলাদেশী গায়িকা ইফফাত আরা খান এই গানটিও গেয়েছেন।

জানি না, তোমাকে এর আগেও লিখেছি কিনা এই মহিলার গলা সম্বন্ধে। ওঁর গলাতে চুমু খেতে ইচ্ছে করে।

লালন ফকির গেয়েছিলেন ঃ "যদি ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান নারীর তবে কী হয় বিধান।" গায়িকাদেরও জাত নেই কোনো। আসলে সব মানুষেরই দুই জাত। ভাল মানুষ আর বজ্জাৎ।

www.boiRboi.blogspot.com

সোমনাথ অবশ্য বলে যে, দাদা ! তুমি ভুল বললে, মানুষের দুই প্রকার এ কথা সত্যি তবে ভেদটা অমন নয়। মানুষ দুই প্রকার। জীবিত এবং বিবাহিত।

লালন ফকিরও সব জানতেন না। মেয়েদের ছুন্নৎ অবশ্যই হয়। আফ্রিকাতে গিয়ে জেনে এসেছি। "ইলামোরানদের দেশে" বইয়ে এবিষয়ে গভীরে গিয়ে বলেওছি। মাসাইরাওতো জাতে মুসলমানই! আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ মানুষই মুসলমান। তবে মেয়েদের ব্যাপারটার নাম হলো খাত্না।

শোনো, লক্ষ্মীর বন্দনা শোনো।

"এসো সোনার বরণ রাণী গো শঙ্খকমল করে
এসো মা লক্ষ্মী, বোসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে।
গাছে গাছে দেছো ভারে ভারে ফল, মাঠে মাঠে দেছো ধান
গোষ্ঠে গোষ্ঠে সুশীলা কপিলা দুধের নদীতে তুলেছো বান।
কলকল করে নদীর জল ধুয়ে নেছ জ্বর জ্বালা
তোমারি রতনে সাজানো যতনে পরেছো দীনার মালা।
চিরদিন সুখে রেখো গো, অচলা হইয়া থেকো গো
তোমারি অন্ন অন্নপূর্ণা দিব মা তোমারি করে।
এসো সোনার বরণ রাণী গো........"

ভালো না ?

জয়ের দেওয়া "ঘুমিয়েছ, ঝাউপাতা"র একটি কবিতা তোমাকে শোনাচ্ছি।

"একটি বৃষ্টির সন্ধ্যা"

"চোখ, চলে গিয়েছিল, অন্যের প্রেমিকা, তার পায়ে।
যখন, অসাবধানে, সামান্যই উঠে গেছে শাড়ি—
বাইরে নেমেছে বৃষ্টি। লণ্ঠন নামানো আছে টেবিলের নিচে, অন্ধকারে
মাঝে মাঝে ভেসে উঠেছে লুকোনো পায়ের ফর্সা আভা.....

অন্যায় চোখের নয়। না তাকিয়ে তার কোনো উপায় ছিল না।

সত্যিই ছিল না ? কেন ?—হু হু করে বৃষ্টিছাট ঢুকে আসে ঘরে

সত্যিই ছিল না ? কেন ? কাঁটাতারে ঝাঁপায় ফুলগাছ
সত্যিই ছিল না ? কেন ? অনধিকারীর সামনে থেকে
সমস্ত লুকিয়ে নেয় নকশা-কাটা লেসের ঝালর.....
এখন থেমেছে বৃষ্টি। এখন এ ঘর থেকে উঠে গেছে সেও।
শুধু ফিরে আসছে হাওয়া। শুধু এক অক্ষমের চোখের মতন
মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে টেবিলের তলায় লণ্ঠন।"

www.boiRboi.blogspot.com

তুমি শঙ্খদার 'পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ' পড়েছো কি ?

তোমাকে কি আগে বলেছি ঐ বইটির কথা ? আমার কেবলই মনে হয় শঙ্খ ঘোষ-এর এই বইটি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্য। দেবেশ রায় এর "তিস্তাপারের বৃত্তান্তর" মতো।

জানি না, কেউ এর ইংরিজি অনুবাদ করেছেন কিনা ! শঙ্খদাকে অনেকদিন আগে, "মাধুকরী" লিখছি. যখন, (মাধুকরীতে এই বই থেকে অনেকগুলি কবিতার উদ্ধৃতিও দিয়েছিলাম) তখন লিখেছিলাম যে, কেউ না-করে থাকলে আমাকে অনুমতি দিন, আমিই করব।

শঙ্খদা সামান্য গদ্য লেখকের এই বাড়াবাড়ি ঔৎসুক্য বোধহয় ভালো চোখে দেখেননি। তাছাড়া অ্যাকাউন্ট্যান্ট গদ্য লেখক। অশিক্ষিত ! ব্যাকরণ না-জানা, সাহিত্যে ব্যাচেলার ডিগ্রীও নেই যার ! উত্তরও দেননি সে চিঠির। অথবা হয়তো চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের ইংরিজি সাহিত্য জ্ঞানের উপরে তাঁর ভরসা ছিলো না।

কিন্তু নিজে খুব ভালো করেই জানি যে, ইংরিজিটা বাংলার চেয়ে অনেকই সহজে লিখি। হয়তো বাংলার চেয়ে ভালোও লিখি। ইংরিজিতে লেখার সাধও বহুদিনেরই। কিন্তু সময়ই বের করতে পারলাম না আজ অবধি।

আর কবে যে হবে, কে জানে। জীবনের বেলা তো পড়ে আসছে। বেলা শেষের গান গাইতে গাইতে টিয়ার ঝাঁক ফিরে যাচ্ছে পাহাড়তলির বনস্থলীতে। শ্লথ পায়ে তিতিরকান্নার মাঠ পেরোচ্ছি আমি। কোথায় যাবো, সে দেশ কেমন ; তা না জেনেই।

শঙ্খদার এই সংকলন থেকে একটি কবিতা শোনো।

(৫)

"ভাসন্ত শবের মুখে বসেছিল দক্ষিণের পাখি
সূর্যের অন্তিম হাত মুছে দিয়েছিল দুঃখরেখা
পলিতে পলিতে দেশ ছেয়ে যাক ! যায়নি এখনো ?
ভাসন্ত শবের পাশে সূর্যের কুহরে উড়ে যায়।"

(৬)

"আর্তনাদ করে ওঠে, দু-হাত বাড়িয়ে বলে : এসো
এসো সর্বনাশে এসো আগ্নেয় গুহায় এসো বোধে
এসো ঘূর্ণিপাকে বীজে অন্ধের ছোঁয়ায় এসো এসো
শিকড়ে গরল ঢেলে শিখরে জাগিয়ে দেব জ্বালা।"

অথবা

(১৪)

"দ্বাদশীর বুকভাঙা রূপালি মিথ্যার মধ্য দিয়ে
এইতো আমার পথ চলেছে এ রাত্রিবনময়,
সবুজ ঘোড়ার ঝাঁপ, আচ্ছন্ন আয়ত উটগুলি
স্থির হয়ে পড়ে আছে গাছের আদলে দুই পাশে।"

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কাছে কোনো আগন্তুক এসেছেন। আগে জানাননি, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই ; অচেনা ভদ্রলোক হলে ; ....

এখন থামতে হবে।

ফিরে ঃ চলে গেলেন এই মাত্র।

পারিবারিক এবং সামাজিক মহলে আমার অত্যন্ত দুর্নাম আছে এ ব্যাপারে। কিন্তু কী করব ! সময় যে একেবারেই নেই, সময় নষ্ট করবার।

বাড়িতেও আগে জানিয়ে না এলে, কারো সঙ্গেই দেখা করি না। নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে কাজ করি। তা, তিনি আমার শ্যালকই হন, কী ভগ্নীপতি।

এ-কারণেই না-জানিয়ে কারো বাড়ি, বিশেষ করে যাঁদের কাজের মানুষ বলে জানি ; যাইও না। না জানিয়ে কী করে যে অন্য মানুষে যান, তা ভেবেই পাই না।

জীবনটা এতোই ছোট এবং নষ্ট করার মতো সময় এতোই কম যে, প্রবল একটি দুর্লঙ্ঘ দেওয়াল নিজের কাজ এবং বাইরের চারধারের জগৎএর মধ্যে দাঁড় করিয়ে না রাখতে পারলে আমাদের দেশে কাজ করা বড়ই অসুবিধের। দুঃখের বিষয় এই যে, এখানে এই কর্মক্ষমতাকে কেউই অ্যাপ্রিসিয়েটতো করেনই না, বরং নিন্দাবাদে মুখর করে তোলেন আকাশ-বাতাস। তা করুন। তাতে যায় আসে না কিছু। যে রাজ্যে, কাজ ছাড়া, মানুষে আর সব কিছুই করে ; সে রাজ্যে কাজ করার মতো অপরাধ আর কী থাকতে পারে বলো !

অনেক আত্মীয়-বন্ধুকে এই বাস্তব কারণে হারিয়েছি। কিন্তু দুঃখ নেই কোনো। তার বদলে তোমাদের যে পেয়েছি ! লক্ষ লক্ষ ভালোবাসার জন। তাঁরাইতো পরমাত্মীয় আমার।

কিছুই না হারিয়ে কি অন্য কিছু পাওয়া যায় ?

ভালো থেকো।

ইতি—লেখক

পুনশ্চ ঃ রমাপদ চৌধুরীর একটি বিখ্যাত ছোট গল্প আছে। নাম, "তিতিরকান্নার মাঠ"। ওঁর "গল্পসমগ্র" পড়েছো কি ? "উপন্যাসসমগ্র" ? না পড়ে থাকলে, অবশ্যই পড়বে। রমাপদবাবুই লেখা শিখিয়েছেন আমাকে। যদিও এখনও তেমন শিখে উঠতে পারিনি !

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

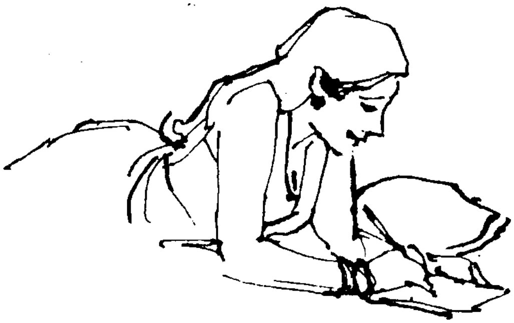

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

'লেখক'

আপনাকে একটি প্রশ্ন করব বলে ভেবেছি অনেকই দিন কিন্তু প্রতি চিঠিতেই ভুলে যাই জিগ্যেস করতে। প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে, এতো লেখক বিদেশের উপরে এতো লেখা লেখেন, প্রায় সব কবি-সাহিত্যিকই ; কিন্তু আপনি লেখেন না কেন ?

আপনি তো পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গেছেন। আমাদের তো ইচ্ছে করে যে আপনার মুখ থেকে শুনি সেই সব দেশের গল্প।

না-লেখার কি কোনো বিশেষ কারণ আছে ?

রবীন্দ্রনাথের পরে সত্যজিৎ রায় ছিলেন। উনি চলে গেলে বাঙ্গালীর কি হবে ?
ভালো থাকবেন।

ফিরদৌসী

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৯

তোড়া,

কল্যানীয়াসু,

সত্যজিৎ রায় সম্ভবতঃ শীগগিরি ভালো হয়ে উঠবেন। খুবই আনন্দের খবর।

সেদিন ডঃ কান্তি বক্সীর সঙ্গে বেলেভ্যু নার্সিং হোমের আন্ডার-গ্রাউন্ড পার্কি-লট এ দেখা হয়ে গেলো। উনিই বললেন।

সেখানে গেছিলাম আমার এক পাঠককে দেখতে। ক্যানসার হয়েছে তাঁর। কখনও চোখে দেখিনি তাঁকে আগে। দুর্গাপুরে থাকতেন। চিঠিতেই প্রথম আলাপ এবং গত পনেরো বছর ধরে যোগাযোগ।

ভদ্রলোক যে কী খুশি হলেন! মুখের ভাবটি এমনই হলো যেন, এবারে মরে গেলেও কোনোই দুঃখ নেই তাঁর। দেখাতো হলো লেখকের সঙ্গে!

এ জীবনে পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে যা পেলাম এবং অবিরত পেয়ে আসছি, সেই তুলনায়, তাঁদের ঋণ শোধ করতে পারলাম না কিছুমাত্রও।

তেমন ভালো যদি লিখতেও পারতাম তাহলেও কিছুটা হাল্কা বোধ করতাম।

ভালো থেকো।

ইতি— লেখক

www.boiRboi.blogspot.com

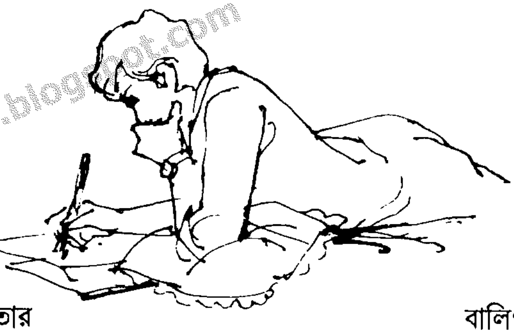

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
পোস্ট বক্স নং ১০২৭৬
কলকাতা ৭০০ ০১৯

আমার তবাসুম ; গুলদস্তাঁ,

তোমারই মতো, অনেকেই শুধোন এবং বহুদিন থেকেই শুধোন ঐ প্রশ্ন।

আজই একটি চিঠি পেলাম আগরতলার সুবিমলের কাছ থেকে। সুবিমল ভট্টাচার্য। ওল্ড কালিবাড়ি রোড এ থাকেন। একজন মনোযোগী ; বিদগ্ধ পাঠক। একটি স্কুলের শিক্ষকও। গায়কও। এই প্রশ্নই তিনি আবারও করেছেন।

তুমি হয়তো জানো না যে, লেখক হিসেবে, একটি ধাপ পেরিয়ে এলে ; সম্পাদক না চাইলে, নিজের লেখা কোনো কাগজেই নিজে থেকে পাঠানো যায় না। নিয়ম, অলিখিত

আমাকে কেউ লিখতে না বললে লিখি কি করে ? তাছাড়া লিখিইতো আমি খুবই কম।

তবে একথাটাও ঠিক নয়, যে, বিদেশের পটভূমিতে বা বিদেশ নিয়ে আমাকে কোনো সম্পাদক লিখতে বললেই আমি লিখতাম !

বিদেশ সম্বন্ধে কিছু লেখা, এতো স্বল্প-অভিজ্ঞতাতে এবং কম আয়াসে হয়তো সম্ভবও নয়। তেমন লেখাতে কোনো উৎসাহও পাই না। যা লেখা যেতে পারে ; তা হাল্কা ভ্রমণ কাহিনী ; যদিও রসসিক্ত।

তেমন লেখা যে একেবারে লিখিনি তাও নয়। সত্তরের দশকের গোড়ার দিকের ইয়ারোপ নিয়ে ; লেখা "প্রথম প্রবাস", আর সত্তর দশকের শেষের দিকে লেখা আফ্রিকা নিয়ে "পঞ্চম প্রবাস"।

আত্মপক্ষ সমর্থনে একথাই শুধু বলতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ তো সারা পৃথিবীতেই কতবার গেছেন কিন্তু বিদেশ নিয়ে খুব একটা লিখেছেন কি ? "য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র" এবং বিদেশ থেকে কিছু চিঠিপত্র লেখা ছাড়া বিশেষ কিছুই তো লেখেননি। উপন্যাস বা গল্প তো নয়ই ! অথচ ওঁর মতো কল্পনা-শক্তি যাঁর ছিলো তাঁর পক্ষে বিদেশের পটভূমিতে গল্প-উপন্যাস লেখা কি আদৌ অসম্ভব ছিলো ?

আমরা যে এক-দু' মাসের জন্যে বিদেশে যাই, সেই অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে লেখার

www.boiRboi.blogspot.com

মতো কিছুই লেখা যায় না। যে-বিষয়ে লিখবো, সে-বিষয়ে যদি আমার "GRIP"-ই না থাকে, বিষয়টিকে যদি ভালো করে না জানি, না বুঝি হৃদয় দিয়ে ; তাহলে মিথ্যে ফোলানো-ফাঁপানো পাঠক-ঠকানো লেখা ছাড়া আর কিছু লেখা যায় ? বাংলাসাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "পালামৌ" প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখাগুলি, সৈয়দ মুজতবা আলি সাহেবের "দেশে বিদেশে" ছাড়া রসসমৃদ্ধ এবং যথার্থ ভ্রমণ সাহিত্য খুব বেশি কি হয়েছে ?

যাঁরা বিদেশে দীর্ঘকাল আছেন, পড়াশুনো করেছেন, তাঁরা, লিখলেও হয়তো লিখতে পারেন। তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

আমাদের দেখা, বুড়ি-ছোঁওয়াই মাত্র।

আমার মতটাই যে একমাত্র প্রণিধানযোগ্য মত এমন মনে করার মতো সর্বজ্ঞ অথবা মূর্খও আমি নই। মতটা ভুলও হতে পারে।

যাঁরা চাইবেন, যাঁরা পারবেন ; তাঁরা অবশ্যই লিখবেন। অনেকেই তো লিখেওছেন। লিখছেনও। কিন্তু আমি যতটুকু বুঝেছি, প্রবাসী বাঙালীদের, তাঁদের সঙ্গে মিশে যে, তাঁরা কিন্তু ওরকম 'বুড়ি-ছোঁওয়া' লেখা আদৌ পছন্দ করেন না।

প্রসঙ্গত বলি, সময়ের দৈর্ঘের হিসাবে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে হয়তো প্যারিসে বিভিন্নবারের যাওয়া মিলিয়ে সবশুদ্ধ দীর্ঘ পাঁচবছর কাল মতো ছিলেন। প্যারিসের 'রিৎজ' হোটেলে তাঁর নামে একটি স্যুইট বুক করা থাকতো সারা বছর। কখন যে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হবেন তার ঠিক কী ! কিন্তু তিনিও একটিমাত্র চটি বই লিখেছিলেন প্যারিস নিয়ে। বইটির নাম "দ্যা মুভেবল্ ফীস্ট"।

পাঁচ বছর থেকে, শহরটিকে জেনেও ; ঐটুকু একটি বই !

একেই বলে, সংযম।

সব অভিজ্ঞতাকেই জারক রসে ডুবিয়ে, অনেকদিন রেখে দেবার পরই তারপরই লেখার যোগ্য কিছু মাথায় আসে। INTROSPECTION ছাড়া সাংবাদিকতা হয় ; সাহিত্য হয় না। সে জন্যেও অনেক সময়ের দরকার। সামান্য মরা মাছকেও ভিনিগার সস্-এ আগে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখার পরই তা ভেজে মানুষের পাতে দেওয়ার মতো হয়। সামান্য কাবাব বানাতেও অনেকই প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় ; আর লেখা কি অতো চটজলদি সহজ ব্যাপার ?

পাঠক-পাঠিকাকে মান দিলে, যথার্থ ইমপর্ট্যান্স দিলে, তবেই না তাঁরা সেই মান ফিরিয়ে দেবেন ফুলের সঙ্গে, মালার সঙ্গে ?

ইতি--লেখক

পুনশ্চ ঃ সত্যজিৎ রায়ের স্বাস্থ্য প্রসঙ্গে তোমার চিন্তাটা তোমার একার নয়। তা সব বাঙালীরই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সবিনয়ে একটা কথা বলব। ভুল বুঝো না।

নেহেরু থাকাকালীনও এমনই একটা গেল ! গেল ! রব উঠেছিল যে, আফটার নেহরু ? হু ?'

www.boiRboi.blogspot.com

ব্যাপারটা হাস্যকর বলে মনে হয়েছে আমার। এখনও মনে হয়।

তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের তুলনা কেন করা হয় তা আমার সুবুদ্ধি বা দুর্বুদ্ধি বা সব বুদ্ধিরই বাইরে। আমাদের কোনোদিনই SENSE OF PROPORTION ছিলো না। এবং এমন বোকা বোকা নায়ক-পুজোর প্রথা অন্য সভ্য-অসভ্য এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত কোনো প্রজাতির মধ্যেই আছে বলেও আমার জানা নেই।

কোনো জাতিই কোনো "একজন হিরো"কে ধরে বড় হতে পারে না। বেঁচে থাকতে পারে না। এগোতে পারে না। তাও তেমন হিরো সামরিক ক্ষেত্রে বা রাজনীতির ক্ষেত্রে থাকলেও থাকতে পারেন। যেমন, ফ্রান্সের নেপোলিয়ন এবং চার্লস দ্যগল, কিউবার ফিডেল ক্যাস্ট্রো, আমেরিকার জন কেনেডি, তোমাদের শেখ মুজিবর রহমান, ইরাকের সাদ্দাম হুসেন ইত্যাদি।

কিন্তু সাহিত্য-শিল্প-চিত্রকলার ক্ষেত্রে এমন হওয়াটা কখনই সম্ভব নয়।

বাঞ্ছনীয়তো নয়ই!

সত্যজিৎ রায়কে আমি তোমার চেয়ে একটুও কম ভক্তি করিনা। উনি যে আমাদের গর্ব সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ থাকার কথা আদৌ ওঠে না। তবুও সবিনয়ে বলব, আমার মনে হয় যে, হি ওজ আ লিটল ওভাররেটেড।

সকলের যশ-ভাগ্য বা পুরস্কার-ভাগ্য সমান হয় না।

আমরা ওকে নিয়ে হয়তো একটু বেশিই মাতামাতি করেছি।

সাহেবরা কিছু বললেই আমরা বড়ই দ্রব হয়ে যাই। এই হীনমণ্যতা আমরা কোনোদিনও কি কাটিয়ে উঠতে পারবো না?

লেখক

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

তোড়া, কল্যানীয়াসু,

নিবন্ধ-টিবন্ধ লেখা পণ্ডিতদের কাজ। যার কর্ম তারে সাজে।

প্রকৃতির এবং সবিশেষ অরণ্যর কী ভূমিকা তা নিয়ে একটি নিবন্ধ লিখবার 'বরাদ' এসেছে।

'বরাদ' শব্দটি ওড়িয়া। মানে হচ্ছে অর্ডার। অন্যান্য ভাষার শব্দে নানা মজা আছে। যদিও ওড়িয়া এবং আসামী আদৌ কঠিন নয় শেখা। আমরা কূপমণ্ডুক বলেই শিখিনা অথচ অধিকাংশ শিক্ষিত ওড়িয়া এবং আসামী (এবং তাঁদের মধ্যে শিক্ষিতর সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদের চেয়ে অনেকই বেশি) বাংলা বলতে তো পারেনই, লিখতেও পারেন। যাঁরা কার্যব্যপদেশে কখনও পশ্চিমবঙ্গে স্বল্পদিনও থাকেন তাঁরা তো অবশ্যই পারেন।

আমরা যে আমাদের প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে কোনো ঔৎসুক্যই রাখি না ! তার মধ্যে ওড়িশা আসামই নয় শুধু, বাংলাদেশও পড়ে। নিজেদের রবীন্দ্রনাথ-সত্যজিৎ বাজিয়ে আর ভাঙিয়ে নিজেদের মূর্খ ও মূঢ়তার কাঁচের ঘরে এখনও সগর্বে বাস করে যাচ্ছি।

জাতি হিসেবে আমরা যে কোথায় নামিয়ে এনেছি নিজেদের, To a point of no-return. এই অন্ধত্ব শুধু তাই প্রমাণ করে। আমরা সর্বজ্ঞ। কিন্তু পেটে বোমা মারলেও প্রয়োজনের সময়ে কিছুমাত্রই বেরিয়ে আসে না। না জ্ঞান, না বুদ্ধি, না গান, না নাচ, না সাহিত্য ; কিছুমাত্র নয়। লিলিপুটের দেশ হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ।

প্রবন্ধ লেখার মতো জ্ঞান-গম্মী আমার নেই। এই মর্মে একটি ছোট লেখা আগে লিখেছিলাম একটি কাগজে। সেটিই রদবদল করে দিলাম।

অরণ্যর যে কী ভূমিকা আমাদের জীবনে তা আমাদের মধ্যে খুব কম মানুষই হয়তো বুঝি। একবিংশ শতাব্দীর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মানুষ পরমাণু অস্ত্রর ভয়াবহতা নিয়ে যতখানি আতঙ্কিত ঠিক ততখানি আতঙ্কিত হওয়ার কথা ছিলো তার সার্বিক অরণ্য-নাশের ভয়ে। কিন্তু এখনও সেই আতঙ্ক মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল এবং চক্ষুষ্মান মানুষদের মধ্যে ছাড়া অন্যদের

www.boiRboi.blogspot.com

প্রভাবিত করেনি।

অথচ অরণ্য আমাদের অন্য মা।

আজকের নগরবাসী, বহুতল-অট্টালিকার মানুষের আদিবাসই ছিলো অরণ্যেই। এই মা'ই আমাদের যা কিছু মৌল ও প্রাথমিক চাহিদা ছিলো তার সবকিছুই মিটিয়ে ছিলেন। একদিন অরণ্য-মধ্যবর্তী পর্বতের গুহা-কন্দরই ছিলো আমাদের আশ্রয়। বল্কল এবং পশু-চর্মই ছিলো আমাদের আদিম পরিধেয়। বনের ফলমূল, শিকার-করা পশুপাখির মাংস, স্বচ্ছতোয়া নদীর জল, ফলের মধ্যের অমলিন তারল্যই ছিলো আমাদের আদিম পানীয়। শিকড়-বাকড় ছিলো আমাদের ওষুধ। গুহাগাত্রের চিত্রই ছিলো আমাদের শিল্পবোধের আদিমতম স্ফুরণ।

অরণ্যর মধ্যের আশ্চর্য, স্বাভাবিক ভারসাম্য, বিচিত্র প্রজাতির, কী প্রাণীর অভাবনীয় সহাবস্থানের দৃষ্টান্তর কথাও বোধহয় আমাদের মনে নেই।

অরণ্যর গভীর শান্তি, গাম্ভীর্য এবং মননের পরিবেশই আমাদের পূর্বসূরীদের অনেককে ঋষি, দার্শনিক ও কবি করেছিলো।

তোমার যদি অনিদ্রা রোগ থাকে, যদি হাইপারটেনসান, বা অশান্তি থাকে তবে তুমি ট্যুওরিষ্ট স্পট এ গিয়ে হোটেলে না থেকে যে-কোনো রাজ্যের যে-কোনো অখ্যাত অরণ্যর বন-বাংলোতে গিয়ে ক'টা দিন একটু 'কষ্ট' করে থাকো।

যদি শীতেই যাও তো ভালোই। সকালে ঘুম ভাঙবে নানান পাখির ডাকে। পক্ষীবিশারদ হবার দরকার নেই তোমার। পণ্ডিতদের মধ্যে বেশিরভাগই অপণ্ডিতদের অনাবিল আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকেন। নাম-না-জানা পাখিদের ডাকে ঘুম ভেঙ্গে উঠে আলোয়ান জড়িয়ে বারান্দার রোদে এসে বসো। দেখবে, রোদের আঙুল কেমন আদরে সকালের শিশিরের চুলে হাত বোলাচ্ছে। পাহাড়তলির বস্তিতে মা ডাকছে ছেলেকে, লাটাখাম্বাতে কুয়ো থেকে জল তোলার ক্যাঁচোর-কোঁচোর শব্দ ভেসে আসছে, সরষেক্ষেতে সরষে ফুটেছে না, তো যেন হলুদ গালচেই বিছিয়ে দিয়েছে কেউ, তোমারই জন্যে। চারিদিকে নরম, যুদ্ধ-ভয়-হীন, শান্ত-স্নিগ্ধ পৃথিবীর সবে ঘুম-ভাঙা পায়ের ঘুঙুর-পরা শব্দ।

দু তিনকাপ চা খেয়ে নিয়ে শীতকাতুরে তুমি, গা-গরম করে বেরিয়ে পড়ো জঙ্গলে হাঁটার জন্যে। কোনো বিশেষ গন্তব্যে নয়। সকাল থেকে রাত শহরে আমরা কোনো না কোনো গন্তব্যর গোলকধাঁধায় বাঁধা পড়ে চোখবাঁধা বলদেরই মতো ঘুরেই মরি শুধু।

শুধু চলাই হয়, পৌঁছনো হয় না কোথাওই! কিন্তু চলা তো পৌঁছনোর জন্যেই!

এখানে অন্য ব্যাপার। এখানে গন্তব্যহীনতাই গন্তব্য। অন্ধগলিরও চোখ থাকে এখানে। বুঝতে পারবে প্রতি পদক্ষেপেই, তোমার শুকিয়ে—পাকিয়ে ওঠা মন নতুন করেই গ্রীষ্মর পুটোলেকা ফুলেরই মতো রঙীন পাপড়ি মেলবে এক এক করে।

অরণ্য মানেই বাঘ-ভালুক সাপ-কোপ নয়।

আপাত-তুচ্ছ সব প্রাকৃতিক সাধারণ শব্দ-গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শর মধ্যেও এক অসাধারণ পৃথিবীকে আবিষ্কার করবে তুমি। নিজেকেও পুনরাবিষ্কার করবে তারই সঙ্গে। নবীকৃত করবে। প্রাণিত করবে।

আমলকি গাছ থেকে পাতা ঝরে পড়বে, ছাতারে পাখির দল হঠাৎ ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা করে

ডেকে উঠে শহরের মান্যগণ্য রাশভারী তোমাকে মুহূর্তে নস্যাৎ করে দেবে। নীলচে-বেগুনী সম্বলপুরী সিল্কের শাড়ি-পরা কোনো সুন্দরী গর্ভিণী নারীর মতো ময়ূরী, তার ভারী শরীর নিয়ে যেন অনেক কষ্ট করে এগাছ থেকে ওগাছে উড়ে যাবে। প্রজাপতি উড়বে সকালের রোদে ফিনফিনে ডানায় আলো ছিটিয়ে। কাঠঠোকরা উৎসারিত এবং বেহিসাবী আনন্দে কাঠ ঠুকবে ক্রমাগত। দূরজঙ্গলের গভীর থেকে তার দোসর সাড়া দেবে। তোমাকে আচমকা চমকে দিয়ে বনপথের ডান পাশ থেকে বাঁ পাশে সাদা-কালো পতাকার মতো লেজটি নাড়িয়ে দৌড়ে যাবে কাঠবিড়ালী। জানিয়ে যাবে তোমাকে, 'অকারণ পুলক' শব্দটির সঠিক তাৎপর্যটি কী!

খরগোস বড় বড় কান উঁচিয়ে আড়াল থেকে তোমাকে ক্ষণকাল নিরিখ করেই জরীপ করে নেবে। নিয়েই, হারিয়ে যাবে শিশির-ভেজা, হাঁটুসমান খস্‌স্‌-গন্ধী ঘাসে।

অদৃশ্য, পুরুষচিতল হরিণ ডাকবে গভীর সবুজ শীত-গন্ধী উপত্যকা থেকে টাঁউ টাঁউ টাঁউ করে। নীল টিপ এরমতো কাঁচপোকা ঘুরে ঘুরে উড়বে, আকাশের ঘন নীলকেও লজ্জা পাইয়ে দিয়ে। তুমি হেঁটে চলবে আপন মনে ভাবতে ভাবতে। দেখবে, তোমার মনের মধ্যে যা কিছুই গুটোনো ছিলো, লুকোনো ছিলো অজানিতে ; চড়াতে-বাঁধা তানপুরার তারেরই মতো টানটান টনটনে হয়ে ছিলো, সব অবরুদ্ধ বোধ, অভিযোগ, অভিমান সবকিছুরই উৎসমুখ হঠাৎই খুলে যাবে। ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে করবে সকলকেই। এমনকি, আশ্চর্য! নিজেকেও।

নিজের ভারশূন্য, চিন্তাহীন আনন্দ-ঘন অস্তিত্বকে, নিজেরই বুকের মধ্যেএতদিন লুকিয়ে-থাকা অন্য এক সত্তাকে আবিষ্কার করে তুমি নিজেই এক অননুভূত অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে যাবে। তোমার মধ্যের সদ্য-আবিষ্কৃত সেই নতুন-তোমার, কাছের জনেদের প্রতি, নিজেরও প্রতি এক নিবিড় বনজ ভালোবাসা জন্মাবে। লতা যেমন করে গাছকে জড়ায়, তেমন করে জীবনকে জড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে তোমার। বাসি, মলিন, প্রাত্যহিকতার, একঘেয়েমির শতছিন্ন দরিদ্র জীবনটিকে সম্পূর্ণ অন্য এক আলোয় আভাসিত দেখতে পাবে। উদার, দিগন্তবিস্তৃত ঢেউ-খেলানো সবুজ অরণ্যানী তোমাকে যাই-ই দেয়, তাই-ই বিশল্যকরণী। যে-সুখে কারো দীর্ঘশ্বাস নেই, ঈর্ষা জড়ানো নেই ; সেই সুখই তো আসল সুখ। সে সুখ আপনাকে দিতে পারে একমাত্র প্রকৃতিই।

সমস্ত মুক্তির মধ্যেই বন্দীদশা বোধহয় নিহিত থাকেই, যেমন প্রত্যেক বন্দী মানুষের মধ্যে নিহিত থাকে মুক্ত হওয়ার চিন্তা।

অরণ্য যে মুক্তি আমাদের দিয়েছিলো তা মূর্খ আমাদের পছন্দ হয়নি। মাথায় ছাদ ছিলো, গাছে ফল ছিলো, অরণ্য-মধ্যবর্তী ভূমিতে-বোনা ধান-গম-বাজরা ছিলো, অসুখে শেকড়-বাকড় ছিলো. শীতে আগুন ছিলো গরম হবার, সন্ধের পর পশুর চামড়া আর শিং দিয়ে বানানো ঢোলক আর শিঙা ছিল বাজাবার। বাজিয়ে, গান গেয়ে, নাচবার। মহুয়া ছিলো, সলপ্ গাছ ছিলো, ছিলো খেজুর, পানমৌরি, ভাত ; মদ তৈরি করবার।

আধুনিকার্থে বড়লোক বলতে যা বোঝায় তা মানুষ তখন ছিলো না বটে কিন্তু সুখ ছিলো অনেকই! অনেক মাইল সুন্দর বনপথে হেঁটে বেড়াতে হতো, পাহাড়ী ঝর্নায় চান করতে হতো, সাদামাঠা খাওয়ার খেয়ে হজম হতো তখন, সঙ্গিনীর সঙ্গে মিলিত হলে সুখ হতো অনেকই বেশী। তারপর কৃষ্ণপক্ষের রাতে নক্ষত্রজ্যোৎস্নায়, অথবা শুক্লপক্ষের রাতে চাঁদের

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

আলোয় সঙ্গিনীর কটিবেষ্টন করে নাচ হতো, গান হতো। ঘুম হতো অনেকই গাঢ়, এখনকার চেয়ে। জীবনের সমস্ত ক'টি মূল ক্ষেত্রে অরণ্যবাসী মানুষ অনেকই বেশী সংপৃক্ত ছিলো। মাখামাখি, অঙ্গাঙ্গী হয়ে ছিলো তার প্রতিটি কাজ এবং অনুভূতির সঙ্গে। অরণ্য থেকে সরে এসে, অরণ্যকে নষ্ট করে, কেটে, পুড়িয়ে, সামান্য প্রয়োজনের স্বাভাবিকতার মধ্যে আমাদের মিথ্যা প্রয়োজনের নিবিড় বন গজিয়ে আমরা অনেকই বেশী অখুশী, পীড়িত করেছি নিজেদের।

মেকী, ভণ্ড করেছি। নষ্ট করেছি। ভ্রষ্ট করেছি। চিরদিনের মতো।

আসলে এই আধুনিকতা, এই নিত্য-বর্ধিত জাগতিক অপ্রয়োজনের-প্রয়োজনের প্রতি চরম লোভ, যে সব প্রয়োজনের বেশীটাই মেডিয়ারই তৈরী করা ; যেসবের খুব কমই আমাদের সত্যিই প্রয়োজন ছিলো ; আমাদের সত্য দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গেছে অরণ্যর সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করে। কোনো গভীর বনপথে বসন্তর ভোরে অথবা চৈত্রের শেষে অথবা পৌষের পড়ন্ত বিকেলে একা একা হেঁটে এলে সুখ কোথায়, সুখ কাকে বলে, আনন্দর প্রকৃত স্বরূপ কি ? তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে-কেউই।

'যে-কেউই' বললে বোধহয় ভুল বলা হবে। মনের অব্যবহারে আর টাকার চিন্তায় আর অনাদরে যে-সব মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বা ভালোত্ব মরেই গেছে তাঁদের মন যে আর মানুষের মন নেই ! টাকা, তথাকথিত সুখ, ভালো থাকা, ভালো খাওয়া, ফ্ল্যাট, কালার টিভি, ভি সি আর আর গাড়ির স্বপ্নই যাঁদের জীবনের একমাত্র প্রার্থনা তাঁদের মুক্তির পথ কি আর আছে ?

বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর "কনকোয়েস্ট অফ হ্যাপীনেস" বইয়ে সুখের প্রকৃত তাৎপর্যমণ্ডিত একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন বহুদিন আগে। লণ্ডনের কোনো টিউব স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম-এ একজন পরমাসুন্দরী যুবতী এসে দাঁড়ালেন। প্রত্যেক পুরুষের চোখ গেলো তাঁর দিকে। যুবতী গর্বে ও সুখে জরজর হয়ে ঋজু পপলারের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন হাজার মানুষের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে। তাঁর মতো সুখী সেমুহূর্তে বোধ হয় আর কেউই ছিলো না পৃথিবীতে।

স্বল্পক্ষণ বাদেই আরেকজন যুবতী নেমে এলেন সেখানে। সমস্ত পুরুষের চোখ তখন প্রথমাকে ছেড়ে দ্বিতীয়ার দিকে পড়ল। কারণ, তিনি প্রথমার চেয়ে অনেকই বেশী সুন্দরী। এবং যেই এই অঘটন ঘটলো প্রথমা সেই মুহূর্তেই পৃথিবীর সব চাইতে দুঃখী মহিলা হয়ে গেলেন। লজ্জায় দুঃখে, কষ্টে অধোবদন হয়ে রইলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথ আত্মবোধ প্রবন্ধে বলেছেন ঃ (শান্তিনিকেতন)

"জগতের রহস্যাগারের মধ্যে শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত যেমনি জটিল ও ভয়ংকর হোক না কেন, আমাদের কাছে তা নিতান্তই সহজ হয়ে দেখা দিয়েছে অথচ জগৎটা আসলে যে কী তা যখন সন্ধান করে বুঝে দেখবার চেষ্টা করি তখন কোথাও আর তল পাওয়া যায় না। সকলেই জানেন বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে এক সময় বিজ্ঞান ঠিক করে রেখেছিল যে পরমাণুর পিছনে আর যাবার জো নেই, সেই সকল ক্ষুদ্রতম মূল-বস্তুর যোগ-বিয়োগেই জগৎ তৈরী হচ্ছে।কিন্তু বিজ্ঞানের সেই মূল-বস্তুর দুর্গও আজ টেঁকে না। আদিকারণের মহাসমুদ্রের দিকে বিজ্ঞান যতই এক-এক পা এগোচ্ছে ততই বস্তুত্বের কুলকিনারা কোন্ দিগন্তরালে বিলুপ্ত

হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত বৈচিত্র্য সমস্ত আকার-আয়তন একটা বিরাট শক্তির মধ্যে একেবারে সীমা হারিয়ে আমাদের ধারণার সম্পূর্ণ, অতীত হয়ে উঠছে।"

সুখ বলে যা জানি আমরা, তা এমনই। সুখের প্রত্যাশাতে বাইরে যাবার দরকার ছিলো না হই হই করে আত্মসম্মানজ্ঞানহীন ভিখিরির মতো। সুখের বাস আমাদের মনেরই মধ্যে। কোনো জাগতিক প্রাপ্তিই কাউকে কোনোদিন সুখী করতে পারেনি। পারবেও না। কোনদিনও না।

ইদানীং উত্তরবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ যেখানেই যাই সেখানেই লোকমুখে শুনি যে, জঙ্গল সব শেষ হয়ে গেলো। নিজের চোখে তো দেখিই ! চরিত্র, সৌন্দর্য এবং অরণ্যরও প্রকৃতি বোধহয় একই রকম। গড়তে সময় লাগে অনেকই, তিল তিল করেই তা গড়ে ওঠে ; কিন্তু নষ্ট হতে সময় লাগে সামান্যই।

শিলাখণ্ডের সঙ্গে অন্য শিলাখণ্ডের ঘর্ষণে যে আগুনের সৃষ্টি হয়,সেই আগুন আবিষ্কার করে মানুষ সভ্যতাতে এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। অরণ্য যদিও সবই দিয়েছিলো তাকে তবুও সে সেই অরণ্যকেই নিত্য নতুনভাবে বিনাশ করে চলেছে। তখন মানুষের সংখ্যা ছিল স্বল্প, অরণ্যরও যায় আসেনি কিছু ; কিন্তু আজ তা ধ্বংস হতে বসেছে।

নিরাপদ আরামে কাঠের ঘরে বা গুহামধ্যে সে থেকেছে, শিকার-করা পশুর চামড়া পরে সে তার লজ্জা নিবারণ করেছে, পাখির পালক দিয়ে, রকমারি ফুল ও পাতা দিয়ে সে তার অঙ্গসজ্জা করেছে। অরণ্যর মাটির গভীর থেকে লৌহ আকর পেয়ে সে তা আগুনে গলিয়ে লোহা পেয়েছে। আরেক নতুন যুগের সূচনা হয়েছে তার ইতিহাসে। অরণ্য-গভীরের নদীতে বাঁধ বেঁধে সে জলাশয় তৈরী করে তা থেকে সেচের জল পেয়েছে। আরও পরে প্রপাতের জলকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে সেই জলধারা সূচীমুখ দিয়ে প্রবাহিত করে তা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছে। হাজার লক্ষ বছর মাটির নিচে প্রোথিত থাকা অরণ্যই প্রস্তরীভূত হয়ে কয়লা হয়ে তা জ্বালানী সরবরাহ করেছে। নানা শক্তির উৎস হয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা এই যে, মানুষ যা নইলে মানুষই হতো না এবং মানুষ থাকবেও না ভবিষ্যতে (একদিন সত্যিই হয়তো থাকবে না), সেই মনুষ্যত্ব, পুরোপুরি মানবিক গুণাবলী ; তার শিল্পকলা, সংগীত, তার সাহিত্য, তার মহাকাব্য, দর্শন, তার সংগীতের সপ্তস্বরের নির্দেশ—এইসবই অরণ্যই তাকে দিয়েছে। অরণ্যই মানুষকে দিয়েছে মানসিক শান্তি, দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামলিমা, নক্ষত্রখচিত মহাকাশের চাঁদোয়ার নিচে নিজের ক্ষুদ্রতা সম্বন্ধে তাকে অবহিত করেছে।

মননের ক্ষমতা দিয়েছে তাকে অরণ্যের নির্জনতা, সৌন্দর্য, সংগীত, শিল্প, দর্শন এবং অধ্যাত্মচিন্তার মতো তথাকথিত জাগতিক লাভহীন বিষয়সমূহে মনকে কেন্দ্রীভূত করবার তীব্র ইচ্ছা জাগিয়েছে মানুষের মনে অরণ্যই। একজন মানুষ যতই বিজ্ঞান-বিশ্বাসী, বা আধুনিকই হন না কেন, তাঁর মনুষ্যজনোচিত গুণাবলী যদি শুধুই খাওয়া-পরা আর টাকা, আরও টাকা রোজগারের দৈনন্দিন প্রক্রিয়াতে একেবারেই নষ্ট না হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সেই মানুষের জীবনে অরণ্যর আজও কোনো বিকল্প নেই।

অরণ্যর প্রকারভেদ হয়।

www.boiRboi.blogspot.com

একমাত্র অস্ট্রেলিয়া ছাড়া অন্য সবক'টি মহাদেশের অরণ্যেই যাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। নিজের দেশে সমস্ত রাজ্যের অরণ্যে তো যাই-ই। আমার দেশের মতো সুন্দর দেশ, আমাদের অরণ্যর মতো সুন্দর অরণ্য ও অরণ্যচারী মানুষও কম দেশেই আছে।

সুন্দরবনের ম্যাংগ্রোভ জঙ্গলের সুঁদরী, সাদাবানি, কেওড়া, বাইন, গোলপাতা ও হ্যাঁতালের গা-শিউরানো অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য, যা ক্বচিৎ কার্লুর বিষণ্ণ তীক্ষ্ণ ডাকে বা বাঘের গম্ভীর গর্জনে ছিদ্রিত হয় ; সেই ছমছমে অতিপ্রাকৃত সৌন্দর্যের সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের কান্হার গভীর শাল জঙ্গলের অনেকই অমিল।

কিন্তু তা বলে কেউই কারো চেয়ে খারাপ নয়। করবেট-কান্ট্রির কুঁমায়ূর বনের আর কিপলিং-কান্ট্রির সীওনীর জঙ্গলের মধ্যে বৈষম্য আছে এবং এই দুইজঙ্গলের সৌন্দর্য দুরকম। উত্তরবঙ্গের তিস্তার উপত্যকার গহন বনের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকার গহন বনের মিল নেই, যেমন মিল নেই মহানদীর উপত্যকার বনের আর কাবেরী গোদাবরী উপত্যকার গহন বনের মধ্যে। সব জঙ্গলই সুন্দর, সব জঙ্গলই প্রার্থিত তাদের বৈষম্য সত্ত্বেও।

বনমাত্ররই এক অসীম সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে মানুষের এবং বিশেষ করে আধুনিক মানুষের উপরে।

শীগগীরই একটা সময় আসছে যখন মানুষকে নিছক নির্মল কলুষহীন প্রশ্বাসের আশ্বাসেই অরণ্যর দুয়ারে ছুটে যেতে হবে বার বার। অরণ্যই হবে একবিংশ শতাব্দীর হতভাগ্য রিক্ত মানুষের শেষতম অবলম্বন।

কানাডাতে একটি গাছ কাটলে দশ বছর জেল হয়। এবং সে দেশে এবং অন্যান্য উন্নত পশ্চিমী দেশের আইন শুধু আইনের বইতে লেখা থাকবার জন্যেই সংসদের তকমা পায় না। এ বড়ই দুঃখজনক সত্য যে, ভারতবর্ষে আজকেও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্রর কমলাকান্তর দপ্তরে উল্লিখিত উক্তি সমানভাবেই প্রযোজ্য ঃ "আইন ! সে তা তামাশামাত্র ! বড়লোকেরাই পয়সা খরচ করিয়া সে তামাশা দেখিতে পারে।"

আইন না-মানাটাই এদেশে চরম উচ্চশিক্ষা এবং পরম সপ্রতিভতার লক্ষণ, নিজের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তির পরাকাষ্ঠার প্রকট প্রকাশ। তা রাজপথের গাড়ি চালানো সংক্রান্ত আইনই হোক অথবা অরণ্য-সংক্রান্ত আইনই হোক।

সমস্ত আইনের ক্ষেত্রেই এখানে সমান নৈরাজ্য।

শিক্ষাও আমাদের অনেকের কাছে শুধুমাত্র ডিগ্রীরই সমার্থক। তাই শিক্ষিত দেশবাসীরা জ্বালাময়ী ভাষায় বন-সংরক্ষণের স্বপক্ষে সংবাদপত্রের সম্পাদকের দপ্তরে চিঠি লিখে নির্বিকার নিশ্চিন্তিতে চুরি-করে-কাটা কাঠ দিয়ে বাড়ি বানান অথবা কাঠের বোঝা দিয়ে রান্না করেন। অরণ্যর নিকটস্থ অথবা মধ্যবর্তী যে কোনো বসতি এবং ছোট শহরে এই ঘটনা চোখ মেলে চাইলেই লক্ষ্য করা যায়। আমরা মনে করি যে, আইন শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের প্রতিই প্রযোজ্য নয় কিন্তু অন্য সকলের প্রতিই তা প্রযোজ্য।

দায়দায়িত্ব যা, তা শুধুমাত্র জ্যোতিবাবু এবং নরসিমহা রাও-এর।

অরণ্যর মধ্যে যেসব নিয়ম চোখ মেললে প্রতীয়মান হয় তার থেকে মানুষ অনেকই শিখতে পারতো। কত অজস্র প্রাণ, কত পাখি, প্রজাপতি, পোকা, পশু, সরীসৃপ। কত

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

ফুল, লতা-পাতা, কত মহীরূহ। ফুলের মধু, অথবা ছোট পোকা খাচ্ছে পাখিরা, পাখি বা পাখির ডিম খাচ্ছে সাপ, আর সাপকে খাচ্ছে ময়ূর। ময়ূরকে খাচ্ছে চিতা অথবা ক্বচিৎ বড় বাঘ। বনের মধ্যে মূল খুঁড়ে খাচ্ছে শুয়োর শজারু। আবার শুয়োর ও শজারুকে খাচ্ছে চিতা বা বড় বাঘ। মেঠো ইঁদুর আর খরগোশ খাচ্ছে কচি ঘাস। তাদের খাচ্ছে শেয়াল, বা নেকড়ে। গাছের পাতা, মাটির ঘাস, মহুয়া, আমলকি, হ্যাঁতাল খাচ্ছে শম্বর, বারাশিঙা, হরিণ আর তাদের খাচ্ছে চিতা বা বড় বাঘ। বনের মধ্যের এই অসাম্যর মধ্যেও যে একধরনের সাম্য আছে, সেই সাম্যই এক প্রাণীকে অন্যর, সব প্রাণীকে অরণ্যর মুখাপেক্ষী করে তুলেছে।

প্রাকৃতিক নিয়মেই কোনো বিশেষ প্রজাতির সংখ্যা স্থিরীকৃত হয়। হরিণ বাড়লে বাঘ আসে। কোনো বিশেষ বনে বাঘের বাড়াবাড়ি হলে ডাঁশের কামড় বা বুনো কুকুরের দলের ভয়ে তাদের সে বন ছেড়ে পালাতে হয়। মৃত্যু এখানে আসে অমোঘ নিয়তি হয়েই। অরণ্যর মধ্যে মৃত্যু নিয়ে কোনো বাড়াবাড়িই হয় না।কারণ, আরণ্যক মানুষ অথবা প্রাণী কারোই নগরভিত্তিক, অতি লোভী সবজান্তা মানুষদের মতো অমর হবার আকাঙ্ক্ষা নেই। জন্মালে মরতে হয়ই! মানুষকে অমর যদি হতে হয়ই তবে তা কীর্তির মধ্যে দিয়েই হতে হয়, শুধুমাত্র ভালো খাওয়া-পরার লোভেই জর্জর, ইতর, বিবেকহীন, বন্ধ্যা জীবনের অফলপ্রসূ দৈর্ঘ্য দিয়ে নয়। এই-ই ভারতের মুনি-ঋষিদের শিক্ষা। অরণ্যর বাণী।

অরণ্যর ভূমিকা আমাদের জীবনে কি এবং অরণ্য নষ্ট করার পেছনে কোন্ প্রবণতা কাজ করে, কি কি ভাবে অরণ্য নষ্ট হয় তা যদি মনে করা যায় তাহলেও সেই শিক্ষার কথাই আগে মনে আসে।

তবে আমি বলব, আজকের পৃথিবীর অনেক দেশের এবং বিশেষ করে ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যা। শুয়োর বা গিনিপিগের মতো মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জিওমেট্রিক প্রগ্রেশানে মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের বৃদ্ধি। এই দুই-ই হচ্ছে শুধুমাত্র অরণ্যই নয়, যা কিছুই জাগতিক বা মানসিক ভালো তার সবকিছুই নষ্ট করে দেওয়ার মূলে। এই দুই প্রলয়ংকরী শক্তিকে ব্যাহত করতে না পারলে ভারতবর্ষে অরণ্য আর থাকবেই না ভবিষ্যতে। তার চেয়ে বড় দুর্দৈবের কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না।

ভারতবর্ষের অরণ্যর গভীরে যেসব মানুষ বাস করেন তাঁরা খুবই গরীব সন্দেহ নেই। তেমনই গরীব ভারতের অন্যত্র বসবাসকারী অনেক মানুষই আছেন। কিন্তু তাঁরা গরীব হলেও অরণ্যচারীরা অনেক সরল, সৎ, ভালো এবং সুখীও। ভারতীয়ত্বর যা-কিছু ভালো তা এখনও বেঁচে আছে তাঁদেরই মধ্যে।

বন এবং বন্য-প্রাণী আমাদের অশিক্ষা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, সরকারী ঔদাসীন্য এবং বিবেকহীনতার জন্যে যতখানি নষ্ট হয়েছে ততখানি না হলেও অনেকখানি নষ্ট হয়েছে কোনো কোনো তথাকথিত জনদরদী প্রবক্তাদের জন্যেও।

যেমন মুণ্ডাদের প্রকৃত ভালো করতে চাইলে জার্মান মিশনারী ফাদার হফম্যানের মতো নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং সত্যিকারের সহমর্মিতার প্রয়োজন। যে অরণ্যই ছিলো তাদের প্রাণ, তাদের স্বক্ষেত্র, তাদের শক্তির মূল উৎস, তাদের চলমান অতীত, হাজার হাজার বছর ছিলো তাদের সংস্কৃতির পীঠস্থান, সামাজিক, আত্মিক এবং ধর্মীয় অভিব্যক্তির মূল পটভূমি এবং

উৎস সেই অরণ্যকেই 'উল্‌গুলানের' তির্যক অর্থ করে বিনষ্ট করতে বলা যেতে পারে কিন্তু তাতে না হয় আদিবাসীদের প্রকৃতলাভ, না হয় সামগ্রিকভাবে দেশের।

আদিবাসীরাই তো দেশের মূল বাসিন্দা, তাদের বাদ দিয়ে দেশের প্রকৃত ভালোর কথা ভাবা হবেই বা কেন? সংকীর্ণ রাজনীতি এবং রাজনীতিমনস্ক কিছু লেখালিখিও অরণ্যর বিনাশের এক প্রধান কারণ। "সাসানডিরি" উপন্যাসের মূল বক্তব্যই হলো এই কথা। জানিনা, কতখানি ফোটাতে পেরেছি।

"অনেকে এমনভাবে বলেন, যেন প্রকৃতির আদর্শ মানুষের পক্ষে জড়ত্বের আদর্শ; যেন যা আছে তাই নিয়েই প্রকৃতি; প্রকৃতির মধ্যে উপরে উঠবার কোনো বেগ নেই; সেই জন্যেই মানবপ্রকৃতিতে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে পৃথক করে দেখবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু, আমরা তো প্রকৃতির মধ্যে একটা তপস্যা দেখতে পাচ্ছি; সে তো জড় যন্ত্রের মতো একই বাঁধা নিয়মের খোঁটাকে অনন্তকাল অন্ধভাবে প্রদক্ষিণ করছে না।

আতপ্ত পঙ্কের ভিতর দিয়ে একদিন কত মহারণ্যকে সে তখনকার ঘনমেঘাবৃত আকাশের দিকে জাগিয়ে তুলেছিল আজ কেবল কয়লার খনির ভাণ্ডারে তাদের অস্পষ্ট ইতিহাস কালো অক্ষরে লিখিত রয়েছে। যখন তার পৃথিবীতে জলস্থলের সীমা ভালো করে নির্ণীত হয়নি তখন কত বৃহৎ সরীসৃপ কত অদ্ভুত পাখি কত আশ্চর্য জন্তু কোন্ নেপথ্যগৃহ থেকে এই সৃষ্টিরঙ্গ ভূমিতে এসে তাদের জীবলীলা সমাধা করেছে, আজ তারা অর্ধরাত্রির একটা অদ্ভুত স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই উৎকর্ষের দিকে অভিব্যক্ত হবার অবিশ্রাম কঠোর চেষ্টা, সে থেমে তো যায়নি। থেমে যদি যেত তা হলে এখনই যা কিছু সমস্তই বিশ্লিষ্ট হয়ে একটা আদি অন্তহীন বিশৃঙ্খলতায় স্তূপাকার হয়ে উঠত। প্রকৃতির মধ্যে একটি অনিদ্র অভিপ্রায় কেবলই তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে আকর্ষণ করে চলেছে বলেই তার বর্তমান এমন একটি অব্যর্থ শৃঙ্খলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পারছে। কেবলই তাকে সামঞ্জস্যের বন্ধন ছিন্ন করে এগোতে হচ্ছে, কেবলই তাকে গর্ভাবরণ বিদীর্ণ করে নব নব জন্মে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে। (রবীন্দ্রনাথের 'সুন্দর', শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালা।)

সাম্প্রতিক অতীত থেকে দেশের সমস্ত রাজ্যের বনবিভাগের শব্দকোষে একটি নতুন শব্দ সংযোজিত হয়েছে যার নাম 'সোশ্যাল ফরেষ্ট্রী' বা সমাজভিত্তিক বনসৃজন। মূল অরণ্য যে বিনষ্ট হয়েছে, হচ্ছে, তা স্বীকার করে এবং সেই ক্ষতি রাতারাতি পূরিত হবে না জেনে সীমিত উপায়ে পরিবেশগত উন্নতিবিধানের জন্যে গ্রামে-গঞ্জে-নগরে যে সব গাছ শুধুমাত্র শোভাবর্ধনই করে না আমাদের বহুবিধ উপকারেও লাগে সেই সব গাছ লাগাতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করছেন বনবিভাগ। নাই মামার চেয়ে কানা মামা নিশ্চয়ই ভালো। কিছুমাত্রও যদি করা হয় তাও মঙ্গলকর। শুনেছি পশ্চিমবঙ্গে এই বিশেষ ক্ষেত্রে বেশ ভালো কাজ হয়েছে। এবং হচ্ছে। অন্য রাজ্যেও হচ্ছে।

অরণ্য ও অরণ্য-প্রাণী এমন সাংঘাতিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত কেন হলো তা নিয়ে ভাববার প্রয়োজন ঘটেছে। গাছ, সমস্ত অরণ্যেই চিরদিনই কাটা হয়ে থাকে। সেই গাছকাটা হয় সুচিন্তিতভাবে, নিয়মমাফিক। গাছের যাঁরা কারবারী তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই গাছের প্রতি

www.boiRboi.blogspot.com

দরদ নেই, এক বিশেষ ব্যবসা বলেই জানেন তাঁরা। এমার্সনের কয়েকটি বিখ্যাত পংক্তির কথা মনে পড়ে আমার যখনই এই প্রসঙ্গ মনে আসে। উনি লিখেছিলেন, "বোল্ড অ্যাজ দ্যা এঞ্জিনীয়র হু ফেলস্ দ্যা উড, লাভ নট, দা ফ্লাওয়ার এণ্ড নো ইট নট ; এণ্ড ওল দেয়ার বটানী ইজ ল্যাটিন নেমস।"

ইংরেজরা, যাঁরা আমাদের শোষণ করতে এসেছিলেন ; তাঁদের আমলেও এক স্পষ্ট পরিকল্পনা ছিলো, বিনাশের সঙ্গে সৃষ্টির এক বিশেষ সমন্বয় ছিলো। শিকারও করা হতো সেই সময়। তবুও অরণ্য ও অরণ্য-প্রাণী এই ভাবে কখনওই ধ্বংস হয়নি যে ভাবে হয়েছে স্বাধীনতার পরে। স্বাধীনতাত্তর ভারতবর্ষে এই দুই ক্ষেত্রেই যে নৈরাজ্য লক্ষ্য করা গেছে তার নজির পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

বনবিভাগের পক্ষে কৈফিয়ৎ হিসেবে বলা যেতে পারে এই নৈরাজ্য কি শুধু বনের আইনের ক্ষেত্রেই ? না, তা নয়।

স্বীকার না করে উপায় নেই যে নৈরাজ্য সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে।

বনে যেখানেই "কপিসিং ফেলিং" হয়, সেখানে কর্তিত গাছের জায়গা নেয় অন্য গাছ বনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে। এবং বেছে গেছে, বনবিভাগের মোহরাঙ্কিত হাতুড়ি দিয়ে মার্কা মেরে দেওয়া হয় ঠিকাদারদের, বড় বড় গাছকে চিহ্নিত করে। যেখানে 'ক্লিয়ার ফেলিং' হয় সেখানে বনকে নিশ্চিহ্ন করে কাটা হয়। পরে সেখানে প্ল্যানটেশান করা হয়। 'কপিসিং ফেলিং' সাধারণত হয় হরজাই জঙ্গলে আর ক্লিয়ার ফেলিং হয় একই জাতের বনে, যেমন বিহার ও বাংলায় শাল সেগুন, ওড়িশার গেন্ডুলি ইত্যাদি।

স্বাধীনতার পরে বনবিভাগের বিভিন্ন স্তরের অনেক স্বাধীন আমলা আর মুক্ত ঠিকাদারেরা মিলে মিশে যে 'মোচ্ছব' করেছেন তার নজির নেই কোনো। তবে এই ঘোরালো অবস্থা আরও ঘোরালো হয়েছে যে সব রাজ্যে 'ফরেস্ট করপোরেশান' গঠিত হয়েছে। ওয়াকিবহাল মহল থেকে শুনি যে, আগে চুরি হতো এখন নাকি ডাকাতি হচ্ছে।

দেশ যেন এক "ইনট্যান্‌জিবল অ্যাসেট"। "দেশ"-কে তো দেখা যায় না, এই থার্ড পার্সন সিংগুলার নাম্বার ব্যক্তিত্বকে যেন তেন উপায়ে হেনস্থা করা যায়। এই সত্তা কথা বলতে পারে না। লিখতে পারে না। তাই বোবা মেয়ের মতো একে ধর্ষণ করা অতীব সোজা কাজ। জোর আর চেয়ার যার এই দেশতো তারই ; তাদেরই। আমরা তো সকলেই নীরব দর্শক, শ্রোতা। দেশ-এর হাত পা নাক চোখ যে আমরা প্রত্যেকে, অন্যায় চোখে পড়া মাত্র তার প্রতিকার করার দায়িত্ব যে প্রত্যেক নাগরিকের ; এই কথাটা এখনও আমরা বুঝে উঠতে পারিনি বলেই জ্যোতিবাবু, নরসিমহা রাও-এর চওড়া কাঁধে আমাদের সব বোঝা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে আছি চোখের সামনে মাকে ধর্ষিতা হতে দেখেও। আমাদের বীরত্ব, বিবেক এবং লজ্জাহীনতারও কোনো সীমা নেই। আমাদের এই নপুংসকতা, বিবেকহীনতা, নিদারুণ নিশ্চেষ্টতা আমাদের পরের প্রজন্ম, আমাদের ছেলে মেয়েরা কখনই ক্ষমা করবে না।

তাদের কাছে মুখ দেখাবো যে কী করে তা ভাবি না পর্যন্ত আমরা।

আমি তবুও আশা করি যে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বনকর্মীরা আয়নার সামনে এসে দাঁড়াবেন কখনও।

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

তবে একই সঙ্গে একথাও বলব যে, প্রত্যেক রাজ্যের বনবিভাগের অধিকাংশ কর্মীই সৎ। বিপজ্জনক জীবন যাপনের বিনিময়ে তাঁরা প্রায় কিছুই পান না। বিভিন্ন পদমর্যাদার বনকর্মীদের মাইনে ন্যূনপক্ষে তিনগুণ বাড়িয়ে দেওয়া অবিলম্বে দরকার। এও শুনতে পাই যে তরুণদের মধ্যে অনেকে বন ও বন্য প্রাণী সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহ পোষণ করেন বলেই এই বিভাগে যোগ দিচ্ছেন পাবলিক সার্ভিস কমিশানের পরীক্ষা পাশ করে।

তরুণদের কাছে আমার অনেকই প্রত্যাশা। দেশকে বাঁচালে তাঁরাই বাঁচাবেন। মারলেও তাঁরাই নিপুণভাবে মারবেন।

বন্য-প্রাণীও সরকারের এবং আমাদের প্রত্যেকেরই ঔদাসীন্যে অবলীলায় সবকিছু নষ্ট হয়ে গেলো চোখের সামনে। বিলুপ্ত এখনও হয়নি এই যা সান্ত্বনা।

হাতির 'হ্যাবিট্যাট' নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রতিবছরই উত্তরবঙ্গে হাতির অত্যাচার তুঙ্গে উঠেছে। অরণ্য নষ্ট হওয়াই এর মূল কারণ।

বাঘের সংখ্যা কেন বিপজ্জনক ভাবে হ্রাস পেলো তাও বিশেষজ্ঞদের আলোচনার বিষয়। আজকাল বন্য-প্রাণী সংরক্ষণ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করা অনধিকারীদের এক 'অবসেশনে' দাঁড়িয়ে গেছে। আমিও অনধিকারী। তবে বন-বিশেষজ্ঞ বা প্রাণী-বিশেষজ্ঞ নই বলেই কিছু বলতে সংকোচ এবং ভয়ও বোধ করি। বন-বিভাগের অনেক প্রবীণ এবং বিজ্ঞ কর্মীদের মুখে এবং আমলাশাহীর বাইরের প্রাজ্ঞ মানুষদের কাছে যা শুনি তাতে মনে হয় আরাম-কেদারায় বসা এবং অধুনা পুঁথি-পড়া বন-বিশারদদের জ্বালায় তাঁদের প্রাণ প্রায় অতিষ্ঠ হবার উপক্রম হয়েছে।

বাঘ-শিকার বীরোচিত কাজ? না কাপুরুষের?

সে বিতর্কে না গিয়েই বলব যে বাঘ-শিকারের পারমিট ইংরেজ আমলে দেওয়া হতো। নিয়মিত বাঘ শিকারেও বাঘের সংখ্যা ইংরেজ আমলে তেমন কিছু কমেনি। বাঘের সংখ্যা কমতে শুরু করে স্বাধীনতার পর থেকেই বনবিভাগের আইন-কানুনের শৈথিল্য, ও মানুষের মনে আইন-অমান্য করার ভয় চলে যাওয়ায়।

অবশ্য একথা ঠিক যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যে সব বনাঞ্চলে ইংরেজ আমেরিকান বা অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যরা ছিলো সেই সব জঙ্গলে নির্বিচারে শিকার হয়েছে। তবে যা শুনেছিলাম তাতে এই কথাই জানি যে, তাদের মধ্যে বাঘ-শিকারী বেশী ছিলো না। তারা ওয়েপন-ক্যারীয়ার বা জীপে করে রাতের বেলা শিকারে যেতো কিন্তু নেহাৎ আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগরূক না হলে কোনো বাঘ তাদের হাতে মারা পড়তো না।

সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব তাঁর 'দেশে বিদেশে'তে স্বাধীন আফগানিস্থানের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিলেন। আমাদের স্বাধীনতার রকমটাও অনেকটা সেরকমই হয়ে উঠেছে দিনে দিনে।

কাবুল শহরের জনবহুল পথে ঘোড়ার গাড়ি চলেছে। কিন্তু তার বড়ই কষ্ট। প্রত্যেকটি পথচারীকে ড্রিবল-করা ফুটবলারের মতো কাটিয়ে ডাইনে বাঁয়ে, এঁকে বেঁকে যেতে হচ্ছে। গাড়িকে কোনো পথচারীই পথ ছেড়ে দিচ্ছে না।

"ব্যাপারখানা কী?" তা শুধোতে, উনি উত্তর পেয়েছিলেন যে "আমরা তো স্বাধীন জাত। প্রত্যেকেই স্বাধীন এখানে। ঘোড়ার গাড়িকে পথ ছাড়তে যাবে মানুষ কোন দুঃখে?"

www.boiRboi.blogspot.com

প্রকৃত স্বাধীনতায় জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে স্বেচ্ছারোপিত পরাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়াটাই বাঞ্ছনীয় এই কথাটা আমরা এখনও শিখলাম না। আমাদের 'স্বাধীনতার' চরিত্রও যদি অর্ধশতাব্দী আগের আফগানিস্থানের স্বাধীনতার মতোই হয় তবে ভারতবর্ষও হয়তো কোনোদিন আজকের আফগানিস্থানের মতোই স্বাধীন—স্বচ্ছল হয়ে উঠবে।

দেশ স্বাধীন হবার পরই দিল্লীর কর্তাদের উর্বর মস্তিস্কে কেউ ঢুকিয়ে দিলো যে আমাদের বিদেশী মুদ্রার বড়ই অভাব তাই সাহেবদের দিয়ে বাঘ মারিয়ে "ফোরিন ইক্সচিঞ্জ" অর্জন করা যাক।

হবুচন্দ্র রাজা হলে গবুচন্দ্র মন্ত্রী থাকেই। অতএব দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেলো। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ব্যাঙের ছাতার মতো ভুঁইফোড় শিকার-কম্পানী গজিয়ে উঠতে লাগলো। তাতে যোগ দিলেন প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষে অনেক হৃত-রাজ্য রাজা-মহারাজা এবং নামী-দামী অনেক শিকারিও, শিকারই যাঁদের জীবিকা ছিলো, অথবা যাঁদের অর্থোপার্জনের যোগ্যতা না থাকলেও অঢেল অর্থর প্রয়োজন ছিলো। নানা কম্পানীর নানা টার্মস হলো বাঘ মারিয়ে দেবার। কারো বা হলো 'টু প্রড্যুস আ টাইগার উইদিন শুটেবল ডিসট্যান্স।"

পাঁচ হাজার দশ হাজার ডলার ফেলে বাঘ মেরে অথবা অন্যকে দিয়ে মারিয়ে আমেরিকান, জার্মান, সুইডিশরা শালী এবং স্ত্রীকে দেখাবার জন্যে বাঘ নিয়ে উড়ে গেলেন।

উনিশশো পঞ্চাশ থেকে পঁয়ষট্টি বা আরও পর পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যের বন বাংলোর রেজিস্টার, যদি এখনও রাখা হয়ে থাকে ; তবে, প্রত্যেক ফরেস্ট-ডিভিশানে (ডি এফ ওর অধীন) যে-সব ব্লক বাঘের জন্যে বিখ্যাত ছিলো সেই সব ব্লকের রেজিস্টার দেখলেই কোনো সাংবাদিক আমার এই বক্তব্যর যাথার্থ্য প্রমাণ করতে পারবেন।

এ বিষয়ে গবেষণা হওয়া উচিত।

ফল হলো অবধারিত। কিঞ্চিৎ 'ফোরিন ইক্সচেঞ্জ' এলো বিলক্ষণ। বিস্তর বাঘও "ফওত্" হলো। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, স্বাধীন হয়ে উঠে, দেশের সর্বক্ষেত্রেই নৈরাজ্যকেই স্বাধীনতার স্বরূপ বলে জানার সময়ে স্বাধীন ভাবে প্রচুর বাঘ মেরেছিলেন স্বাধীন ভারতীয়রাও।

ইংরেজ আমলে লাঠি-হাতের লাল-পাগড়িকে দূর থেকে দেখে অপরাধীর মুখ শুকিয়ে যেতো কারণ অন্যায়কারীমাত্রেই জানতো যে, ঐ ভুঁড়িসর্বস্ব লাঠিওয়ালা লালপাগড়ি নেহাৎই একজন প্রতিভূ। তার পেছনে একটি শক্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে। অন্যায় করলে, দোষীর শাস্তি পাওয়ার সম্ভাবনা তখন প্রবল ছিলো। কিন্তু আইন এখানে উত্তরোত্তর তামাশা হতে হতে একেবারে "গ্রেট সার্কাসে"ই এসে পৌঁছে গেলো। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এতবড় "স্বাধীনতামনস্ক" মানুষদের পরাধীন করে এমন শক্তিধর কে আছে?

নিয়মানুবর্তিতা, আইন-মান্যতা এসবতো আমাদের মতো "স্বাধীন মানুষের" পায়েরই বেড়ি!

বাঘের গুষ্টি যখন প্রায় নাশ হয় হয় তখন 'গেলো গেলো' রব উঠলো। বাঘ শিকার তার কিছুদিন পর থেকেই একেবারেই বন্ধ হলো। অনেক ন্যাশানাল পার্ক ও স্যাংচুয়ারী আগে থেকেই হওয়া আরম্ভ হয়েছিলো। তারপরই দেশের নানা জায়গায় ব্যাঘ্র প্রকল্প চালু হলো। সেই সব প্রকল্পর জন্যে এখন দেশ এবং বিদেশের সাহায্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয়

www.boiRboi.blogspot.com

হচ্ছে। বাঘ বেড়েছেও বেশ কিছু।

ব্যাঘ্র-প্রকল্পগুলির মধ্যে কয়েকটির ফিল্ড-ডিরেক্টর এবং অধস্তন কর্মচারীরাও তাঁদের উৎসর্গিত-প্রাণ মনোভাবে এবং নিরলস পরিশ্রমের গুণে এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্যে প্রকৃত উৎকণ্ঠাতে মুগ্ধ করেছেন দেশবাসীকে।

ব্যাঘ্র-প্রকল্পে কিন্তু শুধুমাত্র বাঘই বাস করে না। বাঘের সংখ্যার তুলনায় অন্যান্য প্রাণী ও পাখির সংখ্যা অনেকগুণ বেশী হয়।

আসামের মানাস প্রকল্পের শ্রী সঞ্জয় দেব রায়, কানহা ব্যাঘ্র-প্রকল্পর শ্রীলাওলেকর ও অমর সিং পারিহার, সিমলিপাল প্রকল্পের পরলোকগত, খৈরী-খ্যাত ; সরোজ রাজ চৌধুরী (বর্তমান ডিরেক্টরকে জানার সৌভাগ্য আমার হয়নি) এবং পালামৌর বেতলা প্রকল্পর গেম-ওয়ার্ডেন সঙ্গম লাহিড়ী তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

শ্রী সঞ্জয় দেব রায়ের মতো বনপালকের আরো প্রয়োজন ছিলো এ দেশে।

সঙ্গম, বয়সে তরুণ কিন্তু তাঁর উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মুগ্ধ হয়েছি। কৈলাস সাঙখালার সঙ্গে সিমলিপালের বড়াকামরা বাংলোতে একবার আলাপিত হয়েছিলাম। এপ্রিল মাসে ওখানে হাতির গণনা হয়। তাকে বলে 'ম্যাঙ্গো সেনসাস'। যেমন বেতলাতে চিতল হরিণের গণনা হয় ডিসেম্বরের শেষে। শুনেছি, সঙ্গম এখন বেতনার ফিল্ড ডিরেক্টর।

কৈলাস সাঙখালার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন সরোজ রাজ চৌধুরী মশায়। তবে, সুপুরুষ সাঙখালা মশাই-এর সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছিলো ওঁর অভিজ্ঞতা যতখানি পুঁথি-নির্ভর, ততখানি অভিজ্ঞতা-নির্ভর নয়। আমার ভুলও হতে পারে। কারণ তিনি একজন বিখ্যাত ব্যাঘ্র-বিশেষজ্ঞ।

কানহাতে ওঁরা শুধু "কোর এরীয়াই" নয় "বাফার জোন"-এর বাইরেও পরিখা কেটেছেন যাতে গবাদি পশু ঢুকে বন্য তৃণভোজী প্রাণীদের মধ্যে "রাইণ্ডারপেস্ট" রোগ না ছড়াতে পারে। আরও যা করেছেন ওঁরা তা খুবই প্রশংসার্হ। প্রকল্পর এলাকার মধ্যে থেকে সমস্ত মনুষ্যবসতি স্থানান্তরিত করেছেন অন্যত্র। যদিও উদ্বাস্তু হতে হয়েছে অনেককে ভিটে-মাটি ছেড়ে কিন্তু এত বড় দেশের "বড় ভালোর" জন্যে আমাদের কিছু কিছু মানুষের "ছোট ছোট কষ্ট" তো মাথা পেতে নিতেই হবে!

বনবিভাগ অবশ্য অপসারিত প্রত্যেককেই পুনর্বসিত করেছেন অন্যত্র।

কিন্তু বনের মানুষ বন ছেড়ে কি থাকতে চায়!

কানহাতে যা সম্ভব হয়েছে তা কিন্তু সম্ভব হয়নি সিমলিপালে আর বেতলাতে। এই দুই প্রকল্পের এলাকার মধ্যে বহু গ্রাম আছে, মুখ্যত আদিবাসীদের। মানাস-এ এই ব্যাপারটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়নি কারণ জনবসতি প্রায় ছিলই না ঐ দিকে। কিন্তু কাজিরাঙ্গাতে সমস্যা হয়েছে। ব্যাঘ্র প্রকল্প হিসেবে মধ্যপ্রদেশের বান্ধবগড় এবং রাজস্থানের রানথামবোরও কৃতিত্বের দাবি রাখে।

পূর্ব আফ্রিকার সেরেংগেটি ন্যাশনাল পার্ক, পৃথিবীর বৃহত্তম মৃত আগ্নেয়গিরির মৃত গহ্বরের মধ্যের গোরাংগোরো ন্যাশনাল পার্ক, লেক মানীয়ারা ইত্যাদি পার্ক থেকে প্রভূত বিরূপতা সত্ত্বেও 'মাসাই' আদিবাসীদের অপসারিত করতে হয়েছিলো।

পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-প্রকল্পের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমার গভীর সন্দেহ আছে। বাঘ আমার প্রিয়তম প্রাণী। তা সত্ত্বেও বলব যে, পরোক্ষে অনাহারী, অসহায়, মানুষদের নরখাদক বাঘের 'শিকার' করিয়ে নরখাদক বাঘ বাড়াবার পেছনে কোনো যুক্তি, কোনো সভ্য দেশেই সমর্থন করা যায় না। সুন্দরবনে ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বরাদ্দ থেকে এই সব গরীব অনাহারী মানুষদের যদি মাসিক অনুদানের বন্দোবস্তও থাকতো, যাতে বাঘের পেটে যাওয়ার জন্যে জেনেশুনেই প্রতিবছরই মৌলে-জেলে— বাউলেদের বনে আসতে না হয় তাহলেও বা বুঝতাম !

যে-বাঘেদের চরিত্রই বিকৃত তাদের মেরে ফেলাই ভালো। একজন মানুষের জীবন পৃথিবীর সবচাইতে দামী কোনো বাঘের জীবনের চেয়েও বেশী দামী। কেন এই কথা বলছি তা বিস্তারিতভাবে আলোচনার ক্ষেত্র এই প্রবন্ধ নয়। কিন্তু বলছি, সুন্দরবন সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই।

অরণ্যচারণে যেমন দিগভ্রষ্ট হয় পথচারী, তেমনই আমি বোধহয় অরণ্যবিষয়ক আলোচনা করতে বসে দিগভষ্ট হয়ে গেলাম। যদি হয়ে থাকি, তবে, তোড়া, তুমি নিজগুণে আমাকে মার্জনা কোরো।

অরণ্যর সঙ্গে পরিবেশের নিবিড় ও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কর কথা পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা তোমাদের অনেক প্রামাণ্যভাবে বোঝাতে পারবেন। একজন সাধারণ বন-প্রেমী হিসেবে তোমার বোঝার সুবিধের জন্যেই শুধু বলব যে, অরণ্যর বিনাশ যে কী প্রলয় উপস্থিত করতে পারে তার সামান্য ধারণা থাকলেও তুমি আতঙ্কিত হয়ে উঠবে ভয়ে।

একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো ইতিমধ্যেই যে, আবহাওয়া দ্রুত বদলে যাচ্ছে। শুধু কলকাতারই নয়, ঢাকারই নয়, সমস্ত জায়গারই। শীতকালে শীত পড়ছে না, বর্ষাকালে বৃষ্টি হচ্ছে না অথবা অতিবৃষ্টি হচ্ছে। উল্টোপাল্টা হাওয়া বইছে, শিশুকাল থেকে আমরা যা দেখে এসেছি, জেনে এসেছি তা অপ্রমাণ করে। বসন্ত বলতে কোনো ঋতুর অস্তিত্ব আর আছে বলে বুঝতে পারি না আমরা। শরৎ এবং হেমন্তও যেন ছুটি নিয়েছে। এই সবই মুখ্যত অরণ্য বিনাশের ফল। নানা দেশের মরুভূমি, নির্জন পর্বত এবং সমুদ্রতলে আণবিক বোমা বিস্ফোরণও এর জন্যে কিছুটা দায়ী হয় তো।

অরণ্যর ভূমিকা মানুষের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ও সুস্থ মানসিকতার উপরে কতখানি তা বোঝার সময় আমাদের প্রত্যেকেরই হয়েছে।

আজকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আর শুধু রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আর অর্থনৈতিক ব্যাপারেই একে অন্যর উপর নির্ভরশীল নয়, আজ তারা সকলে মিলে অন্তত আংশিকভাবে হলেও একে অন্যর ভাগ্য নির্ধারণ করছে, নির্দিষ্ট করছে ভবিষ্যৎ।

প্রকৃতিকে, অরণ্যকে নষ্ট করার জন্যে, যা কিছু যে-কোনো দেশই আজ অবধানে বা অনবধানে করছে তাদের লোভে, তাদের অদূরদর্শিতাতে তাদের আকাট মূর্খামিতে, সেই সব কিছুই নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করছে অন্যদের ; সমস্ত পৃথিবীর মানুষের অদৃষ্ট।

আজকে কলকাতার আকাশ বাতাস, হাওয়া দূষিত হলে, বাংলাদেশের জঙ্গল কেটে ফেললে তার প্রভাব হয়তো পড়বে থাইল্যান্ডে অথবা চীনে অথবা ভুটানে। ইউ এস এ অথবা

জাপানের অরণ্য ধ্বংস হলে সেখানকার মানুষদের যতখানি ক্ষতি হবে ঠিক ততখানি ক্ষতি হয়তো হবে আইসল্যান্ড অথবা সলোমন দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দাদের।

প্রকৃতির সুন্দর সব পশু-পাখি, ফুল, গাছ, প্রজাপতি, মাছ, অরণ্যর গভীর যা কিছুকেই আশ্রয় দেয় তা যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তবে তা হাজারীবাগের চায়ের দোকানীকে যেমন প্রভাবিত করবে তেমনই করবে নাগপুরের কারখানার শ্রমিকদের, যেমন করবে দিল্লীর মানসিং রোডের মানুষদের তেমনই লন্ডনের বাস ড্রাইভারদের অথবা সেশেলস্ দ্বীপপুঞ্জের ছোট ছোট আইল্যান্ডের প্লেনচালানো পাইলটদেরও।

পল রোবসন-এর সেই বিখ্যাত গানটি আজকে বোধহয় এই ক্ষেত্রেও গাইবার সময় হয়েছে সমবেত কণ্ঠে পৃথিবীর সমস্ত মানুষদের। "উই আর ইন দ্যা সেম বোট ব্রাদার, ইফ উ্য রক্ দ্যা ওয়ান্ এণ্ড উ্য আর গোয়িং টু রক দ্যা আদার"।

ভালো থেকো, বনফুলের তোড়া।

ইতি—লেখক

www.boiRboi.blogspot.com

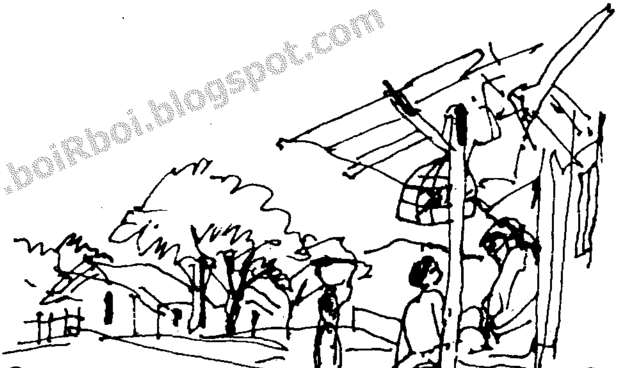

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

তোড়া, কল্যাণীয়াষু,

আজকে গায়ে জ্বর নিয়ে ঘুম ভাঙ্গলো।

তিনচার দিন থেকে রোদের দেখা নেই। পশলা পশলা বৃষ্টি হচ্ছে আর পরতে পরতে মেঘের শাড়ি খুলছে আর পরছে আকাশ। কত উজ্জ্বল অথবা নরম রঙের টক-টক মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধের অন্তর্বাসের আভাসে মুহূর্তে আভাসিত হয়েই ঢেকে যাচ্ছে আকাশের শরীর পেঁজা তুলোর সাদা মেঘের বালাপোষে।

ও তুলো কোন বীজের বুকের মধ্যে থাকে, তা, কে জানে!

শিমূল না কাপাস না সুদূর আমেরিকার দক্ষিণ ভাগের কোনো অঞ্চলে হয় সে গাছ, যেখানে কালো কোলো নিগ্রোরা উদাত্ত গলায় গান গাইতে গাইতে তুলো সংগ্রহ করে?

নাকি; মিশর দেশের নীল নদের পারে হয় এ তুলো?

জানা নেই।

কখনও কি তুমি আমাদের দিশি শিমূলের রূপ দেখেছ ভাল করে? না শুধু তুলোরই নয়, গাছেরও?

"ঋজু" বলতে আমি আগে কুমায়ুঁ বা গাড়োয়ালের চিড়-পাইন বা মধ্যপ্রদেশের সেগুন অথবা বিহারের সিংভুম জেলার উত্তুঙ্গ শালকেই বোঝাতাম। "শালপ্রাংশু" শব্দটি সংস্কৃত। ওরা সভাবতঃই প্রাচীন। "অস্তী গোদাবরীতীরে বিশাল শাল্মলী তরু", "গোদারে-এ-এ-এ-এ" এমন তান ছেড়ে গান গাইতেন আমার এক কাকা। ওঁর কথা "ঋভু"তে লিখেছি।

কিন্তু আমার শিমূল-প্রাংশু শব্দটা বেশি পছন্দ। কারণ, শিমূলের ঋজুতাই নয়, তার দু দিকে ছড়ানো অগণ্য সটান বাহুর মধ্যে, তার তেভাগা কাণ্ডর মধ্যে, একটি "SPACE" এর ব্যাপার আছে। আদর্শ পুরুষের মতো। যাতে অনেক আঁটে, অনেকে আঁটে, অনেক নারী, অনেক সুখ, অনেক মিলন, অনেক বিরহ; যার মধ্যে নির্ভরতা, প্রাজ্ঞঋষির মতো অনড় হয়ে বাস করে।

www.boiRboi.blogspot.com

শিমূল, শিমূলই!

একবার চৈত্র শেষে মানাস ব্যাঘ্র প্রকল্পে গেছি। সঞ্জয় দেব রায় সাহেব বড়পেটা রোডে ছিলেন না। সপরিবারে শিলংএ গেছিলেন। সেটা জানা ছিলো না। গৌহাটি থেকে ট্যাক্সি নিয়েই গেছিলাম। না-জানিয়ে যাওয়াতে বোকা বনলাম। মানাস গেলাম বটে। তবে থাকা হলো না। কারণ, উপরের বাংলোতে জায়গা ছিলোনা এবং নিচের বাংলোর ঘরটি থাকার অযোগ্য ছিল। লেখালেখি করারও কোনোরকম বন্দোবস্ত ছিলোনা।

রাতে যখন বড়পেটা রোডে ফিরে এলাম, গৌহাটি ফিরে যাব বলে মনক্ষুণ্ন হয়ে, তখন উনি ফিরে এসেছেন শিলং থেকে। অনেক যত্ন করেছিলেন। আপশোষ করে বলেছিলেন যে, আগামী কাল ভোরেই তাঁকে আবার শিলংএ চলে যেতে হবে কিন্তু আপনি ভাল বাংলোটি না পেলেন তো কি হলো, আমার নিজস্ব মোটর বোটে থাকবেন। আমার স্ত্রীও আপনার সঙ্গে থাকবেন। তিনি যে আপনার মস্ত ভক্ত পাঠিকা। নয়তো একটা দিন এখানে থাকুন। সব বন্দোবস্তই হয়ে যাবে। দোলের আগের দিন কী সুন্দর উৎসব হয় এখানে দেখবেন। তারপর জঙ্গলে যাব। মানাস নদীর উপরে বোটেই থাকব আমরা। বাংলোতে থাকার কোনো দরকারই নেই।

আমি হেসে বলেছিলাম, কী সর্বনেশে কথা! আমি যে দুর্মর প্রেমিক। এমন চাঁদ, এমন মানস নদী, দুদিন পরে দোল আর এমন বৌদি! একা বোটে নদীবক্ষে দুজনে-নির্ঘাৎ প্রেম হয়ে যাবে। ঐ অশরীরি প্রাণীটিকে আমি যেমন ভালও বাসি, ভয়ও করি। সে যে আমাকে কখন কেন কামড়ায় তা নিজেই জানি না। না, না অত বড় ঝুঁকি আমি নিতে পারব না। পরদিন আপনি এসে হয়তো দিলেন গুলি ঠুকে। কী দরকার!

কেন জানি না, আমার মন উচাটন হয়ে গেছিল। এরকম হয়। পাগলামির কোনো বীজ আমার মস্তিস্কে আছে। সে কেবলই ঐ চৈত্র শেষের শিমূলের বীজেরই মতো তুলো ছড়াতে থাকে। মন যে, কখন কোন জায়গার উপরে, কোন পরমা-আরাদ্ধা পরমাসুন্দরী নারীর উপরে, কোন ইপ্সিত সম্পর্কের উপরে হঠাৎ উচাটন হবে; তা আগে থাকতে আদৌ বুঝতে পারি না।

কিন্তু হলে, সে জায়গা বা নারী যতই অপরূপা হোন কী হন, সে সম্পর্ক যতই গভীর বা পুরোনো হোক অথবা আনকোরা নতুন; তা ছেড়ে যেতে একমুহূর্তও লাগে না।

এ মন আমার শিমূল তুলোর বীজ নয় গো কণ্যে! এ সর্বনাশের বীজ!

ভারী ভয় পাই একে। ভারী ভয়।

তবু, তবু আমার বেলাতেও, তুমি কিসের লইগ্যা, তা তুমিই জানো; তোমার ফুটন্ত সুগন্ধি প্রথম বেলাতে এমনই বর্ষা-সকালের মেঘ-রোদদুরের আলো-ছায়ার খেলার মধ্যে কামাতুর কবুতরের (আশ্চর্য! মনে হয় অন্য গ্রহর বিরহ-মিলনের শব্দবাহী) কুর-র কু-র-র-র শব্দের মধ্যে সিঁড়িতে বইস্যা থাকো।

শিমুল তুলো ওড়ে নিঃশব্দে আকাশের বিভিন্ন স্তরে। নিঃশব্দে, হাওয়াটা অদৃশ্য গোপন হালকা হাতে মসৃণভাবে ঠেলে দেয়, দিয়েই নিয়ে যায় দূর থেকে দূরান্তরে। কখনও কাছেও নিয়ে আসে।

www.boiRboi.blogspot.com

আর তুমি ?

তুমি গলা ছেড়ে গান গাও একটি কালো-পাড়, ছাই-খোল আর তুঁতে রঙা ব্লাউজ পরে, বাসি-চুল খুলে বসে, "আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়"।

এমন মন্থর, মেঘমেদুর, কেয়াগন্ধী সকালে কত কিছুই ঘটে যায়, যেতে পারে ; সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, অভাবনীয়, সব ঘটনা, কে তা বলতে পারে !

আমি তো চান ঘরের গায়ক, লোকের সামনে তো গাইতে পারি না। তাই মনে মনে অস্ফুটে গাই তোমার কথা ভেবে ঃ

"কী সুর বাজে আমার প্রাণে আমিই জানি, মনই জানে
কিসের লাগি সদাই জাগি, কাহার কাছে কী ধন মাগি—
তাকাই কেন পথের পানে ॥

দ্বারের পাশে প্রভাত আসে, সন্ধ্যানামে বনের বাসে
সকাল সাঁঝে বাঁশি বাজে, বিকল করে সকল কাজে—
বাজায় কে যে কিসের তানে ॥

কী সুর বাজে আমার প্রাণে আমি জানি মনই জানে...."

সুনীলদা (সুনীল রায়) যে এই গানটি কী ভাল গাইতেন ! এমন সুরেলা গলা আর বেশি শুনলাম না।

সুনীলদাকে তোমার জানার কথা নয় কিন্তু তুমি কলীমদারে শুধাইও। কলীম শরাফী ভাল কইর‍্যাই চিনতেন উনারে।

শিমূল তুলোর কথাতে ফিরে গিয়ে বলি, তুমি যদি কোনো চৈত্র দিনে শিমূল বনে গিয়ে না থাকো, যদি কালবোশেখির হঠাৎ সপাট তানে, গুণে ও চৌগুণে শিমূল তুলোর নিঃশব্দ নিপুণ নাচ না দেখে থাকো তবে কিছু অবশ্যই হারিয়েছো এ জীবনে !

কালো ঘন উড়াল আকাশের পটভূমিতে শিমূল তুলোর ঝাঁককে উড়ে উড়ে দূরে যেতে যে না দেখেছে, বক-শাবকের পাঁতির মতো ; তবে তার জীবনই বৃথা।

"মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাঁতি
ওরা ঘর ছাড়া মনের কথা যায় বুঝি ঐ গাঁথি গাঁথি"

ভালো থেকো।
বর্ষাবনের মনের কামনা

ইতি—
তোমার রূপ ও গুণমুগ্ধ—লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

কল্যাণীয়াসু,
তোড়া,

তুমি হয়তো জানো না যে প্রায় দশ বছর আগে সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র নিয়ে মানিকদার সঙ্গে আমার মত পার্থক্য হয়েছিল কিছু। কিছু বিস্ময় এবং কিছু প্রশ্ন এসেছিলো মনে।

কিন্তু শ্রদ্ধার কোনো অভাব হয়নি কোনোদিনও। আজও কোনো ঘাটতি নেই।

উনি অমল ভট্টাচার্যি বক্তৃতামালাতে '(THE TELEGRAPH' এ ছাপা হয়েছিল 27th SEPT এবং 1st OCTOBER 1982) প্রকারান্তরে বলেছিলেন যে, বাংলা ছবির দৈন্যের কারণ এই যে, বাংলা সাহিত্যই অত্যন্ত দীন। এসব দশ বছর আগেকার কথা।

"অমল ভট্টাচার্যি" বক্তৃতামালাতে বলা কিছু কথা আমার গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। নিজের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যা-কিছুই গ্রহণযোগ্য বলে মনে না-করি তা মানা আমার পক্ষে কোনোদিনও সম্ভব হয়নি। তা "পিতৃবাক্য" হলেও।

তবে বিচার বুদ্ধি যে নিজের খুব একটা বেশি আছে এমন গুমোর কখনওই ছিলো না। বক্তব্যও হয়তো পুরোপুরি সঠিক নয়। তবে "তক্‌রার" এ না নামলে তা যে ভুল অথবা ঠিক তা জানা যাবেই বা কি করে?

সাম্প্রতিক অতীত থেকে এই "তক্‌রার" শব্দটি আমাকে পেয়ে বসেছে। 'অবরোহী' যখন বেরুচ্ছিল 'দেশ'এ ধারাবাহিকভাবে তখন পশ্চিমবঙ্গর রূপনারায়ণপুর থেকে চিঠি লেখেন এক শিক্ষিত পাঠক। রূপনারায়ণপুর নামটার মধ্যেই কেমন ভোর হওয়া ভোর হওয়া গন্ধ আছে না একটা! ""রূপনারাণের কূলে জাগিয়া উঠিলাম....।"

ঠিক বললাম কি?

ভদ্রলোকের বাড়ির নাম 'বনবাস'। সেও চমৎকার নাম। তবে পোস্টকার্ড-এর চার পঞ্চমাংশ ফাঁকা রেখে উনি আমাকে এমন এমন চিঠি লিখতেন যে, তাতে তাঁর নিজাবাসকে আমার দিক থেকে "বনবাস" না বলে "বনবাঁশ" বলতে ইচ্ছে করত।

www.boiRboi.blogspot.com

ভারী ইন্টারেস্টিং, ব্যতিক্রমী মানুষ। নিন্দা কি সবাই করতে পারেন! নিন্দা, প্রশংসার চেয়েও অনেক বড় আর্ট। তাছাড়া, নিন্দুকের স্থান মাথায়। প্রশংসাকারীর স্থান গলায়। নিন্দুকেরাইতো, যদি তাঁরা "লেখানো চিঠির" নিন্দুক না হন; লেখকের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্খী। তাঁর নাম অরুণ চট্টোপাধ্যায়।

ঐ বক্তৃতা THE TELEGRAPH এ প্রকাশিত হয়েছিল দুটি সংখ্যাতে। তাই ঐ কাগজেই একটি Rejoinder লিখি।

এখানে বলে রাখা দরকার যে, সেই লেখাটি শুধুমাত্র অমল ভট্টাচার্যি বক্তৃতা প্রসঙ্গেই।

এর বাইরেও মানিকদার কাছে আমার বহু প্রশ্ন ছিল এবং আছে যা, আমি কখনও ওঁকে লিখে জানাবো। অথবা অন্যভাবে আলোচনা করব।

আপাততঃ "THE TELEGRAPH"এর লেখাটি আর তার উত্তরে মানিকদা যে দীর্ঘ স্বহস্তলিখিত চিঠি দিয়েছিলেন তার প্রতিলিপি তোমাকে পাঠাচ্ছি।

"প্রেক্ষিত" ছাড়া আমার ঐ নিবন্ধ এবং মানিকদার উত্তর দুইই বোঝা কষ্টকর হবে। কিন্তু আপাতত ধৈর্য ধরে থাকো। যদি তোমার উৎসাহ হয় আরো জানতে তবে তোমাকে সব জানাবো পরে। তুমি সাহিত্যপ্রেমী। তাই পাঠাচ্ছি।

ইচ্ছা আছে, পরের বছর কোনো পত্র-পত্রিকায় "সত্যজিৎ রায়ের চলচ্চিত্র, চিত্রনাট্য, সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি" এই রকম শিরোনামাতে একটি প্রবন্ধ লিখব। অনেক প্রশ্ন আছে মনে। বিদগ্ধ জনের সামনে উপস্থাপিত করার মতোই প্রশ্ন সে সব।

ইংরিজিতে লেখবার সম্ভাবনাই বেশি।

ভালো থেকো।

ইতি—লেখক

Enclosed :—"THE TELEGRAPH"এর ARTICLE এবং মানিকদার চিঠি।
তার উত্তরে আমার চিঠিও।

পুনশ্চ : জি. কে. চেস্টারটন একবার বলেছিলেন, "সাম পিপল কোয়াবল বিকজ দে ডু নট নো হাউ টু আর্গু।"

একবার বা তর্ক করা ভালো। তর্ক না করলে মন-জানাজানি হবে কী করে! বড়মানুষদের মন-জানা তো আরও বেশি করে দরকার নিজেদের জানার পরিধিকে বাড়াবার জন্যে!

তাই না?

www.boiRboi.blogspot.com

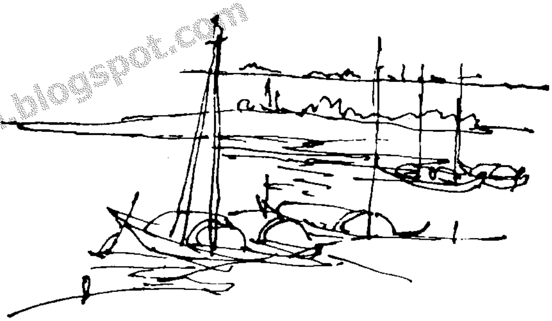

'A novelist's pen is not the lens of a camera'

Buddhadev Guha, well-known Bengali writer, joins issue with Satyajit Ray on what is good creative writing

Cinema, as a medium of expression enjoys certain positive advantages over literature because of the simple fact that it is audiovisual. The impact and appeal of a cinematic film on the viewers is immediate.

It is more akin to music in effect than literature.

But it also remains a fact that cinema, as a medium, is of comparatively recent origin, far younger than literature.

Many of those who are engaged in writing poems or prose at the moment suffer from a disadvantage of the test of quality for them is essentially the test of time.

But the work of many film directors, like the work of many fiction wiriters, will not pass the test of time, however lauded their work may be at present. Hence, any novelist worth his salt should not have any real handicap vis-a-vis a filmmaker.

To see it from the other way round, cinema and literature are interwoven as the script, which is the very essence and superstructure of a film, is basically a work of literature.

No sensible novelist ever denies the fact that film is an altogether different meduim.

Whenever a novelist sells his novel to a director for film-making he feels like giving away his daughter to a known or unknown individual of sure or doubtful character who becomes his son-in-law by virtue of the contract of sale. As the fate of most of the daughters of India even today depends very much on the character, capability and brilliance of the sons-in-law, the fate of a novel depends on the qualities of a filmmaker on whom the novelist has no control whatsover.

In this connection some of the observations made by Mr satyajit Ray ("My

life, my work," Sept. 27-Oct. 1) have set many who are engaged in fiction writing pondering.

I suppose it is time a novelist's point of view is given an airing.

Mr Ray's piece, it seems to me, sits overmuch in judgment on literary work, though the purport of Mr Ray's lecture was not derogatory to novelists as such.

Mr Ray seemed to have subtly suggested that literary works have no value unless they serve as good scripts for a director. He had dwelt on the issue of "lack of details" in many Bengali novels which he came across or considered for filmmaking.

I think it is entirely up to a novelist to be or not to be painstakingly particular on details. Detailed observations are not the only hallmark of a good novel.

Life as well as art run in a series of cycles, forward movement and pauses, much like the active and passive parts in the lives of the characters created by a novelist.

Some novels are full of details and some are not, and they can be good or bad entirely irrespective of this consideration.

Had I been a film director I would have decided to write my own script so that I could claim my films as singular and total expressions of my creativity. Many great filmmakers like Bergman, Antonioni, Kurosawa andFellini do that.

If I were incapable of or disinclined to wirting my own script then I would have chosen a novel which lacked in detail so that I could fill in the vacuum with the frills of my imagination, as that is the predominant factor in creativity.

I feel that when a cinematic or TV film is based on somebody else's literary work, it lacks the glory of total creativity. In other words, it merely remains at the level of recreating an original creation, however great the artistic value of the recreated work may be.

A Novelist's pen is not the lens of a camera. And however great a filmmaker may be, no truely great novelist will oblige any filmmaker by writing only for the benefit or convenience of the latter, since the pangs and pleasures of creativity thrive on originality.

Literature has withstood the test of centuries and it is yet to be seen whether the glittering films of today eventually surpass literature in creativity.

Mr Ray said, "...but many of our writers seem more inclined to use their minds than their eyes and ears. In other words, there is a marked tendency to avoid concrete observaion."

Then he quoted from Balzac's Madam Vanguar's lodging house in *Old goriot* as a high water mark of detalied observation by a novelist.

I do not quite understand what is ment by "concrete observation."

Writers are neither cameras nor taperecorders and they do not write with a film script at the back of their minds. On the contrary, there are writers (and I am one of them) who subscribe to the views of Cyril Connolly that "all excursions into journalism, broadcasting, propaganda and writing for the films were pure

folly, since therby we condeman a good idea, as well as bad, to oblivion."

While mentioning earlier script-writers such as Sailojananda Mukhopadhyay and Premendra Mitra, Mr Ray observed that they "were determined not to encroach into areas which would endanger the safety of their positions. What was singularly lacking was the spirit of adventure. Everyone played safe and the result was stagnation."

It appears that he does not attach any importance to the odds and constraints under which such poeple worked under at that point of time. A script-writer can only afford to be adventurous if backed by an equally adventurous producer. The kind of freedom that Government bodies or various film finance corporations floated by Central and State Governments today give directors did not exist then. The private financier was the only one around.

We are aware of many brilliant and adventurous directors who have landed their producers in calamitous financial disasters. It is only fair that one should compare like with like.

Also it is neither the duty nor the purpose of a creative novelist to do the art director's job for a film director.

Mr Ray also says : "However, the fact remains that the trait is a common one in Bengali fiction and leads one to conclude that the writers are either incapable of or disinclined to visualise beyond a certain point. This itself need not be held against a novel but in a film writer, the tendency can only lead to a film that shows a lot, but tells very little."

While Mr Ray has taken pains to choose hiswords carefully, the general message is quite clear. Because Bengali fiction writers are low on concrete observation, to him they are not much good as writers. My point is, why should an original fiction writer work with the specific needs of filmmakers in mind?

A true literary work pulsates like the heart beat of a human. What set it apart are the senstivity of the characters, their ability to suffer, their capacity for love and the repose and quiescence they possess. It is beyond the characters of a true novel to act or function merely at the physical level or-be in perputual action. They can be the least alive at that level unlike a character in a film. The spirit in the characters of a good novel, the quality which correlates impressions and images and provides responses to new feelings, operates only when the action has come to an end. With this precise aim the structure of any novel worth the name is interwoven to ensure pauses in the flow of narration.

Earnest Hemingway once told Hotchner, while watching a horse race : "It's all so beautiful in this misty light. Mr Degas could have painted it and got the light so that it would be truer on his canvas than what we now see. That is what the artist must do on canvas or on printed page. He must capture the thing so truly that its magnification will endure. That is the difference between journalism and literature."

There is similarly a difference between true literature and a film script.

www.boiRboi.blogspot.com

The original scripts written by Mr Ray so far for adults (Kanchanjangha, Nayak and Piku's Diary) are not stamped with the brilliance one expects of a director of worldwide repute.

It must be made clear that when I talk about "scripts," I mean the literary value of the scripts.

My suggestion to all filmmaker, great and small, is that they should try to master the art of writing their own original first-rate scripts after Chaplin, Fellini and Kurosawa in foreign countries and Aparna Sen in the recent past here and then proceed to make their films.

So long as filmmakers have to rely on a novelist or a short story writer for the very superstructure of the films which they propose to make, such writers rightfully deserve a minimal respect from all filmmakers.

Respect is a matter of resonant reciprocity.

We respect them. They should respect us.

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

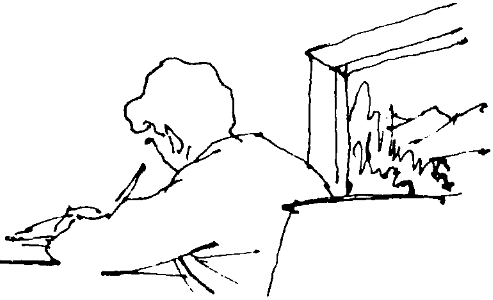

শ্রী বুদ্ধদেব গুহ সমীপে

কল্যাণীয়েষু,

টেলিগ্রাফে তোমার লেখার জবাব টেলিগ্রাফেই দেওয়া যেত। কিন্তু মনে হল ব্যাপারটাকে অত পাবলিক করার প্রয়োজন নেই। তাই তোমাকে ব্যক্তিগত ভাবে লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম।

তোমার বক্তব্য অবশ্য এককথায় নাকচ করে দেওয়া যেত। কারণ আমি কী বলতে চেয়েছি সেটা তুমি বোঝইনি ; ফলে তোমার কথাগুলো শূন্যে তলোয়ার ঘোরানোর মত হয়ে গেছে। তোমার শিরোনামাতেই গণ্ডগোল। 'A Novelist's pen is not the lens of a camera'। কেন, নয় কেন ? ঔপন্যাসিক কি তাঁর বিষয়বস্তু মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন না ? অবজারভেশন ছাড়া গল্প হয় ? উপন্যাস হয় ? ভুলে যেও না, আমি একটু-আধটু লিখি। কাজেই লেখকের সমস্যাগুলো আমারও খানিকটা জানা আছে। আর, একজন পরিচালকের কাছেও Camera lens টাতো তার নিজের চোখ ! আমার বক্তৃতায় আমি কোথাও বলিনি যে চিত্রনাট্যের গুণ না থাকলে আমি উপন্যাসকে আমল দিই না। আমি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবেই বলেছিলাম যে সিনেমা যেহেতু চোখে দেখার জিনিস, সেখানে পরিচালক এ ব্যাপারে সচেতন না হলেও ডিটেল জিনিসটা এড়িয়ে চলার উপায় নেই। সেখানে বিবেচ্য হল এই ডিটেল যথাযথ কিনা। ঔপন্যাসিক ইচ্ছা করলে তেমন ডিটেলে না গিয়ে যদি প্রধানত চরিত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ও প্লটের গতিবিধি বর্ণনায় মনোনিবেশ করেন, তাহলে তা থেকেই হবে তাঁর সৃষ্টির বিচার। কিন্তু এখানে বলা দরকার যে ডিটেল মানে শুধু ঘটি বাটি—চেয়ার টেবিলের মামুলি ফিরিস্তি নয়। কংক্রীট অবজারভেশন বলা এই কারণেই যে সৎ ঔপন্যাসিক তাঁর কল্পিত পাত্র-পাত্রী ও পরিবেশকে অত্যন্ত জীবন্ত ভাবে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ, এবং এই প্রত্যক্ষতা, এই অবজারভেশন, তিনি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেন তাঁর বর্ণনার সাহায্যে। এই পুংখানুপুংখ ডিটেল তাঁর সমস্ত কাহিনীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিব্যাপ্ত। এর মানে এই নয় যে তিনি সিনেমার কথা ভেবে লিখেছেন, বা চিত্রনাট্যকার হবার বাসনা পোষণ করেন। ডিটেল শুধু চলচ্চিত্রের গুণ নয়। কালিদাসেও এ গুণ আছে। সব মহৎ কথাসাহিত্যেরই এটা একটা বড় লক্ষণ। বালজাক, ফ্লোবেয়র, টমাস মান, দোস্তোয়েভস্কি, টলস্টয়, ডিকেন্স, প্রুস্ত বা বহু আধুনিক ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকের লেখা মন দিয়ে পড়লেই তুমি এ গুণ লক্ষ্য করবে। এ গুণ এ জাতীয় উপন্যাসকে সামগ্রিক ভাবে না হলেও, অন্তত আংশিকভাবে চলচ্চিত্রের

www.boiRboi.blogspot.com

খুব কাছে এনে দেয়। চলচ্চিত্রশিল্পের উদ্ভবে উপন্যাসের যে একটা বড় ভূমিকা আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিভূতিভুষণ পুঁইমাচায় ক্ষেন্তির শাড়ির আঁচলের বর্ণনা দিয়ে সাহিত্যের ভূমিকাই পালন করেছেন, সিনেমার ক্লোজ-আপের কথা ভাবেননি। কিন্তু এ জাতীয় inspired ডিটেল আজকালকার বাংলা উপন্যাসে সহজলভ্য নয়।

অবিশ্যি আমি এ কথাও বলেছি যে এই ডিটেলের অভাবেও উপন্যাস রসোত্তীর্ণ হতে পারে—যদি যথেষ্ট পরিমাণে অন্য Compensating গুণ থাকে। কিন্তু যিনি ছবি করবেন বা ছবির জন্য লিখবেন, তাঁর পক্ষে এ গুণ অপরিহার্য। চিত্রনাট্য যে শুধু ছবির কাঠামো সেটা তুমিও জান। কাজেই তাতে সাহিত্যগুণ থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। তাই সচরাচর একজন ঔপন্যাসিককে দিয়ে চিত্রনাট্য লেখানোর কথা ভাবাই হয়না, কারণ চলচ্চিত্রের বিশেষ শৈল্পিক সমস্যাগুলো তাঁর জানার কথাই নয়। চরিত্র বা প্লটসৃষ্টি চলচ্চিত্রের শেষকথা নয়। তাই যদি হত, তাহলে এত ভালো গল্প থেকে এত নিকৃষ্ট ছবি হত না। চলচ্চিত্রকার বা চিত্রনাট্যকার যদি নতুন কাহিনী সৃষ্টি করেন (যেমন 36 Chowringhee Lane) তাহলে প্রথম পর্যায়ে তাঁকে খানিকটা ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব পালন করতে হয় বৈকি। 'খানিকটা' বলছি এই কারণেই যে ঔপন্যাসিকের ভাষার ব্যবহার এখানে নিষ্প্রয়োজন। যেটা দরকার সেটা হল প্লট, চরিত্র ও সংলাপ। এটা চলচ্চিত্রকারের একটা বাড়তি ভূমিকা। নিজের গল্প নিজে লিখে নেবার নজির চলচ্চিত্রে বেশি নেই। এমন কি বিদেশে খুব নামী পরিচালকের মধ্যেও মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনই নিজের গল্প নিজে লিখেছেন। কুরোসাওয়া কোনোদিনই উপন্যাস বা নাটকের ভিত্তিতে ছাড়া ছবি করেননি। তাঁর চিত্রনাট্য লেখে চারজনে। চ্যাপলিন নিজের গল্প নিজেই লিখেছেন, কারণ Tramp চরিত্রটি তাঁর নিজেরই সৃষ্টি।

আসলে চিত্রনাট্য রচনা একটি স্বতন্ত্র আর্ট এবং অতি কঠিন আর্ট। তুমি সিরিন কনিয়লের উদ্ধৃতি দিয়ে চিত্রনাট্যকে হেয় করে অজ্ঞতারই পরিচয় দিয়েছ। বেশ কিছু লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিককে এককালে হলিউড মোটা মাইনে দিয়ে তাদের দিয়ে কিছু চিত্রনাট্য লিখিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের যে শুধু সদ্ব্যবহারই করা হয়নি তা নয় ; তাদের কাজের উপর অন্য লেখককে দিয়ে কলম চালানো হয়েছিল। কনিয়লের উক্তি সম্ভবত এই সব বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের তিক্ত অভিজ্ঞতার উদ্দেশেই লেখা। তুমি চিত্রনাট্য লিখতে চাও না সে ভালো কথা ; কিন্তু সেই কারণে সাহিত্যের অবমাননা হয় এমন ভাবাটা অর্বাচীনতা। কারণ সে প্রশ্নটাই ওঠে না।

আরেকটা কথা, তুমি যদি script-এর Literary value নিয়ে মাতামাতি কর তাহলে কিন্তু আমাকে উপন্যাসের cinematric vslue-এর জোর দিতে হয়। আসলে দুটোই অর্থহীন। সিনেমা যেমন সাহিত্য নয় (সাহিত্যের কিছু লক্ষণ থাকলেও) তেমনি সাহিত্যও সিনেমা নয় (সিনেমার কিছু লক্ষণ থাকলেও)। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা শিল্পমাধ্যম। জন-অরণ্য উপন্যাস হিসাবে তেমন উচ্চমানের বলে মনে হয় না, কিন্তু ছবি হিসেবে জন-অরণ্যর সার্থকতা দেশে বিদেশে স্বীকৃত। এটা শুধু ডিটেলের অভাব পূরণ করার জন্য নয় ; আরো আমূল রদবদল এতে আছে, যেটা উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করলে বুঝতে পারবে। এই রদবদলে পরিচালক কিন্তু সাহিত্যিকের ভূমিকাই পালন করেছেন। কারণ সেখানে প্লট ও চরিত্র দুই-

এরই আংশিক রূপান্তর ঘটেছে। সিনেমার জন্য একেবারে ready-made গল্প সাহিত্যে থাকতে পারে না। সব গল্পই অল্পবিস্তর গড়ে পিটে নিতে হয়। তুমি যে বলেছ—'So that I could fill the vacuum with frills of my imagination' ইত্যাদি, সে কাজটাই সত্যজিৎ রায় প্রথম থেকেই করে এসেছেন। মনে হয় তুমি সেটা সম্পর্কে সচেতন নও।

প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ সাহিত্যিকদের ব্যাপারে তুমি যে সাফাই গেয়েছ, সেটা সম্পূর্ণ বাজে কথা। যেখানে সেই একই অবস্থায় পথের পাঁচালী তৈরি হয়েছে, সেখানে তুমি এ কথাটা কী করে বললে জানি না।

অবিশ্যি তোমার সঙ্গে আমার মতের ফারাক হতে বাধ্য, কারণ কাঞ্চনজঙ্ঘা ও পিকু-র সার্থকতা যদি তুমি হৃদয়ঙ্গম না করে থাক (দুটি ছবিই বিদেশে World-standard-এর বলে পরিগণিত), সেখানে বুঝতে হবে যে আমাদের wave-length আলাদা।

আমাদের প্রীতিশুভেচ্ছা নিও

সত্যজিৎ রায়।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ঐ চিঠি পাবার চার-পাঁচদিন পর ডাকে আমি এই পোষ্টকার্ডটি ওঁকে লিখি।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেলাম।

আমার সঙ্গে আপনার মত-পার্থক্য আছে। দুজন প্রাপ্তবয়স্কর মধ্যে মত পার্থক্য থাকতেই পারে। তার মানে মতবিরোধ নয়।

আপনার চিঠির শেষে আপনি লিখেছেন যে আপনার সঙ্গে আমার wave-length-এর তফাৎ আছে। আমারও তাই মনে হয়।

শ্রী সত্যজিৎ রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

শ্রদ্ধা জানবেন।

বিনত—বুদ্ধদেব গুহ

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

তোড়া, কল্যাণীয়াসু,

আজ রবিবার,

প্রতি ছুটির দিনেই একজন ছেলে আসে আমাকে ম্যাসাজ করাতে। ভারী ভাল ছেলে। নাম মুরারী।

ম্যাসাজ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, চিন্ময়দা (চ্যাটার্জি) "প্যাসিভ একসারসাইজের" প্রবল প্রবক্তা ছিলেন। উনি বলতেন, খর-যৌবন হলো অ্যাকটিভ একসারসাইজের সময়। আর তারপরই প্যাসিভ একসারসাইজ। উনি অবশ্য প্যাসিভ লাভমেকিং এর কথাও মাঝে-মাঝে বলতেন। সেটা যে ঠিক কী, তা জেনে নেওয়ার সুযোগ হয়নি।

চিন্ময় চ্যাটার্জি সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা ছিল যে, তিনি ঘাড়ে পাউডার মেখে দুগ্ধফেননিভ ধুতি এবং আদ্দির পাঞ্জাবী পরে রবীন্দ্রসদনে "প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন" গাইতেন। এবং অত্যন্ত "মেয়েলি" ছিলেন।

আসলে তা আদৌ নয়। ওঁর মতো কাঁচা-রসিকতা কম মানুষকেই করতে শুনেছি। মাঝে মাঝেই ফোন করে বলতেন, বুদ্ধ, একটা শোনো। নতুন কালেকশান।

কোথা থেকে পেলেন চিন্ময়দা?

চুনী দিয়েছে। চুনী ফোন করেছিল পড়শু।

চুনী গোস্বামীরও এ বাবদে খুব সুনাম আছে। তবে চুনীর পিঠোপিঠি দাদা মানিকের কাছে আছে দুনিয়ার গল্প। শ্লীলই বেশি। অশ্লীল কম। প্রায় প্রতিটি সন্ধেতেই ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবের "বার" মানিকের গল্পে মুখর থাকে। মানিকের অবশ্যই উচিত বাংলা ANECDOT এর একটি COLLECTION প্রকাশ করা।

চিন্ময়দা কত অল্প বয়সে চলে গেলেন!

অনেকেই রবিবারের দুপুরে ওঁর বাড়িতে গন্ধরাজ লেবু আর ঠাণ্ডা জল সহযোগে জিন অথবা ভডকা খেতে খেতে গল্প করতে করতে দেরী হয়ে গেলে, ওঁদের সাবেকি বাড়ির

www.boiRboi.blogspot.com

মতো বদরাগী ছিল ছাত্তার। তার কথা আছে অনেক বইয়েতে, বিশেষ করে "বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে"।

এই পটভূমিতে অনেকদিন আগে একটি গল্প লিখেছিলাম আনন্দবাজারের পূজো সংখ্যায়। নাম দিয়েছিলাম "বীজতলি"। অবশ্য তাতে ওড়িশার কটকও ছিল মিশে। পটভূমি হিসেবে। ওটি আমার একটি প্রিয় গল্প। হয়তো "শ্রেষ্ঠ গল্প" বা "বুদ্ধদেব গুহর ছোট গল্প" অথবা "পারিজাত-পারিং" সংকলনে আছে।

যাই হোক, ঠিক করেছি এই পটভূমিতে একটি পূর্ণাঙ্গ ভরাট উপন্যাস লিখব। নাম দেব 'আলোকঝারি'।

এখনও কি রাগ করে আছ? তোড়া? মানিকদা তো ভালো হয়ে উঠছেন।

তবে?

ইতি— লেখক

পুনশ্চ : কেয়াবনের কথা, রাঙামাটি পর্বতজুয়ারের কথা মনে পড়ে গেল, আশ্চর্য! কেয়ার চিঠি পেয়ে। কেয়া লাহিড়ী। বহরমপুরের অশোক লাহিড়ীর স্ত্রী। সঙ্গে ওর আঁকা ছবিও পাঠিয়ে ছিল। ওদের সঙ্গে চিঠিতেই আলাপ। বর্দ্ধমানের কৌশিক লাহিড়ীর মাধ্যমে। কৌশিক, অত্যন্ত মনোযোগী পাঠক এবং শুধুই স্তুতি করেনা, নিন্দাও করে। তাই ওকে বিশেষ চোখে দেখি। সে এখন পুরোদস্তুর ডাক্তার।

কেয়ার চিঠিটা পড়া শেষ করে, ঘুমিয়েছিলাম। আর দ্যাখো, কেয়া থেকে কী করে কেয়াবনে এসে উপনীত হলাম অচেতন আর অবচেতনের মধ্যিখানে।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

লেখক,
খুব ভালো লাগলো আপনার চিঠি পেয়ে।
"আলোকঝারির" জন্যে অপেক্ষা শুরু হলো এখন থেকেই।
আচ্ছা! "পারিজাত-পারিং" মানে কি?
অনেকদিন ধরে ভাবছি শুধোবো। বইটি পড়িনি। কী নিয়ে লেখা?
জানাবেন।
কালকে আমি চাঁটগা যাচ্ছি।
আপনার জন্যে কি আনব জানাবেন। **পত্রপাঠ**।
তড়া আছে। তাই শেষ করলাম।

ইতি—ফিরদৌসী।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

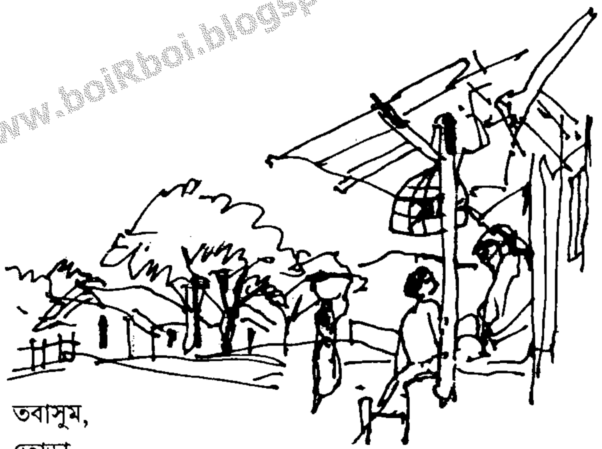

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

তবাসুম,

তোড়া,

কল্যাণীয়াসু,

চাঁটগা থিক্যা আর কী আনবা ?

শুঁটকি লইয়া আইস্যো। লইট্যা আর বম্বে-ডাক। ইলশা আর ইচা পাইলেও লইয়া আইস্যো।

কত্তদিন যে খাইনা শুঁটকি। ইখানের মানষে শুঁটকি খাইলেও চিনি দিয়া রান্ধে। শুকনা লংকা, পিঁয়াজ রসুনের ছেরাদ্দ না হইলে কি শুঁটকি খাওন যায় ? কও দেহি ?

তোমারে লিখতাছি যহন, মুখ দেহি ভইর‍্যা গেল গিয়া জলে। যেমন, কদবেল, ধইন্যাপাতা, কাঁচালঙ্কা, নুন চিনি দিয়া মাইখ্যা খাইবার কথা ভাবনের সঙ্গে সঙ্গেই হয়। অথবা জাম্বুরা কিংবা টোপা-কুল, থোপা-থোপা ; ধইন্যাপাতা, কাঁচালংকা বা শুকনা লঙ্কার গুঁড়া দিয়া.......

হায় ! হায় !

"ইচ্ছা করে,
পরানডারে, গামছা দিয়া বান্ধি
ইচ্ছা করে.....
আইরন বাইরন কইলজাটারে,
মশলা দিয়া রান্ধি......"

"পারিজাত পারিং" একটি মনিপুরী শব্দ। মনিপুরী মেয়েরা এই হার গলায় পরে। মনিপুরের সব জায়গাতে, এদিকে নাগাল্যাণ্ড এবং ওদিকে বার্মার সীমান্ত এলাকার হাটেও কিনতে পাওয়া যায়। ওরা পেতলের পরে। ঐ ডিজাইন এপারের স্বর্ণকারদের দেখিয়ে সোনার বা রূপোরও বানিয়ে নেওয়া যায়।

পারিজাত মানে তো যতদূর জানি স্বর্গের ফুল। 'পারিং' মানে ঠিক জানি না। মনিপুরী বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে জানাবো।

www.boiRboi.blogspot.com

অন্য একটি গল্পসংকলন ছিল 'কুন্দহার'। সেই হার এখন ছিঁড়ে ফুলগুলি অন্যান্য মালায় নতুন করে গেঁথে দিয়েছি।

অনেক দিন আগে মনিপুর আর বার্মার সীমান্তের "মোরে" ও "তামু"র পটভূমিতে এবং দুই দেশের মধ্যবর্তী নদী ও তৎসংলগ্ন জমি "নো ম্যানস ল্যান্ডের" পটভূমির উপর "পারিজাত পারিং" শীর্ষক একটি ছোট গল্প লিখেছিলাম। সম্ভবত নায়কের নাম ছিল ইবোচবা সিং। কিন্তু গল্পটির কোনো কপিই আর কাছে নেই।

সম্ভবতঃ পুজো সংখ্যা "উল্টোরথ" অথবা "জলসা"তে লিখেছিলাম। বছর ২২/২৩ আগে।

আনন্দ পাবলিশার্স একটি বড় সংকলন ছেপেছেন, ছোট গল্পের ; তারই নাম দিয়েছিলাম "পারিজাত পারিং"। তুমি নিশ্চয়ই সেই প্রসঙ্গেই নামটি জিগ্যেস করছো।

মনিপুর এবং নাগাল্যান্ড আমার খুবই প্রিয় জায়গা। বার্মাতেও একাধিকবার গেছি। অবশ্য "তামু"তেই শুধু। প্যাগোডা আছে ছোট একটি। সুন্দরী বার্মিজ মেয়েরা, স্বচ্ছ ব্লাউজে, ক্যালেন্ডারের ছবির মতো।

"বাবলি" উপন্যাসটি মনিপুর এবং নাগাল্যান্ডের পটভূমিতে আরম্ভ হয়ে কলকাতা দিল্লি হয়ে আবার ফিরে গিয়ে শেষ হয়েছে মনিপুরেই। ঐ রাজ্যের লকটাক হ্রদের বাংলোতে। যে হ্রদে এখন বড় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র হচ্ছে। বা হয়েছে।

ঐ অঞ্চলে প্রথমবার যাই উনিশশো ছাপ্পান্নতে। তারপর থেকে সত্তর দশকের গোড়া অবধি বহুবারই গেছি। বেড়াতে। এবং কাজেও।

'পরিসর' নামের একটি ছোট গল্প আছে "মোরে"র পটভূমিতে লেখা। সেটি কোনো গল্প সংকলনেও গেঁথে দিয়েছি। বহুদিন আগে লেখা গল্প।

যদি "পারিজাত পারিং" গল্পটি কোনো ভেলকি করে খুঁজে দিতে পারো তো খুব খুশি হই।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল "অমৃত"র কোনো বিশেষ সংখ্যাতে আসামের 'যমদুয়ার'—এর পটভূমিতে "রোদ" বলে একটি ছোট উপন্যাস লিখেছিলাম। সেটিরও কোনো কপি নেই কাছে। যদি কোনোক্রমে খুঁজে পাও, তাহলে অবশ্যই পাঠাবে। ওটিকে বাড়িয়ে, পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস করবার ইচ্ছে ছিল। প্রায় কুড়ি বছর আগে লেখা উপন্যাসটি।

ভালো থেকো।

ইতি—লেখক

পুনশ্চ : তোমাকে কেবলই স্বার্থপরের মতো নিজের স্বার্থের কথাই বলি। না? কিন্তু তুমি যে আমার পাঠিকা! তোমার উপরে দাবী করবো না তো কার উপরে করব বলো?

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

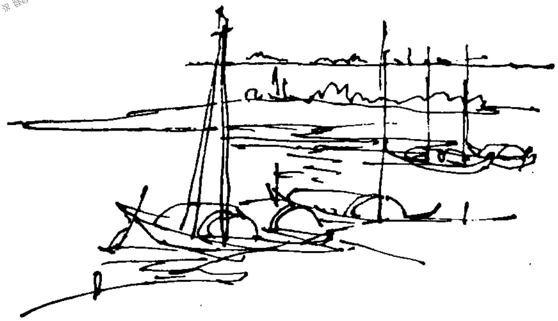

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

লেখক

চাঁটগা থেকে বরিশালে গেছিলাম।

প্লেন অবশ্য তেমন সরাসরি যদি না থাকতো এবং "AS A CROW FLIES" তেমনি করে উড়ে না যেত (অবশ্য তেমন সরাসরি ওড়ে না।) তবে চাঁটগা থেকে বরিশালে পৌঁছতে কত সময় লাগতো ? পথে জল-ডাকাতেরা সব কিছু কেড়ে নিতো কিনা ? এবং আদৌ গন্তব্যে পৌঁছতে পারতাম কি না, তাই বা কে জানে !

কিন্তু যাই বলুন আর তাই বলুন আগেকার জীবনে প্রতিটি মুহূর্তই ছিল অনিশ্চিত, প্রত্যাশা অথবা আতঙ্কে ভরা, তাই বাঁচাটাও অনেক বেশি Interesting ছিল। তাই না ?

বরিশাল শহরের জর্ডন কোয়ার্টার আগে যেখানে ছিল (আপনার "ঋভু"তে পড়েছি।) সেইখানেই ছিলাম। আপনি তো শেষ ছিলেন বরিশালে শিশুকালে, উনিশশো ছেচল্লিশে। মানে, প্রায় পঞ্চাশ বছরের একটু কম আগে। পরিবর্তন তো হবেই ! সারা পৃথিবীতে, মানুষের মানসিকতাতে, বিজ্ঞানের জগতে, আরাম-আয়েশের জগতে এতো কিছু পাল্টে গেল আর পঞ্চাশ বছর আগের শহর বদলাবে না, তাও কি হয় !

আপনিই তো লিখেছিলেন "বদলের আরেক নামই জীবন"। বদল তো ভালোই। নইলে তো মানুষ বট-পাকুড়ের মতোই স্থবির হয়ে যেতো। শিকড় বেরোত তার বগলতলি থেকে। সেটা কি মানুষের পক্ষে ভাল হতো ?

এখানে আমার এক ফুফা থাকেন। তিনি বললেন, কলকাতাতে "প্রেস শোতে" তিনি সত্যজিৎ রায়ের "আগন্তুক" দেখে এসেছেন। খুব ভালো লেগেছে ! আপনি কি দেখেছেন ? জানাবেন।

আপনার জন্যে শুঁটকি এনেছি। আপনার কোনো প্রকাশক যদি ঢাকাতে আসেন, তাঁরাতো প্রায়ই আসেন ; তাঁদের আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবেন, তাঁদের হাতে শুঁটকি পাঠিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

দেব।

যা যা চেয়েছিলেন তা তা সবই এনেছি।

ভাল থাকবেন।

ইতি—ফিরদৌসী।

পুনশ্চ :

বীটোভেন, বাখস্ মোৎজার্ট ইত্যাদিদের নাম অনেক শুনেছি। আমি পশ্চিমী-সংগীত সম্বন্ধে কিছুমাত্রই জানি না। ওঁদের ধ্রুপদী "কম্পোজার"দের সম্বন্ধেও। আপনি কি কিছু জানেন? জানলে জানাবেন?

আমাদের পাড়াতে মহম্মদ সাগিরুদ্দিন নামক একজন "আঁতেল" আছেন। তিনি বলেন যে, দিশি গান-বাজনার সঙ্গে পশ্চিমী গান-বাজনার কোনো তুলনাই চলে না। তাঁর মুখেই এই সব নাম সবচেয়ে বেশি শুনি। ভদ্রলোক বড়লোকের ছেলে। বাড়িতে কয়েক লক্ষ টাকার রেকর্ড, ক্যাসেট এবং ম্যাগনেটিক ডিস্ক এবং মিউজিক সীস্টেমস্ আছে। সাদা কলিদার পাজামা আর কালো রঙা (ছাতার কাপড়ের) পাঞ্জাবী ছাড়া কিছুই পরেন না। শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় বসন্তে "হিন্বা" ঈত্বর ব্যবহার করেন। পাগল নন, কিন্তু জিনিয়াস বলে নিজেকে প্রচার করার জন্যে পাগল-পাগল ভাব করেন।

যদি কিছু জানান, তবে একটু টক্রাতে পারি।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

তোড়া,

কল্যাণীয়াসু,

পাগল ভালো করো মা!

তেরোমাস বয়সের (যার মাতৃদেবী এবং পিতৃদেব যদি পাগল হয়তো ভাল) একটি শেয়াল বাচ্চা, যোগাড় করে, ওঁর বাঁ গালে এবং ডান নিতম্বে কামড়ে দেবার বন্দোবস্ত করো। তাইলে আঁতেলপনা দৌড়ে পাইলে যাবে। এই কতা বইলে দিনু।

যে মানুষ গানের ভক্ত, সচরাচর তিনি সব গানেরই ভক্ত হন।

শুধু ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকালের ভক্ত, দিশী ক্লাসিকালের নই এমন যাঁরা বলেন, তাঁরা হয় হস্তীমুর্খ। নয়, সাহেব-চাটা। সম্ভবতঃ তাঁদের সাহেবদের কাছ থেকে কিছু বাগাবার মৎলব আছে।

আসলে, আমরা বাঙালীরা ম্যালেরীয়াতে মরিনি, কালাজ্বরে মরিনি, কী বেনিয়ান, কী নীলকর এর বা মসলিন ব্যবসায়ী সাদা চামড়াদের অত্যাচারে বা ইংরেজ সরকারের হাতেও মরিনি।

তার অনেক আগেই আমাদের মেরে রেখে গেছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মিস্টার জোব চার্ণক।

তিনি যদি সুতানুটি-গোবিন্দপুরে নৌকোটি না ভিড়োতেন তাহলে বাঙালীরা ইংরিজি শিখতে পারত না ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে আগে। ইংরিজি-শিক্ষাই আমাদের কাল হল। আমরা মনে করলাম যে, আমাদের মত বুদ্ধিমান ভূ-ভারতে আর কেউই নেই।

আমরা যদি "ইংরিজি জানাকেই" শিক্ষা বলে ভুল না করতাম তাহলে কলকাতার তিনশ বছর পূর্তি নিয়ে এমন নির্লজ্জর মতো নৃত্য করতাম না।

ক'জন বাঙালী জানেন যে, কটক শহরের বয়স একহাজার বছর অথবা গৌহাটি শহরের বয়স দুহাজার বছরের বেশি ? অথচ আমাদের শিক্ষার গুমোরে আমরা সবসময়ে বেঁকে থাকি। আমরা যা বুঝি, আমরা যা প্রতিভাবান, আমাদের মধ্যে যত গুণী ; তেমন আর কোনো রাজ্যে কোনো দেশে নেইই এই মূর্খের স্বর্গে আমাদের নিরন্তর বাস।

www.boiRboi.blogspot.com

"ঢাকা" শহরের বয়সের কথা কি জানি আমরা ?

কলকাতার বাঙালীরা চিরদিনই পুঁটিমাছের মতো অল্পজলে ছড়ছড়-ফড়ফড় করেছেন। তুলনায়, কলকাতার চেয়ে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা অনেকই বেশি, বাংলার সব মফস্বল শহরে। পূর্ব-বাংলাতেও শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে বেশি ছিল। এখনও আছে বাংলাদেশে।

যে-কেউই ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিকের বড় সমঝদার বলে দাবী করেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশকেই দেখি বীটোভেন, বাখ, মোৎজার্ট-এ এসেই থেমে যেতে।

এটাই প্রমাণ করে যে, তাঁরা সত্যিই ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকাল মিউজিক ভালোবাসেন না বা তা সম্বন্ধে তাঁদের সম্যক ধারণাও নেই। থাকলে, বা বাসলে, আমরা তাঁদের মুখ থেকে চাইকোভস্কি এবং মেন্ডহেলসন-এর নামও একই নিঃশ্বাসে শুনতে পেতাম। আরও অগণ্য নাম।

পশ্চিমী গুণীদের জানলে পশ্চিমীদের সঙ্গে সহজে একাত্ম হওয়া যায়, সহজে তাঁদের সহানুভূতি এবং প্রশস্তি পাওয়া যায়। অন্য কথাতে বললে বলতে হয়, যে, সহজে "জাতে" ওঠা যায়। এই ভিখিরি ও আদেখলা মনোবৃত্তি নিন্দনীয়।

লুডউইগ ভ্যান বীটোভেন অবিবাহিত ছিলেন। প্রচণ্ড বদরাগী কিন্তু সৎ, আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন, অত্যন্ত স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। বন্ধু-বান্ধব তাঁর বিশেষ ছিলো না। সামাজিকতা করতেন না। করতে ভালোও বাসতেন না। নির্জন বনপথে দীর্ঘ পথ একা একা হেঁটে বেড়াতে ভাল বাসতেন। হাতে একটি নোট বই নিয়ে। তাতে নানা কথা লিখতেন।

তাঁর কাজের সময়ে কোনোরকম ইণ্টারাপশান তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। রেগে গেলে, জিনিস্ পত্র ছুঁড়ে মারতেন।

তাঁর মেজাজটি কী প্রকার সরেস ছিল তার উদাহরণ (তাঁর স্বহস্তে লেখা ডাইরী থেকে তুলে দিলাম) এইরকম ঃ

৩১শে জানুয়ারী — হাউসকীপারকে বরখাস্ত করলাম।

১৫ই ফেব্রুয়ারী — নতুন রাঁধুনী কাজে এলো।

৮ই মার্চ — তাকে ১৪ দিনের নোটিশ দেওয়া হলো।

২২শে মার্চ — নতুন হাউসকীপার কাজে এলো।

১২ই মে — মডলিংএ এসে পৌঁছলাম।

১৪ই মে — নতুন মেইউ কাজে যোগ দিলো।

২০ জুলাই — হাউসকীপার বরখাস্ত

২৮ শে জুলাই —রান্নার লোক ভাগলো।

ইত্যাদি।

তিনি সবসময়ই নিজস্ব একটি আলাদা জগতে বাস করতেন। তাঁর চারদিকে কি ঘটছে না ঘটছে তা নিয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিলো না।

দেখতে খারাপ হয়ে গেছিলেন বয়স বাড়ার পর। মোটা শরীর, পুরু ঠোঁট, ভীষণ থ্যাবড়া, মোটা নাক। প্রথম যৌবনে চেহারা সুন্দর ছিলো। বয়স বাড়াতে নাকটা কী করে থ্যাবড়া

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

হয়ে গেলো, কে জানে।

অল্পবয়স থেকেই ওঁর ভীষণরকম সন্দিগ্ধ চরিত্র ছিল। তাঁর কাছের কোনো মানুষকেই তিনি বিশ্বাস করতেন না। ফলে, ক্রমশ বন্ধুসংখ্যা কমে যেতে থাকে। কখনও কখনও তাঁকে পাগল বলেও মনে হতো। শেষে, খুব কম মানুষই তাঁর কাছের ছিলেন। গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন।

ভাগ্যিস বেশি মানুষ ছিলেন না কাছে, তাহলে আমরা যে বীটোভেনকে জানি, তাকে পেতাম না। অসাধারণ মানুষদের চরিত্রও অসাধারণ হবে, তাতে আশ্চর্য হবার তো কিছু নেই।

তোমাকে বীটোভেন আর গ্যেটের যে ঘটনার কথা বলেছিলাম তা ঘটেছিলো কার্লসবাড শহরে। ১৮১২ খৃস্টাব্দে। উনি লিখছেন "কিংগস অ্যান্ড প্রিন্সেস ক্যান মেক প্রিস্টস্ অ্যান্ড প্রিভি কাউনসিলরস্, অ্যান্ড ক্যান অ্যাওয়ার্ড টাইটেলস অ্যান্ড অর্ডারস বাট গ্রেট মেন দে ক্যানট মেক, নট দি ইনটেলেক্টস্ দ্যাট রাইজ অ্যাবাভ দ্যা মাসেস।"

"হোয়েন সাচ মেন অ্যাজ মাইসেল্ফ অ্যান্ড গ্যেটে মীট, দীজ লাইভ পার্সোনেজেস মে ওয়েল নোট হুম উই কনসিডার গ্রেট।"

শিল্পীর এই অভিমান, এই গর্বই আজকাল দেখতে পাই না গুণীজ্ঞানীদের মধ্যে। সবাই রাজা, মন্ত্রী, আমলা আর বড়লোকের পা-চাটা হয়ে গেছেন। তাই হয়তো Intellect এরও এই অবস্থা!

আমাদের শাস্ত্রীয় সংগীতে, যেমন আমরা আরোহণ অবরোহণ এর কথা জানি, ওয়েস্টার্ন মিউজিকও তেমনি ক্রিসেন্ডোস অ্যান্ড ডিনুয়েন্ডোজ আছে।

বীটোভেনের প্রধান এবং বিখ্যাত সৃষ্টিগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করলে এই ভাবে মুখ্য সৃষ্টিগুলিকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ধরো, অপেরা, ইনসিডেন্টাল মিউজিক, অর্কেস্ট্রাল, চেম্বার মিউজিক, তারমধ্যে আবার ভাগ আছে পিয়ানো, ভোক্যাল এবং সঙস।

অপেরার মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে "ফিডেলো" (অ্যাক্ট ওয়ান অ্যান্ড অ্যাক্ট টু),

ইনসিডেন্টাল মিউজিক এর মধ্যে "দ্যা ক্রিচারস্ অফ প্রোমেথ্যুস। "এগমন্ট" এবং "রুইনস অফ অ্যাথেনস্।"

অর্কেস্ট্রার মধ্যে আবার "সীম্ফনীজ" আছে। "ওভারচারস্" আছে এবং আরো অনেক কিছু আছে।

আমি যেগুলিকে বিখ্যাত বলে উল্লেখ করলাম সেগুলি বিখ্যাত হলেও অনেকের ভালো নাও লাগতে পারে। গান-বাজনার ব্যাপারে ভালোলাগা না লাগাটা একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার। এ নিয়ে জারিজুরি চলে না, চালানোটা পরম অশিক্ষা।

"চেম্বার মিউজিক" এর মধ্যে পিয়ানো এবং স্ট্রিংগস্ শুধু স্ট্রিংগস, ভায়োলিন এবং পিয়ানো, সেলো এবং পিয়ানোর মধ্যেও আবার অনেক শাখাপ্রশাখা আছে। যেমন সোনাটাজ, ভেরিয়েশনস্ এবং বাগাটেলস্।

এর পরে আছে কণ্ঠসংগীত। গান, সবই জার্মান ভাষায়; স্বাভাবিক।

বীটোভেন এর সপ্তম সীম্ফনী শেষ হয়েছিলো ১৮১২ খৃস্টাব্দেই। অষ্টমও তাই। [নম্বর

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

ফোর ইন বি ফ্ল্যাট, ওপাস্ ৬০]।

এ পর্যন্ত যাঁরা তাঁর প্রতিভাকে পুরো স্বীকৃতি দিতে চাইছিলেন না, তাঁরা 7th and 8th symphony বেরুনোর পর তাঁকে আর স্বীকৃতি না-দিয়ে পারলেন না। বীটোভেন নাকি নিজেই বলেছিলেন তখন : "আই অ্যাম আ বাখস্ প্রেসিং আউট ডিলিশাস নেকটার ফর ম্যানকাইন্ড।"

সেইসময়ে, ওয়াগনার লিখেছিলেন : "আই ডু নট নো হোয়েদার বীটোভেন ওয়ানটেড টু পোট্রে আ ডায়ানোসিয়ান ফীস্ট ইন দ্যা ফিন্যালে অফ দ্যা সীম্ফনী.....(বাট) নোহোয়্যার উইল গ্রেটার এমানসিপেসান অ্যান্ড পাওয়ার বী ফাউন্ড দ্যান ইন দ্যা সেভেন্থ সীম্ফনী। ইট ইজ আ ম্যাড একসট্রাভ্যাগান্স অফ আনবাউন্ডেভ সুপার-হিউম্যান মাইট সোললি ফর প্লেজার, হুইচ আ রিভার মাস্ট এক্সপীরিয়েন্স হোয়েন ইট বারস্টস, ইটস ব্যাঙ্কস।"

স্কুম্যান কিন্তু এই সেভেন্থ সীম্ফনী সমন্ধেই বলেছিলেন যে : "ট্যাঙ্কুইলিটি অ্যান্ড ক্লাসিকাল পিউরিটি অফ ফর্ম" অফ দিস ওয়ার্ক ওজ সো লিটল রোম্যানিণ্টক দ্যাট স্কুগ্যান অফটেন রেফারড টু ইট অ্যাজ "গ্রীক সীম্ফনী।"

একটি জিনিস লক্ষ করছো কি?

একজন গুণী একটি সংগীত সৃষ্টি করেছেন তা নিয়ে শুধু সেই ভাষাভাষী সংগীতজ্ঞ মহলেই নয়; পুরো ইয়ারোপের সংগীত জগতে এবং তাবৎ বিদ্দোৎজনদের মধ্যেই কেমন সাড়া পড়ে গেছিল! শুধু জার্মানীতেই নয়, ফ্রান্সে এবং অন্যান্য দেশেও তাইই হত।

আমার দুঃখ হয় যে, আমাদের দেশের আবদুল করিম খাঁ সাহেব, বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, ফৈয়াজ খাঁ সাহেব, কালে খাঁ সাহেব, উস্তাদ মৈজুদ্দিন, গহরজান বাইজী, মালকাজান (আগ্রাওয়ালী), মালকাজান (চুলবুল্লেওয়ালি) বড়ে গোলাম আলী খাঁ সাহেব, আমির খাঁ সাহেব, হাফিজ আলি খাঁ সাহেব, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, উস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ সাহেব, উস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেব, পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর জীবনী কেউ লেখেন না। বা লেখেন নি।

যে-পরিমাণ মনোযোগ ও "প্যায়েরভি" বীটোভেন, মোৎজার্ট, বাখস্ এঁরা পেয়েছেন সেই পরিমাণ মনোযোগ এবং কদর দিশি বুদ্ধিজীবিরা কোনোদিনও করেননি দিশি উস্তাদ আর পণ্ডিতদের।

আমাদের দিশি গুণীরা কোনো অংশেই বিদিশি গুণীদের চেয়ে কম সম্মানীয় ছিলেন না। আজকেও নন।

তৎকালীন জার্মানীর অর্থনৈতিক অবস্থার জন্যেও তার শিল্প, সাহিত্য সংগীত সারা বিশ্বে অন্য মর্য্যাদা পেয়েছিলো। আর আমরা তো চিরদিনই হয় পরের গোলামি নয় নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করেই মরলাম! আমাদের আর কী হবে! আমাদের আজ অবধি জাতীয়-চরিত্র, আত্মসম্মান, অহংবোধ কিছুই গড়ে উঠলো না বলেই হয়তো এমন হলো।

আরও একটা কথা। ভাষা।

সমস্ত ভারতবর্ষে যদি একটি ভাষা চালু থাকতো তবে দিশি শিল্পীরা দেশের মধ্যেই অনেক বেশি সম্মান পেতেন। comunication অনেক সহজ হতো। গুণী, নিজ ভাষার ও রাজ্যর সীমা পেরিয়ে অন্য ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষদের কাছেও সমান বরেণ্য হতেন।

এমনিতেই এই "Language Barrier" এরই জন্যেই Instrumental Music এর কদর Vocal Music এর চেয়ে অনেকই বেশি। এই কথাটা কখনও ভেবে দেখেছো ?

ভালো থেকো।

ইতি—লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

তোড়া,

কল্যাণীয়াসু,

তুমি যে একের পর এক কত প্রশ্নই করো!

উত্তর সব গুলিয়ে যায়।

কাল মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। কাল বোধহয় শুক্লা ত্রয়োদশী ছিল।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বর্ষার চাঁদভাসি আকাশে নিশাচর মেঘেদের নিঃশব্দ খেলা চলেছে। যেন হাজার হাজার গহনা নৌকো জ্যোৎস্নার বাণ-ডাকা আকাশে মেঘেরা গুণ টেনে নিয়ে চলেছে। চর্তুদিকের অদৃশ্য ইথারের স্তরে স্তরে কারা যেন অলীক হাততালি বাজাচ্ছে। সমানে।

কলকাতার কদর্য সব আওয়াজের পৃথিবীও নিস্তব্ধ। এখন দানব ঘুমিয়েছে। মাঝে মাঝে জে. কে. ইন্ডাস্ট্রিজের মালিকদের বাড়ির নাইট-গার্ড ফুরুৎ-ফুরুৎ শব্দ করে হুইসেল বাজাচ্ছে। আর টর্চ ফেলছে প্রকাণ্ড লনের এদিকে ওদিকে। চারদিকের ঝুপড়ি গাছ-গাছালি থেকে স্তব্ধ ছায়ারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, হাতি হয়ে, উট হয়ে ; ঘোড়া হয়ে। শঙ্খ ঘোষের কবিতার চিত্রকল্পর মতো। ঝাঁপিয়ে পড়ে, এই রাতের রহস্যময়তা বাড়িয়ে দিচ্ছে অনেকই। নাইট-গার্ডএর হুইসিল এর শব্দকে মনে হচ্ছে কোনো নাম-না-জানা পাখির ডাক।

এক জোড়া পেঁচা এই কলকাতার আকাশেও ঝগড়া করছে।

কিছু মানুষ এবং প্রাণী থাকে, যাদের ঝগড়াটাই ভালোবাসা ; এবং ভালোবাসাটাই ঝগড়া!

কোনো বিপন্ন কুকুর ডেকে উঠলো হঠাৎ। তার আর্ত চিৎকারে বাদলের রাত চমকে উঠলো। কিসের বিপন্নতা, কে জানে! এখানে তো চিতাবাঘ নেই!

এবারে দেখা গেলো তাকে, মোড়ের আলোতে। সাদা কুকুরের মুখের পোড়া রুটিখানা কালো কুকুরে কামড়ে ধরেছে। বিপন্ন তো সে হবেই। বেচারী! ও কী করে জানবে যে, এ পৃথিবীতে এখন কালোই সব। কালোদের, দু-নম্বরীদেরই জয়জয়কার ; সাদা আর সততার

www.boiRboi.blogspot.com

মার।

সামনের মালটিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্টের অগণ্য ফ্ল্যাটে এখন অন্ধকার। দু একটি ফ্ল্যাটে শুধু আলো জ্বলছে। পরীক্ষার্থী অথবা অসুস্থ মানুষের ঘরে। ভারী একটা পরিবর্তন এখন। অথচ রাত এগারোটা অবধি প্রতি ফ্ল্যাটে-ফ্ল্যাটেই আলো জ্বলে। টিভির আলো দেখা যায়, অন্যগ্রহের রোবোটের চোখের নীলচে আলোর মতো ; অপার্থিব। টি. ভি. স্ক্রিনের আলোর সঙ্গে পৃথিবীর অন্য কোনো স্বাভাবিক আলোই তুলনীয় নয়। মানুষ নিজেকে অতিক্রম করতে গিয়ে বিজ্ঞানের হাতে হাত রেখে যে সব বিপ্রতীপ বাতুলতা করেছে এ পর্যন্ত ; এও তারই একটি। সময়ই বলবে, ঠিক করেছে ; না ভুল।

প্রতি সন্ধেতে আলোজ্বলা বহুতল বাড়িটির দিকে চেয়ে ভারী মজা পাই আমি। কতো মানুষ যে পুতুল খেলছে প্রতি ঘরে ঘরে। কত ডিগ্রীওয়ালা, টাকাওয়ালা, অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার ; সাংবাদিক ! অর্থগর্বে গর্বিত, রূপগর্বে গর্বিত কত রামছাগল ! বউ-বউ, বর-বর, বাবা-ছেলে, মা-মেয়ে, নাতি-নাতনি, খেলা। নেকু-পুষু-মুনু ! কেউ একবারও ভাবেওনা যে তারা আর শিশু নেই ; বড় হয়ে গেছে। বুড়ো হয়ে গেছে। আজ বাদে কাল পরিণত বয়সে পৌঁছেই চলে যাবে পরপারে। অথচ এখন পর্যন্ত, মানুষ হয়ে কেন যে জন্মেছিলো, পৃথিবীর সবচেয়ে দামী পুতুলের সঙ্গে মানুষ হিসেবে অতি সাধারণ নগণ্য হলেও তার যে তফাৎ ছিলো অনেকই এবং আছেও ; এ কথাটা ভেবে দেখার সময়ই পেলো না নিরানব্বুই ভাগ মনুষ্যাকৃতি জীবেরা ! অনুকম্পা হয়। করুণাও হয়।

ওড়িশার "দশপাল্লা" একটি করদ রাজ্য ছিল আগে। দশপাল্লা শব্দটা যশপাল্লার অপভ্রংশ। আজ থেকে প্রায় দুশো পঁচিশবছর বা আড়াইশ বছর আগে রাজা সাজ ভঞ্জ ওই রাজ্যের পত্তন করেন।

লোকে বলত, সেই সাজভঞ্জের নানারকম পারিবারিক অশান্তি ও ঝগড়া ছিল ; এবং সেই কারণেই বিক্ষিপ্ত-চিত্ত অবস্থাতে তিনি একবার পুরী যান জগন্নাথ দর্শনে। তখনকার দিনে অতখানি রাস্তা তীর্থ করতে যাওয়া সহজ ছিল না।

ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে তিনি যখন ফিরে আসছেন যশপাল্লায়, তখন তাঁকে দেখে আরেক করদ রাজ্য নুয়াগড়এর রাজার মায়া হলো। সাজভঞ্জকে তিনি বড়মুলে আশ্রয় দিয়ে মাইল দশেক জায়গাও তাকে দান করলেন। নুয়াগড়ের রাজার দেখাদেখি সংলগ্ন আরেকটি করদ রাজ্য খন্দ্পাড়ার রাজাও সাজভঞ্জকে দশমাইল জায়গা দেন।

সেই কুড়ি মাইল মতো জমি নিয়ে সাজভঞ্জ দশপাল্লা রাজ্যর পত্তন করেন।

"পারিধী" শব্দটি ওড়িশার 'খন্দ' উপজাতীয় শব্দ। মানে হলো, মৃগয়া। অনেক পাঠক-পাঠিকা এই তথ্য না জানাতে জিজ্ঞাসা করেন, পরিধীর বানান কি ভুল ছাপা হয়েছে ?

খন্দরা ওড়িশার এক বিশিষ্ট উপজাতি। তাঁদের বাস খুব উঁচু পাহাড়ের উপরে। তাঁদের বিশ্বাস যে, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা মেঘের ভেলা করে এসে সেই উঁচু পাহাড়ে অবতরণ করেন। খন্দরা ওড়িশার যে অঞ্চলে বাস করেন সেই পাহাড়ী এলাকাকে বলে "খন্দ্মাল"।

দশপাল্লার কাছেই একটি ছোট্ট গ্রাম। তার নাম টাকরা। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি পাহাড়ী নদী, নাম বুতরং। জল রঙএ আঁকা ইন্দ্র দুগারের ছবির মতো। আর সেই বুতরং

www.boiRboi.blogspot.com

নালার দিকে বহু উঁচু থেকে চেয়ে আছে সুনীল দাসএর আঁকা ঘোড়ার মতো, মনস্কতায় দুরন্তগতি ; এক স্থবির পাহাড়। বিরিগড়। যে পাহাড়ে, প্রদ্যুম্ন টানার আঁকা মেয়েদেরই মতো শুধু শাড়ি-পরা অনাবৃত বুকের সুন্দরী প্রাণোচ্ছল খন্দ মেয়েদের বাস।

"তব উঁচ কুঁচ ছুঁয়ি, নিয়ম করিলুঁ মুঁয়ি, প্রাণনাথ হে!"

যে নীল পাহাড়ে, কোনো দায়িত্বজ্ঞানহীন অজ্ঞাত শিকারীর রাইফেলের গুলিতে নিহত মৃত পুরুষ নীলগাই এর উপরে হাজার হাজার নীল মাছি বসে মোনোএঞ্জিন "বনাঞ্জা" প্লেনের মতো বুঁবুঁবুঁই শব্দ করে, যে ভয়াবহ বনের পথে গা ছমছমে চাঁদভাসি রাতে ব্যর্থপ্রেমিক পাগল বলরাম, একা, একা উঁচুনীচু পথ হাঁটে, তার প্রেমিকা ; যাকে সে পায়নি, পাবে না কোনোদিনও ; সেই চন্দনীর উদ্দেশ্যে গান গায় ঃ "ওরে মোর সজনী, ছাড়িগলা গুণমনি, কা কর ধরিবি ?" আর পথ চলে।

প্রেমেই যে অন্ধ, সে পথ দেখতে পেলো আর নাই পেলো তাতে কীই বা এসে যায়!

সেই হতভাগ্য, ব্যর্থ অসহায় বলরামকেই দলছুট হাতি পায়ে মাড়িয়ে মারে। দোষ হয় দলছুট হাতির। কিন্তু পুরুষ হাতি যে কেন দলছুট হয় ? কোন অভিশাপে বা অভিমানে যূথভ্রষ্ট হয়ে বলরামেরই মতো হৃতগৌরব, হৃতআশা, একা একা নিরুচ্চার অভিমানে রৌরব-সম-বনময় কী কথা কইতে কইতে বাক্যহীন ঘুরে বেড়ায়, তার খোঁজ কে রাখে!

এই সেই বিরিগড়, 'পারিধীর' পটভূমি, যেখানে একসময়ে খন্দদের মধ্যে মেরিয়া প্রথা চালু ছিল। জ্যান্ত মানুষের মাংস খাবলে খাবলে তুলে নেওয়া হত।

সে সব অনেকদিন আগের কথা।

আজ সেখানে বড় বড় সাদা পাথর থেকে মুতুরী আর গুড়চি লতা ঝুলে থাকে। মুতুরীর পান-পান পাতার মধ্যে ফিকে হলুদ ফুল আর গুড়চির ফিকে সাদা ফুলে ঐ সাদা পাথরের স্তূপকে মন্দিরের মতো পবিত্র দেখায়। যেখানে বড় বড় বাদামী কাঠবিড়ালী (হিমালয়ান স্কুইর্যেল) একে অন্যকে ধাওয়া করে লম্বা লম্বা কালো ও খয়েরিতে মেশা কম্পমান লেজ তুলে বনময় ছুটোছুটি করে বেড়ায়, বনের বুকে ঝরেপড়া শুকনো শাল ও অন্যান্য গাছের বহুবর্ণ পাতা আর ফুলের গালিচাতে হিল্লোল তুলে ওদের বাদামী শরীরে ; কুন্তাটুয়া পাখিরই মতো মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়তে থাকে। এই মাটি ছেড়ে উঁচু গাছের মগডালে চলে যায় আবার মগডাল বেয়ে পাতায় পাতায় ঝরঝরানো ঝাঁকুনি তুলে পরমুহূর্তে মাটির ফুল পাতার লাল হলুদ বেগুনি গালিচাতে নেমে আসে। চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে খেলে ওরা সবুজ বনে বাদামী আর খয়েরী আর কালোর ঝিলিক তুলে।

এখানের খন্দরা এই কাঠবিড়ালিদের বলে, নেপালি মুসা। বা নেপালি ইঁদুর। লম্বা হয় প্রায় দু ফিট থেকে তিন ফিট। এরা ঝাঁপাঝাঁপি করে এমন যে, মনে হয় বুঝি উড়ছে। কিন্তু উড়ন্ত কাঠবিড়ালি নয় ওরা।

উড়ন্ত কাঠবিড়ালি দেখেছি আফ্রিকার সেরেঙ্গেটি প্লেইনস্ এ। সেরোনারা লজ এর কাছে। "পঞ্চম প্রবাস" বইয়েতে সে সব কথা আছে।

মাঝে মাঝে ভাবি যে, শিকার না করলে তো কোনোদিনও এমন এমন জায়গাতে গিয়ে উপস্থিত হওয়া হতো না জীবনে! প্রকৃতির বুকের "কোরক" কাকে বলে, তা জানা হতো

www.boiRboi.blogspot.com

না। আমার এই বিরাট স্বরাট দেশকে জানা হতো না। ভালোবাসা হতো না স্বদেশের মানুষদের এমন করে।

"জঙ্গলের জার্ণাল"এ আমি লিখেছিলাম বহুবছর আগে যে, আমার অন্যতম গুরু বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃতি প্রীতির সঙ্গে আমার নিজের প্রকৃতি প্রীতির রকমের তফাৎটা কোথায় ! উনি প্রকৃতিকে রোম্যান্টিক ভালবাসা বেসেছেন আর আমি প্রকৃতির সঙ্গে সহবাস করে, তাকে রমণ করে তাকে জেনেছি। I have seen her inside out.

টাকরা থেকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়েচলা পথের মতো পথ বেয়ে গিয়ে মহানদীর তীরের বড়মূলের পথের যা সৌন্দর্য তা বর্ণনা করি এমন ভাষা আমার নেই। মকড়প্রসাদ থেকে বড়সিলিঙা। বড়সিলিঙা থেকে বড়মূল। মনে হয় সারাজীবন ওখানেই থেকে যাই। সঙ্গে একজন আদিবাসী সঙ্গিনী, তন্বী, সুডৌল বুকের ; সামান্য চাহিদার। মাটির হাঁড়িতে রাঁধব বাড়ব, শালপাতার দোনায় খাব দাব, দোনায় মধু, ধবলি গাইয়ের দুধ। শুধুমাত্র একটি সন্তান উৎপাদন করব প্রকৃতি ছেনে, সঙ্গিনীর শরীর ছেনে। আর কী চাই ? প্রকৃতির মধ্যেই সব শিক্ষা, সব দর্শন, সব সংগীত ; সব সুধা। আর কি চাই ?

এখনও মাঝে মাঝে পারিধীর পটভূমির কথা মনে হয়। প্রায় সাতাশ আঠাশ বছর আগে গেছিলাম। জানি না আর যাওয়া হবে কি না। যেদিন পাহাড় থেকে নেমে আসি সন্ধের মুখে মুখে বসন্ত শেষের দিনে বুরুসাই এর আগে একদল বাইসনের মধ্যে পড়েছিলাম। সে বাইসন অভয়ারণ্যর বাইসন নয়। অভয়ারণ্যের কোনো প্রাণীই, যেমন প্রাণবন্ত প্রাণীদের আমরা সেই সব ভয়ের দিনে, বাধাবন্ধহীনতার দিনে দেখেছি তেমন মনে হয় না। কেন যে হয় না তা বন-বিশারদরাই বলতে পারবেন। আমি কীই বা জানি বলো ! শুধুমাত্র ভালোবাসতে শিখেছিলাম। শুধু সেই শিক্ষা দিয়ে তো সব জানা যায় না ! ভালোবাসা, পৃথিবীর সব জ্ঞানের বিকল্প তো নয় ! যদিও হলে ভালো হতো।

সন্ধ্যাতারাটা জ্বলজ্বল করছিলো পাহাড়ের উপরে। অন্যান্য তারারা ফুটছিল একে একে। জীপের স্টিয়ারিংএ বসে ওয়াটার-বট্ল খুলে জল খেতে খেতে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকিয়ে বিরিগড় এর পাহাড়ের দিকে চেয়েছিলাম। সেই ছবিটি আজও কোনো কোনো দিন হঠাৎ ভেসে ওঠে মনের চোখে বন্ধ এয়ারকন্ডিশাণ্ড ঘরের মধ্যে বসে ; জনাকীর্ণ এয়ারপোর্টের প্লেনের জন্যে অপেক্ষারত অবস্থায়।

চন্দ্রকান্ত, চন্দনী, সৌমেনবাবু, বলরাম সকলকেই আমি চিরদিনের মতোই হারিয়ে ফেলেছি। সময়ের আগে আগে দৌড়ে গিয়ে, সময়ের জন্যে বনপথে ওৎ পেতে বসে থেকে তাকে Ambush করে সাবড়ে দেওয়ার সামর্থ্য আজ আর আমার নেই। সময়ের পাথরে একেবারে চাপা পড়ে গেছি। আমার স্বপ্নের জীবনটা আমার হাত থেকে একটি হলুদ-বসন্ত পাখির ডিমেরই মতো পড়ে গিয়ে, পথের উপরে ভেঙ্গে গেছে। আমি তাকে আমার জুতোয় মাড়িয়ে হেঁটে চলেছি প্রতিমুহূর্ত।

আমার মতো অভাগা আর দুটি নেই !

চন্দনীরা আর আমার নেই। কিন্তু তারা যে তোমাদের হয়ে গেছে, হয়ে রয়েছে চিরদিনের মতো "পারিধী" উপন্যাসের মাধ্যমে, এই আমার মস্ত বড় জিৎ। আমার 'হারানো', তোমাদের

www.boiboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com
'পাওয়া'তে ধন্য হয়েছে ; সার্থক হয়েছে।

'পারিধী' আর "লবঙ্গীর জঙ্গলে" একই উপন্যাসের দু খণ্ড। মহানদীর একপারে 'পারিধী'র পটভূমি আর 'লবঙ্গীর জঙ্গলে'র পটভূমি মহানদীর অন্য পারে।

ওড়িশার বনজঙ্গলের পটভূমিতে লেখা যখন কখনও পড়ি অবসরের মুহূর্তে তখন চলে যাই সেইসব জায়গাতে, যে-সব জায়গাতে এ জীবনে হয়তো আর যাওয়াই হয়ে উঠবে না।

না-যাওয়াই হয়তো ভাল।

কারণ, তারা আমার স্মৃতিতে যেমন ভাবে আঁকা আছে, থাকবে চিরটাকাল ; আজ সেসব জায়গাতে গেলে তো আর তাদের তেমনটা দেখতে পাবো না। মানুষের সর্বগ্রাসী লোভ আর খিদের হাত দেখবো তাদের 'মেরিয়া' রই মতো, জীবন্ত খুবলে খুবলে নিয়েছে।

না-যাওয়াই ভাল।

"নগ্ন-নির্জন", "জঙ্গলের জার্নাল", "পারিধী", "লবঙ্গীর জঙ্গলে", "হাজারদুয়ারী", "ঋজুদার সঙ্গে লবঙ্গীবনে", এবং অগণ্য ছোট গল্প লিখেছি আমি ওড়িশার পটভূমিতে। "বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারের" দ্বিতীয় পর্ব লিখব, শুধু ওড়িশা নিয়েই।

তবে কবে যে লিখে উঠতে পারব জানি না।

এবারে শেষ করি।

দোহাই তোমার, পরের চিঠিতে আবারও প্রশ্নবাণ ছুঁড়ো না।

ভালো থেকো।

ইতি—লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

তোড়া
কল্যাণীয়াসু,

তোমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজে দুজন মহিলা ডাক্তার আছেন না? একজন ডঃ তসলিমা নাসরীন সাংবাদিক, কবি। এবং চিত্রকরও। আর অন্যজন ডঃ নাজনীন।

হয়তো আরও আছেন কিন্তু আমি এঁদের দুজনকেই চিনি। ডঃ নাজনীনও সুন্দর চিঠি লেখেন এবং অনেকদিন আগে থেকে পাঠিকা হিসেবে ওঁর সঙ্গে জানা। চিঠিরই মাধ্যমে।

মস্ত অপরাধ হলো এই যে, ঢাকাতে গেলাম অথচ ওঁর সঙ্গে দেখা করলাম না। আর যখন গেছিলাম, তখন তসলিমা নাসরিনকে খুঁজেই পেলাম না। আরও চেষ্টা করলে হয়তো হতো কিন্তু করবো কখন বলো? ঐ তো পাঁচটি দিন মাত্র থাকলাম। আর সে ক'টি দিনইতো "দাওয়াতে" "দাওয়াতে" ছয়লাপ। যেখানে দস্তরখান বিছানো আছে সে জায়গা ছেড়ে উঠতেই পারলাম না। খাদিম খাদিমারা দস্তরখানের উপর সাজানো চাঁদির বর্তন এক বাসা থেকে সরিয়ে তা খালি করতে না করতে অন্য বাসাতে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়েছে।

খেয়ে খেয়ে প্রাণ বিপন্ন।

ডঃ নাজনীন এর উপরে অবশ্য একটু অভিমানও হয়েছে এই ভেবে যে, উনিওতো দেখা করতে আসতে পারতেন!

তসলিমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো আগেই কলকাতাতে। ওঁর ব্যক্তিত্ব আমাকে চমকে দিয়েছে। ঐ বয়সী মেয়ের এমন ব্যক্তিত্ব বড় একটা দেখা যায় না। তার পরে যখন আবার কলকাতাতে এলো, তখন আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো একটি ঘরোয়া নেমন্তন্নে। আলাপ হয়ে, রূপে ও গুণে একেবারে অভিভূত হলাম।

পৃথিবীর সব দেশের সেনাবাহিনীকে একটা শিক্ষা দেওয়া হয়। সেটা হচ্ছে "Physical courage is the least form of courage." দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যে সব বৃদ্ধা বা শিশু বা মহিলা আন্ডারগ্রাউণ্ড ওয়ার্কার হিসেবে Enemy line এর পেছনে, occupied territory তে

www.boiRboi.blogspot.com

কাজ করেছেন তাদের সাহস সৈন্যদের সাহসের চেয়ে অনেকই বেশি।

মনের সাহসই হলো আসল সাহস। মেডিয়াকে, অথরিটিকে, মনোপলিকে, মেগালোম্যানিয়াকে ভ্রূক্ষেপ না—করার সাহস দিয়েই চিরদিন মানুষের পরিচয় নির্দ্ধারিত হয়েছে।

তসলিমা যথার্থই মানুষের মতো মানুষ!

ডঃ নাজনীন এর নামটা ধার নিয়ে একটি গল্প লিখেছিলাম "দেশ" এ। "দেশ"এ তার পরে আর লিখিনি। গল্পটির নাম দিয়েছিলাম "অভিলাষ"। বাধ্য হয়েই, গতপুজোর আগে বেরুনো একটি উপন্যাসের নামেই। হাজারীবাগের পটভূমিতে "নাজনীন" নামের একটি মুসলমান মেয়ের সঙ্গে একটি হিন্দু ছেলের প্রেমের গল্প সেটি। আরও অনেক কিছুর গল্প। প্রেমেরও যে অপ্রাপ্তবয়স্কতা বা প্রাপ্তবয়স্কতা থাকে, তারই গল্প।

হাজারীবাগ আমার অন্যতম প্রিয় জায়গা। পৃথিবীর প্রায় সব প্রান্ত ঘুরেও কিছু কিছু দিশি জায়গাকে কখনও ভোলা যায় না। আমাদের শিকারের দোস্ত মহম্মদ নাজিম, হাজারীবাগী ; ইংরিজি তেমন জানতেনই না। কিন্তু উর্দুতে অসাধারণ দখল ছিল। ফারসীও জানতেন। মুখে মুখে শের উড়াতেন বুলবুল-এর মতন। আর বয়াৎ আওড়াতেন। আর কী দিলচস্‌পি ছিল সে সব শের আর বয়াৎএ। উনি বলতেন ঃ "হাজারীবাগ ওয়ার্লডমে সবসে বেহেতরীন জাগে হ্যায়—" তারপরই তাঁর নিজস্ব ইংরিজি সর্বদা প্রয়োগ করতেন ঃ "বীটিফুল"।

ওঁকে খুশি করার জন্যে আমি সুইটজারল্যাণ্ড থেকে তিনবার পিকচার পোষ্টকার্ড পাঠিয়েছি এই কথা লিখে যে, "হাজারীবাগ ওয়ার্লডমে সবসে বেহেতরীন জাঁগে হ্যায়। ইয়ে বাত হরগিজ সাচ হ্যায়। ইয়ে খাত আপকি ভেজ রহা হুঁ, স্রিফ এহি বতানে কি লিয়ে।"

খুব খুশি হতেন নাজিম সাহেব।

এখন হয়তো তিনি বেহেস্ত এ পৌঁছে গোপাল সেনের সঙ্গে খয়েরি তিতির—বটের, কালি তিতির, মোর-মোরগা মেরে বেড়াচ্ছেন, কেলাউন্দা, করৌঞ্জ আর পুটুসের ঝাড়ে ঝাড়ে ; উমদা বটি কাবাব বানাবেন বলে। "হ্যাপি হান্টিং গ্রাউণ্ডস"এ চলে গেছেন ওঁরা দুজন আরও অগণ্য বন্ধুদের সঙ্গে। এমন এক জায়গাতে গেছেন, যেখানে স্বর্গ আর বেহেস্তএ তফাৎ নেই, হিন্দু আর মুসলমানে তফাৎ নেই, শিয়া আর সুন্নীতে তফাৎ নেই, বামুন আর কৈবর্ততে তফাৎ নেই, যেখানে মানুষ তার নিজের মহিমাতেই স্বীকৃত ; আদৃত।

মানুষকে খুশি দেখতে আমার কী যে ভাল লাগে, কী বলব তোড়া! আমার মা বলতেন, দুদিনের জীবন! চলার পথের দুধারে মানুষকে খুশি করতে করতে যাবি। চলেতো সকলেই, গন্তব্যতেও পৌঁছয় অনেকেই কিন্তু এটাও দরকার। মিষ্টি কথা, মুখের হাসি। এতে তো পয়সাও লাগে না, বেশি বিদ্যা-পাণ্ডিত্যেও লাগে না। তবে করবি নাইই বা কেন!

মায়ের কথাও মনে হয়। এখন হয়তো মন্দাকিনী নদীর পাশের ঘাসে বসে একটি চওড়া জরিরপাড়ের টাঙ্গাইল শাড়ি পরে বসে, মুখে জর্দা দেওয়া পান নিয়ে সন্ধে নামা দেখছেন। যে দৃশ্য, আমরা প্রত্যেকে রোজ দেখেও চোখ নেই বলে দেখিনা। "How evening Comes"!

ধান ভানতে শিবের গীতএ চলে এলাম। হচ্ছিল ডঃ নাজনীন এর কথা।

গল্প লেখার আগে ডঃ নাজনীনকে বলেছিলাম যে, আপনার নামটি ব্যবহার করব গল্পের

নায়িকা হিসেবে। গল্পটি লিখে ফেলে খুব ভালো লেগেছিলো। এর আগে শুধু আমরাই নয়, অন্য কারো ছোটগল্পেই হাজারীবাগ ঠিক এতোখানি ব্যাপ্তির সঙ্গে বিধৃত হয়েছিলো কি না তা জানা নেই। হয়তো হাজারীবাগের ব্রাহ্ম সমাজ কম্পাউণ্ডের, লেখক, প্রবন্ধকার এবং নিয়মিত পাঠক শ্রী অমল কুমার সেনগুপ্ত বলতে পারবেন। হয়নি বলেই, খুব আনন্দ হয়েছিলো।

গল্পটির নাম দিয়েছিলাম "খ্বোয়াইশ" বা "খ্বায়িশ"। এই শব্দটি গল্পের মধ্যেও একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু যখন দেশ-এর পরম শ্রদ্ধাস্পদ জ্যোতিষদা পুল দেখতে দিলেন, দেখি "গালির" পর "গালি" "খাবাইশ"-এর কুচকাওয়াজ। সে এক রৌরব ! কিছুই বুঝতে না পেরে S. O. S. করলাম। "জ্যোতিষদা কী ব্যাপার। এই খাব, খাব, খাব ; "খাবাইশটা" কি ? এ যে কুমীরের মতো সবই খেয়ে ফেলল ?"

জ্যোতিষদা ফোন করলেন। একটু থেমে থেমে কথা বলেন জ্যোতিষদা। সেটা নস্যি নেওয়ার জন্যেও হতে পারে। ওঁর নস্যি নেওয়ার পার্টনার পঙ্কজদাই চলে গেলেন।

বললেন, ব্যাপারটা হচ্ছে, এই যে ; আমাদের "খ্ব" টাইপটা নেই। মানে, আসছে ; এখন নেই। তাই খাবাইশ।

বললাম, কী কেলো ! খাবাইশ যে সব হাপিস করে দিলো জ্যোতিষদা। দাঁড়ান, গল্পর মধ্যের খ্বাইশ তো বটেই আমি গল্পের নামও বদলে দিচ্ছি। সেই কারণেই গল্পের নাম হলো "অভিলাষ" এবং গল্পের ভেতরের সব "খাবাইশ" কেটে অন্য যথাযোগ্য বাংলা প্রতিশব্দ বসাতে হলো। 'দেশ'এর পাঠিকা তুমি। অগণ্য পাঠকও আছেন। দেশ'র লেখকদেরও তোমরা চেনো কিন্তু 'দেশ' যাঁদের জন্য 'দেশ' সেই সাগরদা, পঙ্কজদা, জ্যোতিষদা, সুনীল বসু, স্বপ্না, হর্ষ, তানাজী এবং রাধাদা তাঁদেরও চেনা দরকার ছিলো। দরকার ছিলো সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে চেনা। সঞ্জীব,সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিশ্রম করে এই সাপ্তাহিকের জন্যে। ভালো লেখকতো বটেই, সুদক্ষ সহকারীও সাগরদার। সঞ্জীব ভালো গাইয়েও। আমার মতো চানঘরের গাইয়ে নয়। রীতিমত ওস্তাদ গাইয়ে। বহু ধরনের গান জানে এবং নিজেই হারমনিয়াম বাজিয়ে গায়।

গল্পটি যখন বেরুলো তখন অন্য যে-কোনো পাঠিকা হলে Elated feel করতেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু ডঃ নাজনীন-এর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই লক্ষ করলাম না।

আমি ওঁকে লিখলাম যে, "নাজনীন"কে নায়িকা করে যে গল্প, সে গল্প বেরিয়েছে। তার উত্তরে দীর্ঘদিন পরে তিনি একটা চিঠি লিখলেন যে, অনেক খুঁজে পেতে পুরোনো "দেশ" বের করে গল্পটি পড়েছেন। এবং ভালোই লেগেছে।

অতএব এটা সব লেখকের সবসময়েই মনে রাখা দরকার যে পাঠক-পাঠিকা মাত্রই কারো লেখা পড়ে সবসময়েই গলে যাবেন এমন মনে করাটা মূর্খামি। আর এরকম মূর্খামি করবো না। ডঃ নাজনীনকে বহুদিন চিঠি লিখিনি। পাইওনি। এবারে লিখতে হবে।

একটা সম্পর্ক স্থাপিত হতে লাগে বহুদিন। ভেঙ্গে ফেলতে লাগে কয়েকমুহূর্ত। প্রতিটি সম্পর্কই গাছেরই মতো।

অথচ এটা আমরা বুঝি ক'জন ?

তসলিমার কবিতা যতই পড়ছি ততই বিস্মিত হচ্ছি। নিশ্চিত হচ্ছি যে, জয় গোস্বামী

যেমন এ পারের তরুণদের মধ্যে এক প্রধান নক্ষত্র ওপারের বাংলাতেও তসলিমা তাই। অবশ্য প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে নির্মলেন্দু গুণএর কবিতা আমার খুব ভাল লাগে। ওঁর পঠনভঙ্গীও সুন্দর। একবার শুনেছিলাম শিশির মঞ্চে। আরও অনেকের কবিতাই ভালো লাগে। সেই আলোচনার পরিসর এখানে নেই।

তসলিমার জ্বালাময়ী এবং যুগোপযোগী সাংবাদিকতার জ্বলন একদিন কমে যাবে। কারণ, ওদের যুদ্ধে ওরা শীগগিরী জয়ী হবে। নারীরা, জীবনের সবক্ষেত্রেই পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার পাবেনই। বেশি দেরী নেই আর। এই কথা, এই "অশিক্ষিত" "বাংলা-না-জানা" "প্রবন্ধর মতো উপন্যাস লেখা" ঔপন্যাসিক "মেয়েদের লেখক" এর আজকের ভবিষ্যদ্বাণী। এই স্বাধীনতা আজ থেকে পঁচিশবছরের মধ্যে পুরোপুরি কায়েম হবে। হবে যে ; শুধু তাই নয়, সমাজের সর্বস্তরে মেয়েরাই নেতৃত্ব দেবে মানবজাতির। সব দেশে।

এই ডামাডোল, রণসাজ ছেড়ে যখন ক্লান্ত, প্রাজ্ঞ তসলিমা বসবে আয়নার সামনে, তখন দেখবে কানের পাশে দুই জুলপিতেই চুল একটু সাদা-সাদা হয়েছে। একটি হালকা বেগুনী-রঙা জংলা কাজের ঢাকাই পরে, কানে ছোট্ট দুটি রুবীর দুল, ছোট হাতা, কোরা-রঙা ব্লাউজ পরে তসলিমা নিজের দিকে তাকিয়ে জানবে ; তার সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি।

সেদিন আমি থাকবো না এই সুন্দর পৃথিবীতে। কিন্তু তসলিমা অবশ্যই থাকবে।

এই সংগ্রামের ধুলো চিৎকার হানাহানির মধ্যে দিয়েই ও এক শাশ্বত আসন পেয়েছে মা সরস্বতীর পদতলে, যে-আসন কেউ টলাতে পারবে না।

তুমি জয়ী হয়ো তসলিমা।

কিছুদিন আগেই জয় "অববাহিকা" উপন্যাসটি চেয়েছিলো ; তা দেবার সময়ে লিখে দিয়েছিলাম, "জয়, জয়ী হয়ো।"

তসলিমাকেও বলছি, সেই কথাই।

তোমাদের দুজনের কবিতাই শুধুমাত্র তোমাদেরই মতো। তোমাদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, একজন পূর্বসূরীরও প্রভাব নেই তোমাদের উপরে।

তোমরা স্বয়ম্ভু, স্বরাট, সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী।

ঈশ্বর এবং খুদাতাল্লা, পরবরদিগার, তোমাদের মঙ্গল করুন। দোয়া দিন।

খুদাহ হাফিজ।

ইতি—লেখক

পুনশ্চ : আমার ধৃষ্টতা মাপ করো।

অ্যাকাউন্ট্যান্ট কবিতার কী বোঝে ?

মাঝে মাঝে বড় এক্তিয়ার-বহির্ভূত কথাবার্তা বলে ফেলি। আমি ইংরিজি অথবা বাংলার বি. এ অথবা এম. এও নই যে, কবিতা বুঝব ?

দুঃখিত। তোড়া।

ক্ষমা কোরো।

লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

"লেখক",

আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে আপনি ওয়েষ্টার্ন ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের ভক্ত কিনা ? আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে। তবে কতটুকুই বা শুনেছি! জানালেন না।

বীটোভেনের কথা আরও লিখবেন। আসলে, আমার সমস্ত সফল মানুষের জীবন কেমন ছিল তাই জানতে ইচ্ছে করে। আমার মনে হয়, তাঁদের প্রত্যেকের জীবন থেকেই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের শেখবার অনেক কিছুই আছে, থাকে, যা আমরা একটু চেষ্টা করলেই শিখতে পারি।

আপনাকে বললেই তো আপনি হাসবেন। আপনার স্বভাবসিদ্ধ হাসি। কিন্তু এ কথা তো সত্যি যে, আপনি আমার তুলনাতে বড়। এবং সফল। আপনার সম্বন্ধে একটা কথা ভেবে আমার খুবই অবাক লাগে। সেটা হচ্ছে, আপনি এতো কিছু একসঙ্গে করেন কি করে ? ইংরিজিতে যে কথাটা আছে "Jack of all trades, Master of none" সেটাতো আপনার বেলাতে প্রযোজ্য নয়।

কিন্তু এর রহস্যটা কি ?

দশঘণ্টা অফিসের কাজ করে, মাসের মধ্যে দশ বারোদিন (কম করে) দিল্লি-বম্বেতে থেকে আপনি লেখেনই বা কখন ? গানই বা গান কখন ? ছবিই বা কখন আঁকেন ? তাছাড়া চিঠি ? আমার মতো অগণ্য পাঠক-পাঠিকার চিঠির উত্তর দেবার সময় কেমন করে পান আপনি ?

আমি যে কী ভাগ্য করেছিলাম জানি না। নইলে, আপনার এতো চিঠি পাই ? কিন্তু আমার মতো প্রায় নিষ্কর্মা মানুষওতো আপনার চিঠির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারি না। আমার তো শুধুমাত্র আপনিই আছেন, আপনাকেই চিঠি লিখি। আপনার তো আমার মতো অগণ্য মানুষকে লিখতে হয়। পারেন কি করে ? রহস্যটা উন্মোচন করবেন কি দয়া করে ? করলে, আমারই মতো যারা নিজেদের নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, নিজেদের সর্বদাই

www.boiRboi.blogspot.com

সচেতনভাবে উন্নত করতে সচেষ্ট থাকে ; তাদের উপকার হয়।

দয়া করে যদি একটু বলেন তাহলে খুব কৃতজ্ঞ থাকি।

ইতি—ফিরদৌসী

পুনশ্চঃ ১ আজিজ অ্যান্ড কোম্পানীর হাবিব ভাই, হবিবুর রহমান আপনার খুব ভক্ত। তিনি তো কলকাতায় আপনার সঙ্গে দু বছর আগে দেখাও করেছিলেন বিখ্যাত হাতি শিকারী চঞ্চল সরকারের সঙ্গে গিয়ে। তাই না ?

ইলিশমাছ উঠলেই হাবিব ভাই আপনার জন্য মাছ পাঠাবেন। সঙ্গে আমি একটা জিনিস পাঠাব। অনেকদিন ধরে আপনার জন্যে রেখে দিয়েছি। জিনিসটা কী তা এখন বলব না। Pleasant surprise হিসেবেই পৌঁছোব আপনার কাছে।

পুনশ্চঃ ২ আমি জানি যে নিরানব্বুই ভাগ সফল মানুষের জীবনই দুঃখময়। (এই সাফল্য উকিল ব্যরিস্টার ডাক্তার ব্যবসাদারের সাফল্য নয়, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সুখী) তবু, জানতে খুব ইচ্ছে করে। আমার জানাটা সত্যি কি না ?

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

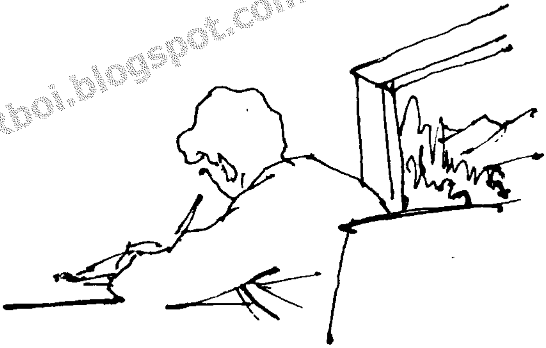

ফিরদৌসী আখতার
ধানমন্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

তবাসুম, কল্যাণীয়াসু,

তুমি আমার সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছো তার উত্তরে বলি যে, অতসব ভারী ভারী বিশেষণে লজ্জিতই হই শুধু। আমি কেউই নই, কিছুই নই ; কিছুমাত্রই এখনও অর্জিত হয়নি জীবনে। কোনোরকম আলোচনারই যোগ্য নই।

তবে, সময়ের ব্যবহারের যে কথা তুলেছো, সেই প্রেক্ষিতে বলব যে, আমাদের প্রত্যেকেরই অঢেল সময়। সত্যিই অঢেল সময়। সময় যতটক্ কাজে লাগাই তার চেয়ে ঢের বেশি নষ্ট করি আমরা প্রত্যেকেই। তাই, 'সময় পাই না।

মানুষের মন হলো সাতমহলা বাড়ি। রাজার বাড়ি। তার মহলে মহলে ঘরে ঘরে, থরে থরে, উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। এক ঘরের কাজ শেষ হয়ে গেলে সে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে, দরজা শুধু ভেজিয়ে নয়, ভাল করে বন্ধ করে, অন্য ঘরে চলে যেতে হবে। মনকে বিভিন্ন water-tight compartment এ ভাগ করে নিতে হবে। আলাদা আলাদা ঘরে ভাগ করা অতি সহজও। নিয়মানুবর্তিতা আর শৃঙ্খলার অভ্যেস শিশুকাল থেকেই এজন্যে করা দরকার। ভাগ করে নিতে পারলে, একই দিনে, একই মানুষের পক্ষে একাধিক বিপরীতমুখী কাজ করা অতি সোজা।

কাজ করে কোনোদিনই কেউ ক্লান্ত হননি। ক্লান্ত হয়েছেন কাজের একঘেয়েমিতে। অন্য ঘরে গেলেই নতুন জীবনীশক্তি নিয়ে কাজ শুরু করা যায়। অন্য কাজ।

আঁদ্রে মঁরোয়ার সেই বইটিতে পড়েছিলাম ছেলেবেলায় যে, যে পর্বতারোহী পর্বতশৃঙ্গে চড়েন তিনি পর্বত শৃঙ্গের দিকে কখনওই তাকান না। তিনি পরের পাটি কোথায় ফেলবেন, তাই দেখেন। এবং এমনি করেই শৃঙ্গে পৌঁছে যান এক সুন্দর দিনে।

ভালো থেকো।

ইতি— *লেখক,*

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

পুনশ্চঃ

এই যে সবসময়েই কাজ কাজ এতে যেমন আনন্দ আছে তেমন কষ্টও আছে। বন্ধনের কষ্ট। কর্মর আরাধনা করতে করতে কর্তা যখন কর্মের সন্ধানে চাপা পড়ে যাবেন তখন কর্তার জন্যে কষ্ট হওয়ারই কথা।

ব্যার্টাণ্ড রাসেল এবং রবীন্দ্রনাথ দুজনেই এই একই কথা দুভাবে বলেছিলেন।

ইংল্যাণ্ডে যখন ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলশন হলো তখন রাসেল ভেবেছিলেন যে এবারে মানুষে তাঁর প্রকৃত ইপ্সীত বস্তুর সন্ধানে যেতে পারবে। দৈনন্দিন, মান্‌ডেন, ইনসিগ্‌নিফিক্যান্ট কাজ কর্ম সব যন্ত্রদানবের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে মানুষ এবার বাঁচার মতো বাঁচবে। "বিভূতি কে ছেড়ে" "ধনঞ্জয় বৈরাগীর" দিকে ঝুঁকবে। যন্ত্রদানবের হাত থেকে যন্ত্রদেবকে বাঁচাবে। মানবিক, দিকগুলির প্রতি মনোনিবেশ করতে পারবে। সাহিত্যসৃষ্টি করবে, গান গাইবে, ছবি আঁকবে আরও কত কিছু করবে। মানসিক স্তরের উন্নতির কথা চিন্তা করবে।

কাজ খুবই ইমপর্ট্যান্ট কিন্তু সেটা একটি Meansই মাত্র। END আদৌ নয়।

রবীন্দ্রনাথ তার "ছুটির পর" প্রবন্ধে কী সুন্দর করে এই "কর্মও" 'কর্তার" কথা যে বলেছেন।

সেই কবিতাটি আছেনা ? কার যে, তা এক্ষুণি মনে করতে পারছিনা। সম্ভবত ইয়েটস্ এর "সুইটহার্ট, ডুনট লাভ, টু লঙ, আই হ্যাভ লাভড লঙ অ্যান্ড লঙ অ্যান্ড গ্রু আউট অফ ফ্যাশান লাইক অ্যান ওল্ড সঙ।"

সেইরকম কাজকেও বাড়াবাড়ি রকমের ও দীর্ঘদিন ভালবাসলে যে বাসে তার অবস্থাও ঐ প্রেমিকের মতোই হয় বোধহয়, যদিও কাজই জীবন।

ছুটি যে আমরা নিই তা কাজ থেকে মাঝে মাঝে "বিচ্ছিন্ন" হবার জন্যে নয়। কাজের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটি নবীকৃত করবার জন্যেই ছুটি নিই। মাঝে মাঝে কাজ ছেড়ে দূরে না গেলে (আমার দীর্ঘদিন ধরে ছুটিহীন অচলাবস্থা চলেছে) কাজের প্রকৃত তাৎপর্য্য বোঝার ক্ষমতাই আমাদের নষ্ট হয়ে যায়। নিশিদিন কাজের মধ্যেই শুধু নিবিষ্ট হয়ে থাকলে শুধু কাজকেই বড় বেশি একান্ত করে দেখা হয়, কাজ তখন মাকড়শার জালের মতো, অক্টোপাসের মতো, চারদিক থেকে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবেই বিবশ করে দেয় যে, কাজ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে কী তাই বোঝার সামর্থ আমাদের থাকেনা।

তাই যে কাজে আমরা অভ্যস্ত, নিশিদিন যে কাজ নিয়ে পড়ে থাকা ; তাকে নতুনভাবে দেখবার জন্যে তা থেকে সরে চলে যাই।

এটা খুবই প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "আমরা কেবল কর্মকেই দেখব না। কর্তাকেও দেখতে হবে।"

এইরকম কথাই ; এতো সুন্দর করে অবশ্য বলার ক্ষমতাতো আমার নেই, তবে আমি বহুবছর ধরে বহু চরিত্রের মুখ দিয়েই বলিয়ে আসছি। বলেছি যে, নিজের ভেতর থেকে নিজে বেরিয়ে গিয়ে (আমাদের হিন্দুশাস্ত্র মতে আত্মা যেমন শরীর ছেড়ে বেরিয়ে যায়) দূরে দাঁড়িয়ে নিজ ব্যক্তিত্যকে নৈর্ব্যক্তিক চোখে দেখতে হবে, তার দোষ তার গুণ, তার চলার গতিপথ ও বেগকে নিরিখ করে ভুল শুধরে সঠিক পথ নির্ণয় করতে হবে।

ভাবি, অনেক ভালো ভালো কথাই। পড়ি অনেক বেশি। কিন্তু সকাল হলেই আবিষ্কার করি যে মাঝরাতে বারান্দাতে বা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে যে প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ যথার্থ জ্ঞানীর মতো নিজের অন্তরঙ্গ জীবনের উষ্ণতা-দৈন্য, জীবনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি নিয়ে একান্তে নিরুচ্চারে স্বগতোক্তি করেছিলো উজ্জ্বল, স্পন্দিত নক্ষত্রদেরদিকে চেয়ে, অনেকক্ষণ ধরে ; সেই আমিই আয়নার সামনে বসে টাই বাঁধছি দশটার সময়ে, "মে আই প্লীজ ইওর অনার" বলে সওয়াল শুরু করবে বলে।

যাচ্ছেতাই ! যাচ্ছেতাই ! যাচ্ছেতাই ! তোড়া, আমি একটা যাচ্ছেতাই !

নিজের পেছনে নিজে লাথি মারতে ইচ্ছে করে।

সেই কাজটা কিন্তু খুবই কঠিন। একদিন চেষ্টা করে দেখো।

তুমি অবশ্য পারবে। ফীজিক্যালি তুমি পারফেকটিলি ফিট। শাড়ি জামা পরে থাকা সত্ত্বেও প্রাঞ্জলভাবে বোঝা যায়। কুর্তা-চুড়িদার বা শাড়ি-ব্লাউজ মানুষের সৌন্দর্য বিচারের পক্ষে কোনো বাধাই নয়। ওয়াল্ট হুইটম্যান খুব সুন্দর করে বলেছেন এই কথাই তাঁর "LEAVES OF GRASS"এ।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

তোড়া,
কল্যানীয়াসু,

"একবার ভিক্ষা চাও
এ হাত আমার হাত, এই হাতে খুদকুঁড়ো ওঠে না কখনো
দিতে হলে মোহরই দেবো।
কড়া নেড়ে প্রতীক্ষায় দাঁড়াও ভিক্ষুক
কড়া নাড়ো, কড়া নাড়ো
জীবনের অযুত বছর ঘুম
একবার পারোতো ভাঙাও।

এ চোখ আমার চোখ, এ চোখের চেয়ে
বেশি নীল অন্য আর আকাশ কোথায় ?
তোমাকে মোহর দেবো। ভয় নেই
ভিক্ষা চাও। চেয়ে দ্যাখো
আমি আর যা কিছুই পারি
একবার দু হাত বাড়ালে
তাকে আমি ফেরাতে পারি না।

স্নায়ুর দোতলা ঘরে ঘন্টি বাজে
এই পৃথিবীতে আমি তবে কার ক্রীড়নক
পুরুষ না প্রকৃতির ?

www.boiRboi.blogspot.com

আসলে পুরুষ নয়
প্রকৃতিই আমাকে বাজায়
আমি তার শখের সেতার।
পুরুষের স্পর্শে আমি
ঘুমন্ত শৈশব ভেঙে জেগে উঠি
আমার সমুদ্রে শুরু হয় হঠাৎ জোয়ার।
রক্তে মাংসে ভালোবাসার সুগন্ধ পেলে
প্রকৃতিই আমাকে বাজায়
আমি তার মনের সেতার।"

"সেদিন রমনায় দেখি একটা ছেলে মেয়ে কিনছে।
আমার খুব ইছে করে দশ পাঁচ টাকায় ছেলে কিনতে
ছেলের কামানো গাল, ধোয়া সার্ট, চুলে টেরি
পার্কের বেঞ্চে, বড় রাস্তায় ত্রিভঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে—
ইচ্ছে করে ছেলের কলার চেপে রিক্সায় ওঠাতে—
পেটে ঘাড়ে কাতুকুতু দিয়ে হাসাবো
ঘরে এনে হিলঅলা জুতোয়

বেধড়ক পিটিয়ে ছেড়ে দেবো— যাশ্ শালা।
ছেলেরা কপালে স্যালোনপাস লাগিয়ে
ভোরের ফুটপাথে ঝিমোবে,
গা চুলকোবে, রোয়া ওঠা কুকুর চেটে খাবে জংঘার ঘা থেকে
গড়িয়ে পড়া হরিদ্রাভ রস
দেখে মেয়েরা চুড়ি-ভাঙ্গা শব্দে হেসে উঠবে রিণ রিণ

আমার খুব ছেলে কিনতে ইচ্ছে হয়
ডাশা ডাশা ছেলে, বুকে ঘন লোম—
ছেলে কিনে ছেলেকে আমূল তছনছ করে
কুঞ্চিত অণ্ডকোষে জোর লাথি কষে বলে উঠবো—যাশ্-শালা।"

(এই দুটিই "তসলিমা নাসরিনের "নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে" সংকলন থেকে, "বিদ্যাপ্রকাশ" ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা)

www.boiRboi.blogspot.com

জয় গোস্বামী এবং তসলিমা নাসরিন দুজনেই আমাকে বলতে পারে ফিরাখ্ গোরখপুরীর মতো,

"আনেওয়ালি নাসলেঁ তুম পর রাশখ্
করেঙ্গি হাম আসরোঁ
যব, ইয়ে ধিয়ান আয়েগা, উনকো, তুমনে
ফিরাখ্ কো দেখা হ্যায়।"

মানে হলো, ভবিষ্যতের প্রজন্ম সকলেই আজকের তোমাদের ঈর্ষা করবে যখন তারা জানতে পারবে যে, তোমরা ফিরাখ্‌কে দেখেছিলে ; জেনেছিলে।

এই অধম যে জয়কে এবং তসলিমাকে দেখেছিলাম, জেনেছিলাম এ কথা জেনে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আমাকে ঈর্ষা করবে। বলবে, কী ভাগ্য ! কী ভাগ্য !

জয় আর তসলিমা, তোমাদের আমার ভক্ত হৃদয়ের অকৃপণ আশীর্বাদ ও শুভাকাঙ্খা দিয়ে গেলাম। তোমরা যেন তোমাদের যোগ্যতার সমতুল যশ পাও নিজের নিজের জীবনকালেই।

ভালো থেকো।

জয় আর তসলিমার সমস্ত কাব্যগ্রন্থ যোগাড় করে পড়ে ফেলো তোড়া।

ইতি—তোমার লেখক

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

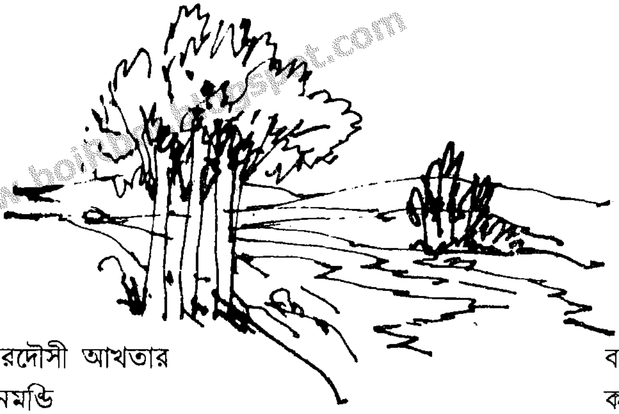

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা/বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

তবাসুম,

তোড়া

কল্যাণীয়াসু,

আজকে মনটা বড় খারাপ হয়েছে।

মনে আছে, তোমাকে বলেছিলাম জামশেদপুরের মায়া রবি ও কল্যাণী গৌতমের কথা ?

অফিস থেকে ফিরে চান করে যখন চিঠির ট্রে নিয়ে বসলাম তখন দেখি গৌতমের নাম লেখা একটি খাম। গৌতম লিখেছে যে কল্যাণীর মা অসুস্থ এই খবর পেয়ে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ এ কল্যাণীকে নিয়ে ও গেছিল। কল্যাণীর মা সেরিব্রাল স্ট্রোকে চলে গেলেন এক ঘন্টার মধ্যে।

তাঁর বয়স হয়েছিল। কিন্তু বাবাকে রেখে গেছেন।

গৌতম লিখেছে, তাঁর মুখের দিকে চাওয়া যাচ্ছে না। জামশেদপুরের নীলডিতে ওদের গোলমুড়ি রোডের বাংলোতে ওদের কিশোরী মেয়ে ডানা একা আছে বলে গৌতম ফিরে এসেছে। কল্যাণীকে রেখে সেখানে।

এদিকে রবি-মায়ার মেয়ে সায়ন-এর বিয়ে হয়ে গেল অগাস্টের ছ তারিখে। মায়া চারমাস আগে ফোন করে বলেছিল "তারিখ লিখে রাখুন ডায়ারীতে। আসতেই হবে। কোনো কথাই শুনব না।"

বলা বাহুল্য যে, যাওয়া হয়নি। কোথায়ই বা যেতে পারি !

বিয়ে হয়ে গেল ভালমতো। রবি, মেয়ে—জামাইকে সঙ্গে করে জামশেদপুরে ফিরলো। দ্বিরাগমনে এল ওরা।

পরদিন সকালে রবির একটু জ্বর হয়েছিলো।

রবিদের দলমা রোডের বাংলোর দুটি বাংলো পরেই থাকে তাপস। ডঃ তাপস সরকার। তাপসই জোর করে রবিকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ই সি জি করালো। ম্যাসিভ কার্ডিয়াক ইনফ্রাকশান ধরা পড়লো। অথচ রবির কোনোদিনও হার্টের কোনো গণ্ডগোলই ছিলো না।

www.boiRboi.blogspot.com

আই. সি. সি. উ. তে ভর্তি করালো তাপস। একঘন্টার মধ্যে সব শেষ। রবি চলে গেলো।

কী বলব বলো!

আমার চেয়ে কত ছোট রবি। সবসময়ে হাসিমুখ। ছিপছিপে, সব ব্যাপারে পরিমিতি জ্ঞান ছিলো প্রবল। আমার চরিত্রের ঠিক উল্টো। সাহিত্য-ভক্ত। ভালো পাঠক। কমল চক্রবর্তীর লিটল ম্যাগ জামশেদপুরের 'কৌরব' এর রবিই ছিল মস্ত খুঁটি। অবশ্য গৌতমও সাহায্য করে। কমলের মাধ্যমেই আমার রবি-মায়ার সঙ্গে আলাপ এবং রবি-মায়ার মাধ্যমে জামশেদপুরের আর সকলের সঙ্গে।

এতো খারাপ লাগছে মনটা যে, কী বলব।

ডায়াল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাত ব্যথা করে অনেক রাতে পেলাম। রবি-মায়ার বাড়ি। মায়া নেই। মানে, হাসপাতালে। এই হঠাৎ শক-এ মায়ার হার্টের অবস্থাও নাকি অত্যন্ত খারাপ। তাপস কোনো ঝুঁকি নেয়নি। রবির ছোট ভায়ের সঙ্গে কথা হলো।

রবির কোনোদিনও হার্টের কোনোরকম কমপ্লেইনই ছিলো না। টাটা কোম্পানীর প্লেনে করে আসতো কলকাতাতে। একদিনের জন্যে এলেও আমার অফিসে একবার আসতো। কিন্তু আমাকেও তো মাসের মধ্যে পনেরোদিন দিল্লি বম্বে থাকতে হয়। রবি চিঠি লিখে যেতো, "বুদ্ধদেবদা, বড় বেশি ট্র্যাভেল করছেন। এটা ঠিক নয়। Take Care—রবি।"

প্রতি চিঠিতেই লিখতো, কবে আসছেন জামশেদপুরে? আবার দলমা টপ্ ও সবুজের সমারোহে বসে আপনার গান শুনব। জোর আড্ডা মারব।

হয়তো আবারও যাব কখনও জামশেদপুরে, যেতে তো ইচ্ছে করেই। নীলডিতে, মানগোতে, মায়া, গৌতম, কল্যাণী, তাপস, তাপসের স্ত্রী, খোকন এবং আরও অগণ্য মানুষের সঙ্গে দেখা হবে। হয়তো কখনও দলমা টপ-এও যাবো ; গানও গাইবো। কিন্তু রবি থাকবে না পাশে। বলবে না, একটা ক্যাসেট করে ফেলুন বুদ্ধদেবদা। আপনাকে তো পাওয়া যায় না, ক্যাসেট থাকলে আপনার গান শুনতে পেতাম।

ক্যাসেটও বেরুবে একটা শীগগিরি। কিন্তু রবি তো শুনতে পাবে না সেই ক্যাসেটের গান।

এইরকমই জীবন। তাই মাঝে মাঝে ভাবি, ওষুধপত্র খেয়ে লাভ কি?

দে'জ মেডিকেল স্টোর্স এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী ভূপেন দে মশায় আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। আবার বন্ধুবৎও দেখতেন। উনি সবসময়ই বলতেন, আমরা ওষুধের শিশিতে কি লিখে দিই দ্যাখোনি?

বলতাম কি?

উনি বলতেন, ম্যানুফ্যাকচারিং ডেট আর একস্‌পায়ারি ডেট।

ও, হ্যাঁ!

আমাদেরও যিনি ম্যানুফ্যাকচার করেছেন তিনিও কপালে লিখে দিয়ে পাঠিয়েছেন। খামোকা ঝামেলা করার দরকার কি? যাওয়ার টিকিট তো জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কাটা হয়ে গেছে। শুধু বার্থটি রিজার্ভেশান করা বাকি। সময়মতো তিনিই করে দেবেন।

গতকালই আকাশের ভেসে-যাওয়া মেঘেদের দিকে চেয়ে ভাবছিলাম, এখানের বাসতো যে কোনোদিনই ফুরোতে পারে। তারপর?

www.boiRboi.blogspot.com

পরপার বলে কি কিছু আছে? কোথায় যাব? কোথায় থাকব?

ইদানীং আমি বড় আরামীও হয়ে গেছি। বাথরুম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে কিনা? মশা আছে কি নেই? মশারী পাওয়া যাবে তো? জেনারেটর? কিছুই জানি না?

অথচ যেতে হবে। সকলকেই।

রবিটা এতো ছোট হয়েও চলে গেল আগ বাড়িয়ে।

রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন: "এই পারে তোর ভরসা যত ঐ পারে তোর ভয়/ জয় অজানার জয়/ দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতোই ধরে/ চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময়/ সেই কি শূণ্যময়। জয় অজানার জয়।"

কী জানি!

রবিটা একটা এস-টি-ডি করে সব জানিয়ে দিলে পারে। জায়গা কেমন? লোকজন কেমন?

না - না। ঠাট্টা নয়। আজ সারারাত আমার মায়ার কথা ভেবে ঘুম হবে না। ঘুমতো এমনিতেই হয় না। কী রোগে ধরেছে জানি না। কিন্তু এ অনিদ্রা অন্য অনিদ্রা।

বেশি দিন বাঁচা এখানে আদৌ উচিত নয়। পঞ্চাশ পেরিয়েই এ কথা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। বন্ধুরা চলে যাচ্ছে একে একে। ছোটরা চলে যাচ্ছে। মোটেই ভাল লাগে না।

আমার এক মামা প্ল্যানচেটে আত্মা আনতেন। পেনসিল সব লিখে যেত। রবীন্দ্রনাথও নাকি শমীকে এনেছিলেন। জানি না। রবিকে কি আনব? কে পারে? কোনো মীডিয়ামকে তো জানি না।

বড় মানুষেরা তো কত জানেন, কত বোঝেন। তাঁদের লেখা পড়লে এই সব সময়ে মন শান্ত হয়। মায়াকে আর কল্যাণীকে বলব রবীন্দ্রনাথের "শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালা" পড়তে। বারবার পড়তে। আর টলসটয়ের একটি চটি বই "What Men Live By". আমার বাবাকে দিয়েছিলাম মায়ের মৃত্যুর পরে। আমি আস্তিক। যদিও কোনো ধর্ম, দেবদেবী বা মূর্তিতে বিশ্বাসী নই। কিন্তু আমার বাবা ঘোর নাস্তিক ছিলেন। বিজ্ঞানের ছাত্র এবং তেমন নাস্তিক নন যে, বৃদ্ধ বয়সে হাঁটু ভেঙ্গে পড়ে আস্তিক হবেন। সেই নাস্তিক বাবাও ঐ বই পড়ে শোকে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। আমাকে বারে বারে বলতেন বইটির কথা।

রবীন্দ্রনাথ, কন্যা মীরাদেবীকে লিখছেন দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যুতে সান্ত্বনা দিয়ে: "শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে, কম পড়েনি—সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তার মধ্যে। সমস্তর জন্যে আমার কাজও বাকি রইলো। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে।"

যাঁরা বড়, তাঁরা সুখ দুঃখ সবকিছুকেই নিজের জ্ঞান নিজের প্রশান্তি নিজের নির্লিপ্তি বাড়িয়ে নেওয়ার কাজে লাগাতে পারেন। আমরা সাধারণ বলেই পারি না।

তবে অন্য সব মানুষতো মায়া বা কল্যাণীর মতো কাছের মানুষ নয়। একেবারেই অপরিচিত, দুরের মানুষের দুঃখও আমাকে ভীষণভাবে ছোঁয়, পীড়িত করে; আলোড়িত করে। সেই জন্যেই হয়তো ঈশ্বর আমাকে লেখক করে পাঠিয়েছেন।

www.boiRboi.blogspot.com

আজ রাত ভাবনার রাত, তর্পণের রাত। রবি যে একা নয়, ওর সঙ্গে আমরা সকলেই যে আছি, অভয়ধামে গেছে ও তাই ওর যে ভয় নেই কোনো ; এ কথাই রাতভর ওকে জানাবো।

ও রবি। তুমি কোথায় ? আমি, গৌতম, তাপস, কমল, আমরা সবাই যে তোমাকে মনে করছি। তোমার যাত্রা শুভ হোক এই প্রার্থনা করছি, তা কি তুমি জানতে পারছো ? মায়ার চোখ তোমার জন্যে ক্ষণে ক্ষণে ভিজে উঠছে তাও কি তুমি জানতে পারছো ? রবি ?

এখন থামি তোড়া। খাওয়ার টেবিলে ডাক পড়েছে। দিনে রাতের এইটুকু সময়েই আমার পরিবারের সঙ্গে, স্ত্রী কন্যাদের সঙ্গে দেখা হয়। তাও রোজ নয়।

ইতি—লেখক

পুনশ্চ ঃ 'শ্রাদ্ধ' কথাটা এসেছে "শ্রদ্ধা" থেকে। যদিও রবির কাজে জামশেদপুরে যেতে পারব না। কিন্তু তার আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাব এখানে বসে। আশাকরি সেই শ্রদ্ধা, পরপারে ; রবির কাছে পৌঁছবে।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ

“ ”

লেখক,

গতকাল কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনতে গেছিলাম।

কী ভালো যে লাগে তা কী বলব।

সুচিত্রা মিত্রও ভালো গান করেন কিন্তু টপ্পা নেই ওঁর গলাতে। অবশ্য কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলাতে আবার সুচিত্রা মিত্রর ঋজুতা নেই।

আপনি “অবরোহী”তে লিখেছিলেন উস্তাদ কালে খাঁ সাহেবের কথা। তাঁর “আশাবরী” শুনে অমিয়নাথ সান্যাল মশায় এবং তাঁর কাজিন “নিকুন”বাবু অভিভূত হয়েছিলেন। ওঁদের মধ্যে কেউ তখন বলেছিলেন উস্তাদ কালে খাঁকে যে, আর কেউ যদি আশাবরী আমাদের কাছে কখনও পেশ করেন তো বলবো, আগে গিয়ে উস্তাদ কালে খাঁর আশাবরী শুনে আসুন।

ঐ কথার পর কিন্তু নিরূপ, অর্থহীন, সরল, খুদাহর খিদমগার, প্রকৃত গুণী, খাঁ সাহেব চমৎকার ভাবে ঐ দুই তরুণকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, “নহি বাবুসাব, অ্যায়সা মত কহিয়ে। গুণীও মে একসে এক হ্যায়। আল্লাহি জানে, হরেক ইনসানকে দিমাগ কিস কদর লায়েকিসে ভরা হুয়া হ্যায়। ফির হমারে আপকে কহনেমে ক্যা হক্ক হ্যায়।”

বলেছিলেন, প্রতিভার সাক্ষাৎ করা, সন্ধান করাটাই হল সেরা কাজ, কার মধ্যে কি নেই, এ রকমের অনুসন্ধিৎসা নির্বোধেরই কাজ। ময়ূরের শুঁড় নেই, হাতি পেখম ধরতে পারে না এরকমের বিচার করা কিন্তু সমালোচনা নয়, ওটা কিছুই নয়।”

অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের “স্মৃতির অতলে” বইটির কথা আপনি বলেছিলেন, তাই না ? থুড়ি ! আপনি বলেননি, “আবরোহী”তে পড়েছিলাম !

আপনি তো নিজে গান করেন, গান ভালোবাসেন, আপনি কি বলতে পারেন এতো শিল্পীর গলাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনি, নজরুল গীতি শুনি, অন্যান্য গানও শুনি ; কিন্তু মন খুব কম শিল্পীর গান শুনেই ভরে।

www.boiRboi.blogspot.com

কেন ? এমন হয় কেন ?
গান কাকে বলে আপনার মতে তা কী জানাবেন ?
তাতে যদি প্রবন্ধও লিখতে হয়, তাও লিখবেন।
আমি জানতে চাই।

ইতি—ফিরদৌসী

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
পোস্ট বক্স নং ১০২৭৬
কলকাতা ৭০০ ০১৯

তোড়া, কল্যানীয়াসু,

তোমার চিঠি পেলাম। "সাহিত্যম" এর প্রদীপ সাহা যাবে (আমার তরুণ প্রকাশক) ঢাকাতে শীগগিরি। ওর হাতে শুঁটকি মাছ দিয়ে দিও।

পাওয়ার পরে, এখানে কাকে দিয়ে রাঁধাবো তাই হচ্ছে সমস্যা।

দেখি, কী করা যায়।

আমার বাড়িতে আমিই একমাত্র প্রস্তরযুগের মানুষ আর সকলেই দ্বাবিংশ শতাব্দীর। আমার কিছুমাত্র দাবী-দাওয়াই খাটে না এখানে। শুঁটকি মাছ তো দূরস্থান, ইলিশমাছও পরের বাড়ি গিয়ে খেলে ভালো হয়!

সাহিত্য কি, বা গান কি? এ তো বলে বোঝাবার জিনিস নয়। এ সব তো অনুভূতির জিনিস এবং সে অনুভূতি তোমার আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

গান শুনে মন না-ভরবার অনেক কারণই থাকতে পারে। যেমন, গায়কের স্বরস্থাপনও স্বরক্ষেপন দুর্বল বা, কাঁপাকাঁপা বা অবশ। যেমন, অর্থহীন বাণী। যেমন, গায়কের শিক্ষার অভাবে বাণীর অর্থ ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারার অক্ষমতা। যেমন; ভাবের সঙ্গে সুরের রাজযোটক মিল না-হওয়া।

গান তো এমনিতে একটা মৃত জিনিস। মানে, স্বরলিপিতে বসানো সুর-লেপা গানের বাণী। তাতে প্রাণ দেওয়াই তো গায়ক বা গায়িকার কাজ।

মৃতসঞ্জীবনী-সুরা ইস্তেমাল করেন গায়ক-গায়িকারা।

যিনি ব্যকরণে পণ্ডিত, তিনি বৈয়াকরণ অবশ্যই। প্রকৃতই। কিন্তু শুধুমাত্র সেই গুণের দাবীতেই তিনি কখনওই লেখক হয়ে উঠতে পারেন না। ব্যাকরণ জ্ঞানের সঙ্গে অন্য গুণ থাকলে লেখক হলেও বা হতে পারেন।

যিনি প্রতিমা গড়েন, চমৎকার প্রতিমা; গর্জনতেল-মাখা, জরির-পাড়ের শাড়ি পরা, উজ্জ্বল ভয়াবহ-সুন্দর চোখের সব প্রতিমা; তিনি সন্দেহ নেই, অশেষ গুণী। তিনি কুমোর,

www.boiRboi.blogspot.com

প্রতিমার কাঠামো তিনিই করেন। খড় করেন। তার উপরে মাটি দেন। এবং তারও পরে রং করেন। অত্যন্ত উঁচুস্তরের শিল্পী তিনিও। কিন্তু তিনি প্রতিমাতে প্রাণ দেন না। প্রাণ দেন পুরোহিত। বোধনের ঢাকের শব্দে ষষ্ঠী পুজোর মাধ্যমে। ধূপ-ধূনো ফুল-মালার গন্ধে নববস্ত্র পরিহিতা সুস্নাতা সুগন্ধি মেয়েদের চান-করা গায়ের আর চুলের গন্ধের মধ্যে। প্রাণ সঞ্চার করার পরই প্রতিমা "দেবী"তে রূপান্তরিত হন। তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিমা শুধুমাত্র প্রতিমাই।

ছবিও আঁকেন অনেকেই। কিন্তু সকলেই শিল্পী নন। ইজেলের উপরে বসানো ক্যানভাসে প্যালেট থেকে অনেক রঙ, তুলিতে অনেকক্ষণ, অনেকদিন ধরে বুলিয়ে বুলিয়ে যাবার পরই ক্যানভাসের একটি "ছবি-ছবি" অবস্থা আসে। গর্ভবতী অবস্থা। যিনি শিল্পী, তিনি তারপরই তুলির একটি আঘাতে অথবা রঙের একটি শেষ-মুহূর্তের অভিঘাতে একটি ক্যানভাসকে আচমকা ছবিতে রূপান্তরিত করে দেন। শিল্পর প্রসব ঘটান।

By his magic touch! তাই তিনি শিল্পী।

সাহিত্য, সংগীত এবং চিত্রকলা সৃষ্টিশীলতার এই সব ক্ষেত্রেই এই "Magic touch" যাঁদের করায়ত্ত হয়েছে শুধু তাঁরাই পাঠকের, শ্রোতার এবং দর্শকের হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছতে পারেন। সরাসরি। তাঁদের কোনো পুরোহিত, বা পাণ্ডা, বা রাজা বা ধনাঢ্য বণিকের সহযোগিতা বা কৃপা বা সাহায্যর প্রয়োজন হয় না মা সরস্বতীর পদপ্রান্তে পৌঁছনোর জন্যে।

সাহিত্যর কথাও এসে গেলো, তাই বলবো, সাহিত্যর সবচেয়ে বড় গুণ সহমর্মিতা।

অন্যের দুঃখকে সুখকে, আশা, ব্যর্থতা, হতাশাকে নিজের হৃদয় দিয়ে ছোঁয়া। এই গুণ, তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ পাশ করলেই অথবা বিদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে দিশি বা বিদেশি সরকারের অর্থানুকূল্যে গিয়ে, অনেকদিন থেকে, নানা বিদেশি সাহিত্যিক ও কবির [যাঁরা নিজ নিজ দেশে হয়তো অত্যন্ত মামুলী] গা-ঘষাঘষি করলেই জন্মায় না। কেউ এই গুণ নিয়েই জন্মান। এবং তাঁদের মধ্যে তুলনামূলক সাহিত্যে এম. এ এবং বিদেশে যাওয়া লেখক-কবিরাও থাকতে পারেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো, সতীনাথ ভাদুড়ির মতো, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো, অথবা রমাপদ চৌধুরীর মতো সাহিত্যিক তাঁরা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি স্বল্প পরিচিত এবং সাম্প্রতিক অতীতে প্রকাশিত (এ যাবৎ অপ্রকাশিত) লেখা "হলুদ পাতা" থেকে ক'টি লাইন তুলে দিচ্ছি তোমার বোঝার সুবিধের জন্যে। এই লেখাটি রমাপদ চৌধুরীই একবার আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাতে প্রকাশ করেছিলেন।

"কত বর্ষার রাতে যারা অনাহারে কাটিয়েচে....সারাজীবন যারা পরের গোলাম হয়ে নত মাথায় পাদুকার ধূলা শীর্ণ হাতে মুছে নিয়েচে...চিরদিন ভালোবেসে যারা প্রতিদানে পেয়েছে অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য ঔদাসীন্য, শান্ত নদীর শ্যামকূলের চিতায় যাদের জীবনের আশা ফুরিয়েছে...কত শিশু, যাদের কচি হাসি শিশু বয়সের সাধে আহ্লাদে উজ্জ্বল হয়েছিল....সারাজীবন যারা আনন্দের পেছনে পেছনে ঘুরেচে কিন্তু আলেয়ার মত আনন্দ যাদের থেকে দূরে দূরে চলে বেড়িয়েচে চিরদিন গ্রহে গ্রহে নক্ষত্রে নক্ষত্রে অন্ধকার রাত্রে ব্যর্থ প্রেমের অশ্রুতীর্থ যাদের

দীর্ঘশ্বাসে ভরে গিয়েছে....যারা ছিল দুরন্ত, দস্যু, পাপী, অজ্ঞান তারা যারা সারাজীবন ধরে পরের কৃপা ও পাপের বোঝা বয়ে ফিরেচে সে সব ব্যর্থ, লুপ্ত, অখুশী দীন জীবের জন্যে এখানে থাকবে এক স্মৃতিস্তম্ভ অনন্তের কোণে তা চিরদিন থেকে যাবে। (তাতে খোদিত থাকবে)

"যাদের বুকের রক্তে, ব্যর্থ চোখের জলে আমার এতদিনের কল্পনা আজ সার্থক হল, তাদের অনেকদিন আগে লুপ্ত হয়ে যাওয়া দীর্ঘশ্বাসে আমার সৃষ্টি সুরভিত হউক।

"তাদের আত্মার উদ্দেশে এ স্তম্ভ উৎসৃষ্ট হল। তাদের দুঃখের দীর্ঘশ্বাস তাদের বুকের রক্তে এ সৃষ্টি সম্ভব হয়েচে।"

দেবকন্যারা অনন্তশূন্য থেকে নেমে এসে মান্দার ফুলের মালা হাতে নক্ষত্র জ্যোৎস্নায় পরিয়ে দেবে.....বিশ্বের পুণ্যলোকের অনাহত, নীরব সঙ্গীত বসন্তদিনের বীণারবে ছড়িয়ে অনন্তদিন ধরে চির চিরযুগ ধরে।"

আঁতেলরা বলবেন ট্রাশ। সেন্টিমেন্টালিজম্।

আমি বলব, সেন্টিমেন্ট তো মানুষেরই গুণ বা দোষ। জানোয়ারেরা তো সেন্টিমেন্টের খবর রাখে না।

ভাবাবেগের একটু আধিক্য অবশ্যই আছে। এবং সে কারণেই হয়তো বিভূতিভূষণ নিজ-জীবদ্দশায় এটি প্রকাশযোগ্য মনে করেননি।

কিন্তু লেখাটি পড়ামাত্রই পাঠকের হৃদয়ের মর্মমূল বিদ্ধ করে।

যাঁরা বলেন যে, জনপ্রিয়তা আর মর্যাদা সমার্থক নয় ; তারা কী বলতে চান তা খোলসা করে বললে ভালো হয়।

যে-লেখা মানুষে পড়লোই না, যে গান শুনলোই না ; সেই লেখা এবং সে গানও কি সার্থক ? নিজগোষ্ঠির, নিজপুরের, গজদন্তমিনারে বসে পারস্পরিক পিঠ-চুলকানি ও সাহিত্য সম্বন্ধে, সংগীত সম্বন্ধে "ফতোয়া" জারী করা ; আর যাই হোক, শিল্পীর কাজ নয়।

শিল্পীর যদি কোনো বক্তব্য থাকে, "বাণী" বলব না ; কারণ, বাণীর অধিকার থাকে শুধু মহাত্মাদের ; তবে সেই বক্তব্যকে বহন করে নিয়ে যান যুগে যুগে, কালে কালে তাঁর পাঠক-পাঠিকারাই, শ্রোতারাই ; দর্শকেরাই। তার জন্যে অ্যামপ্লিফায়ার ভাড়া করতে হয় না। মেডিয়ার বশংবদ হয়ে মেডিয়ার ম্যাধ্যমে লাগাতার এবং লজ্জাকর আত্মপ্রচার করতেও হয় না। প্রচারযোগ্য কিছু যদি কারো ভেতরে থাকে তবে তা আপনা থেকেই, বিনাপ্রচারেই, প্রচারিত হয়। চিরদিনই হয়েছে।

এবং হবে। হবে। হবে।

মেডিয়া যদি মিথ্যা অপপ্রচার করে, তবে যাঁরা পাঠকবর্গ, যাঁরা মেডিয়াকে মেডিয়া করে তুলেছেন তাঁরাই সেই মেডিয়াকে ফেলে দিয়ে পায়ে মাড়িয়ে যাবে। অসততা নিয়ে কোনো মেডিয়াই শেষ পর্যন্ত বাঁচতে পারে না। সত্যকে তাদের মানতেই হবে।

সাহিত্য, প্রতিযোগিতার বিষয় নয়। কোনোদিনও ছিলো না। অথচ আজকে, তাই করে ফেলা হয়েছে সাহিত্যকে।

আমরা যারা একটুও লেখালেখি করি তাঁদের মধ্যে আমার মতো নগণ্য লেখক এবং

www.boiRboi.blogspot.com

অনেক বরেণ্য লেখকও আছেন ; তাঁদের কারো সঙ্গেই কারো কোনো প্রতিযোগিতা নেই। অন্তত থাকার কথা ছিলো না কোনো। আমরা সকলেই আগুনের বা ফুলের বা অন্যকিছুর রুমাল হাতে নিয়ে সমান্তরাল রেখাতে প্রতিনিয়ত দৌড়ে যাচ্ছি, নিজের নিজের বিশ্বাস সঙ্গে করে। অন্য কোনো উত্তরসুরী আমাদের প্রত্যেকের হাতের জিনিসটিই নিয়ে আবারও সামনে দৌড়ে যাবে, যুগে যুগে ; কালে কালে।

এই দৌড়ে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন আসে কোথা থেকে ? এ প্রতিযোগিতা যদি অর্থের জনেই হয়, তবে বলতে হয় যে, সেই সব অর্থগৃধ্নু মানুষ ভুল জীবিকা বেছে নিয়েছেন।

'বাল্মিকী প্রতিভা'তে আছে না ? গভীর অরণ্যমধ্যে দস্যু রত্নাকর যখন আহত হংসমিথুন দেখে কবি হয়ে উঠলেন, "বাল্মিকী" হলেন, তখন দেবী লক্ষ্মী এলেন একদিন তাঁকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে।

উনি গাইলেন, আহা ! কী সুন্দর সে গান !

"কেন গো আপন মনে ভ্রমিছ বনে বনে
সলিল বহিছে দু নয়নে কিসের দুখে !
কমলা দিতেছে আসি রতন রাশি রাশি,
ফুটুক তবে হাসি মলিন মুখে।
কমলা যারে চায় বলো সে কী নাহি পায়,
দুখের এ ধরায় থাকে সে সুখে।
ত্যেজিয়া কমলাসনে এসেছি এ ঘোর বনে,
আমারে শুভক্ষণে হেরো গো চোখে।"

উত্তরে বাল্মিকী বললেন, দেবী সরস্বতীর কথা মনে করে ;

"কোথায় সে উষাময়ী প্রতিমা—
তুমি তো নহ দেবী কমলাসনা।
কোরো না আমারে ছলনা।"
কী এনেছ ধন মান ! তাহা যে চাহে না প্রাণ
দেবী গো, চাহি না, চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি চাহি না—
তাহা লয়ে সুখী যারা হয় হোক, হয় হোক—
আমি দেবী সে সুখ চাহি না।
যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এ বনে এসো না এসো না—
এসো না এ দীণজনকুটিরে।
যে বীণা শুনেছি কানে মন প্রাণ আছে ভোর—
আর কিছু চাহি না, চাহি না।"

এই শুনে বিরসবদনে লক্ষ্মী চলে গেলেন।

এই রিলে-রেস্ এর ব্যাপারটি প্রতীকী উপন্যাস 'বাতিঘর' এ আছে। প্রায় ১৮/২০ বছর

www.boiRboi.blogspot.com

আগে লেখা উপন্যাস। কিন্তু আমার খুব প্রিয় উপন্যাস। ওড়িশার গোপালপুর অন-সীর পটভূমিতে লেখা।

"চাহি না, চাহি না, মণিময় ধূলিরাশি তাহা লয়ে সুখি যারা হয় হোক, হয় হোক"—

তুমি বিখ্যাত নরওয়েজিয়ান লেখক KNUT HUMSUN এর লেখা পড়েছো কিনা জানি না।

সাহিত্য-বোধ ব্যাপারটা ফুচকা বা দহিবড়া বা মদ খাওয়ার মতো সহজে রপ্ত করার নয়। এই সাহিত্যের, সংগীতের 'ঘরাণা' বহু কালের। যেহেতু আমাদের একটিই জীবন তাই পেছনে বা ভবিষ্যতে যাবার উপায় তো আমাদের নেই। যা-কিছু করার তার সবকিছুই এই জনমেই করে যেতে হয়। তাই শিশুকাল থেকেই দিশি-বিদেশি নানা লেখা পড়ে সাহিত্য-মনস্কতা গড়ে নিতে হয় নিজের ভেতরে। ভেতরে ভেতরে দৌড়ে যেতে হয়, অন্যদের অনেক আগে ; সকলের চোখের আড়ালে, শ্রবণের অলক্ষে, তবেই একদিন নৈর্ব্যক্তিকভাবে সাহিত্য-বিচার সম্ভব হয়। সমসাময়িক হয়েও, সমসাময়িকদের লেখার বিচার করা যায়। CONSTRUCTIVE বিচার। যে সাহিত্যিকের মাথাতে DESTRUCTION এর ভাবনা একবার এসেছে তাঁর নিজের DESTRUCTION একেবারেই নিশ্চিত।

আমরা যখন স্কুলে পড়ি, তখন KNUT HUMSUN নোবেল প্রাইজ পান। তাঁর "HUNGER" উপন্যাসের জন্যে। "GREAT HUNGER" পরে বেরোয়। তখনই আমার স্বদেশী—করা সেজকাকা, যিনি আমাকে বাংলা পড়া শিখিয়েছিলেন এবং আজও অবিবাহিত (তাঁর কথা লিখেছি অনেকই বইয়ে "পঞ্চপ্রদীপে" "ঋভু"তে, "দূরের দুপুরে") তিনি আমাকে এক কপি HUNGER কিনে এনে দেন।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, কিশোর ছিলাম বলেই হয়তো, তেমন বুঝতে পারিনি তখন। তিনটাকা মাইনের বাংলা স্কুলে পড়া ছাত্র হিসেবে ইংরিজিটাও জানতাম না তেমন ভালো, সাহিত্য বোঝার মতন।

বছর কুড়ি বাইশ আগে বন্দনাদি, অধ্যাপিকা বন্দনা রায় আমাকে বলেন, "বুদ্ধদেব, তুমি "KNUT HUMSUN এর "GROWTH OF THE SOIL" পড়েছো ? তোমার খুব ভালো লাগবে। অবশ্যই পোড়ো।"

বন্দনাদি তখন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃতির উপরে একটি থীসিস করছিলেন। উনি ডক্টরেটও পান ঐ থীসিসের জন্যে। সেই সূত্রেই আমার কাছে এসেছিলেন।

বইটি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। এখন KNUT HUMSUN এর উপরে, (যেমন HEMINGWAYর উপরে) নিজেকে একটি ছোটখাট বিশেষজ্ঞ বলে নিজেই ভেবে আনন্দ পাই। তবে কৃতিত্ব বন্দনাদিরই। আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

KNUT HUNSUN সম্বন্ধে বলা হয়েছিলো : Words were glod in his hands. Each of his books were attention compelling, baffling the critics to define his exact place as a writer. It was with his novel 'HUNGER' that he really made his break through. After IBSEN he is probably the greatest literary figure modern Norway has !."

www.boiRboi.blogspot.com

জার্মানীর থমাস মান, ("MAGIC MOUNTAIN" এর লেখক। পড়েছো কি ? 'Magic Mountain'? না পড়ে থাকলে অবশ্যই পোড়ো।) বলেছিলেন, হামসুন সম্পর্কে : "I shall never forget what Hamsun's books meant to my young sensibilities. Never has the Noble Prize awarded to one worthier of it."

এতো কথা বললাম তোমার মনে একথাই গেঁথে দিতে যে, পরিণত বয়সে যাঁরা সাহিত্যিক, কবি, গায়ক, বাদক হিসেবে স্বীকৃতি পান তাঁদের সাধনা আরম্ভ হয় শিশুকাল থেকেই। আমার এই মত, চিরদিনই ; যে, "RENDERING" এর থেকে "PONDERING" অনেক বড় সাধনা। "PONDERING" এ বহুসময় কাটালেই তবেই "RENDERING" এর যোগ্যতা আসে। ইদানীং দেখি, কী কবি, কী লেখক, কী গায়ক, কী বাদক সকলেই বড় তাড়াতাড়ি পাদপ্রদীপে আসতে চান।

তবে একথাও অবশ্য স্বীকার্য যে, পাদপ্রদীপের সামনে আসা ব্যাপারটা এখন ধরা-করা, এমনকি ঘুষ-ঘাষেরও হয়ে গেছে। এই মুহূর্তে আমার কমপক্ষে একশজন পাঠক-পাঠিকা আছেন যাঁদের নামও করতে পারি বললে, যাঁরা আমার চেয়ে বাংলা শুধু ভালো লেখেন তাই নয়, গল্প উপন্যাস লিখলেও আমার চেয়ে অনেকই ভালো লিখতে পারতেন। সুযোগ পাননি তাই। তবু তাঁরা মহৎ বলে আমার মতো অযোগ্য লেখকের লেখা পড়েও প্রশংসা করে চিঠি লেখেন।

লজ্জাতে মরে যাই !

কী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কী অন্যান্য ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে সুযোগ শুধু কতিপয় মানুষেরই কুক্ষিগত হয়ে আছে। তাঁরাই বড় হয়ে, শ্লাঘাতে ফেটে পড়েন। বলেন "আমি গুণী বলেই উপরে এসেছি।"

একথা নীচ, মূঢ় ; পরম মূর্খর দম্ভ। যতই গুণ থাকুক না কেন ক্ষমতাবান মানুষের ন্যূনতম সুযোগ ও সহায়তা না পেলে কেউই কোনো ক্ষেত্রেই উপরে উঠে আসতে পারে না। মেডিয়ার সাহায্যরও দরকার। আমি যেমন আনন্দবাজারের সাহায্য পেয়েছিলাম।

এই দেশ গুণ্ডাদের দেশ হয়ে গেছে। দালালদের দেশ। এখানে প্রকৃত গুণীদের সম্মান হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কলির লক্ষণ প্রকট হয়েছে।

চুনীকে আমার এই জন্যেই এতো ভালো লাগে। পাশাপাশি এক বেঞ্চে বসে আমরা পড়াশুনা করেছি। ও পড়াশুনোতেও খুব ভালো ছিলো। সে সব কথা কেউই জানে না। সেসব কিছুই নয়। পড়াশুনোতে, খেলাধূলোতে, গান-বাজনায়, সাহিত্যে ভালো অনেক মানুষই আমার দেখা আছে। জানা আছে ; কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই কৃতঘ্ন, গর্বিত, অ-মানুষ।

চুনীর সাফল্য চুনীকে নষ্ট করতে পারেনি।

এর চেয়ে বড় অর্জন, বঙ্গভূমে আর কিছু আছে বলে আমি অন্ততঃ জানি না।

অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা চলে এলো। মার্জনা কোরো।

ইতি—লেখক

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

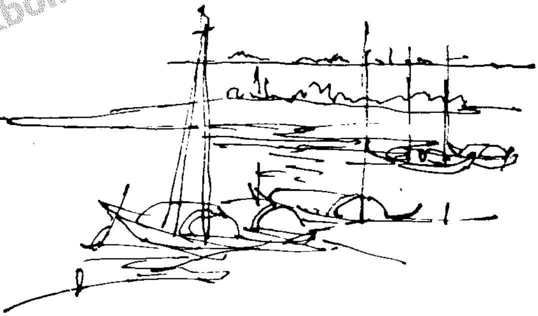

ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

"   "

আমার লেখক,

কাল রাতে আপনার 'অববাহিকা' উপন্যাসটি পড়লাম। ছোট। কিন্তু খুব ভালো লাগলো। ওটি কি "দেশ" এ বেরিয়েছিলো ? পুজো সংখ্যাতে ?

আপনার সব নায়ক-নায়িকার নামগুলিই উদ্ভট। উদ্ভট হলেও অসুন্দর এমন বলবো না। তবে অনেক নামের মানে অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না বলে, মানে জানবার জন্যে ছটফট করে বেড়াতে হয়।

শান্তিনিকেতনের পটভূমিতে লেখা 'অববাহিকা' পড়ে শান্তিনিকেতন যেন চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে আসে। কানে যেন নায়িকা কোপাইয়ের সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাই, কাঁকুড়ে মাটির উপরে কিরকির করে। যেন শুনতে পাই, চাবিওলার গান। "চাবি বানাবেন বাবু, চাবি বানাবেন।"

শান্তিনিকেতনে কখনও না গিয়েই শান্তিনিকেতনে যাওয়া হলো। আপনার লেখার এই গুণটি আমাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করে। কত বন জঙ্গল, পৃথিবীর কত জায়গাই না দেখা হলো আপনার দয়াতে !

উপন্যাসটির নাম 'চাবিঅলার গান'ও দিতে পারতেন 'অববাহিকার' বদলে। তবে অববাহিকার গভীরতা অনেক বেশী। খোয়াই, কাশবন আর হরজাই গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে 'কোপাই' নদী বয়ে চলেছে আর তার অববাহিকায় তার দিকে অধীর আগ্রহে অপার বিস্ময়ে চেয়ে আছে—কবি হর্জর বসু, কাশ এবং ঝম্পক। চমৎকার ! কাশ তো ফুলের নাম। ঝম্পক তালের নাম। আর হর্জর ?

দয়া করে কি জানাবেন ?

আপনার আগের চিঠির জন্যে অনেক ধন্যবাদ। বীটোভেনতো শুধু একটি নাম মাত্রই ছিলো আমার কাছে। কত কী জানা গেল ! কবে লিখবেন, পশ্চিমী সংগীত গুরুদের নিয়ে বইখানি ? দিশিদের নিয়েও লিখুন না ! খুব ভালো হবে।

কিছুদিন হলো আমি আপনারই মতো "ফড়িংমনা" হয়ে গেছি।"

www.boiRboi.blogspot.com

"ও কার চোখের চাওয়ায়, হাওয়ায় দোলায় মন,
তাই কেমন হয়ে আছিস সারাক্ষণ।
হাসি যে অশ্রুভারে নোওয়া, ভাবনা যে তাই মৌন দিয়ে ছোঁওয়া
ভাষায় যে তার সুরের আবরণ॥
ও কার চোখের চাওয়ায়, হাওয়ায়
দোলায় মন......

এবারে খুব বড় অসুখে পড়বো আমি। শীগগিরই। মন বলছে।

রবীন্দ্রনাথকে মনে করা মানে, পুরোনোকে আঁকড়ে থাকা। অনেকেই বলেন। কিন্তু বরীন্দ্রনাথের বিকল্প কোথায় হলো? এতো কবি, এতো সাহিত্যিক, এলেন গেলেন, তবু রবীন্দ্রনাথ আমাদের মনের মণিকোঠাতে তাঁর নিভৃত আসনে রয়েই গেলেন। যিনি নিজের দাবীতেই থাকেন, পরের মুসাবিদার কারণে নয়; মেডিয়ার নিরন্তর ঢক্কা-নিনাদে নয়, পাঠক-পাঠিকার চোখের জলের আত্মীয়তায়, তাঁকে জোর করে কুলুঙ্গি থেকে ফেলে দেওয়ারই বা দরকার কি?

যার যখন যাবার সময় তখন তিনি যাবেনই। যতদিন তাঁকে আমাদের প্রয়োজন আমরা তাঁকে আঁকড়ে থাকবোই। "আধুনিকতার জন্যেই আধুনিক" হওয়াটার মধ্যে একধরণের "আদিখ্যাতা" ও "অবিনয়" থাকতে পারে অবশ্যই কিন্তু সেটা কোনোদিনও কাম্য নয়।

বিজ্ঞাপন সংস্থাগুলি আর বিজ্ঞাপন, আমাদের প্রচণ্ড ক্ষতি করে যাচ্ছে অবিরত।

এই কথার সারবত্তা আজ যদি কেউ হৃদয়ঙ্গম না করেন, তবে শীগগিরি করবেন। কিন্তু বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে কী ভারতে, যেখানে লুঙি, ধুতি, গামছা আর ছিটের দুটি হাফহাতা শার্ট পরে বছর কাটে গড়পড়তা মানুষের তাদের মনে বিজ্ঞাপনের মডেলদের সাজ-সজ্জা, তাদের বাসস্থান, আসবাব, তাদের উচ্চরবের অলীক জীবনযাত্রা দেখিয়ে যে প্রতিদিন সাংঘাতিক লোভের জীবাণু ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তার প্রভাব "এইডস"এর চেয়েও অনেকই বেশি মারাত্মক। অথচ কেউই এ নিয়ে মাথা ঘামায় না। অবাক লাগে। এই উপমহাদেশের, বিশেষ করে পুরো বাংলার ঐতিহ্য ছিলো "Plain living, high thinking", বিজ্ঞাপনের প্রভাবে সংস্কৃতির একেবারে গোড়াতেই টান পড়েছে। অপ্রয়োজনের প্রয়োজন, অকারণের লোভ; প্রত্যেক অচেতন মানুষকে সর্বনাশের শেষ প্রান্তে ঠেলে দিচ্ছে।

আপনার কি মনে হয় না যা আমি বললাম, তা ঠিক?

আপনাকে দেওয়ার মতো একটি খবর তৈরী হচ্ছে। তবে সে খবর আপনাকে সুখী—করবে না দুখী, তা জানি না। আপনার Acid-Test শীগগিরি নেব।

বরিশালে যেমন বলে না? "ও মনি! তুমি কি আমারে খারাপ বাসো?" সেই রকমই আমি শুধোব আপনাকে এবং যেদিন শুধোব শুধু সেদিনই বোঝা যাবে আপনি আমাকে সত্যি সত্যি কী চোখে দেখতেন!

পড়া তৈরী করুন লেখক মশায়।

পরীক্ষা সমাসন্ন।

ইতি—আপনার ফিরদৌসী

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

তোড়া,

কল্যাণীয়াসু,

বিজ্ঞাপন আর বিজ্ঞাপন সংস্থার ভূমিকা সম্বন্ধে তোমার মতামতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণই একমত। তোমারই মতো, আমিও অবাক হয়ে যাই এ কথা ভেবে যে, এ নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই কেন?

আমাদের দেশ যে কোনোদিকদিয়েই পশ্চিমী দেশদের সঙ্গে তুলনীয় নয়, (অর্থনৈতিক দিক এর কথা বলছি) তাই তাদের যা মানায় আমাদের যে তা মানায় না, এ কথাটা আমরা কবে যে বুঝে উঠতে পারব জানি না!

মাসে মাসেই আত্মহত্যার ইচ্ছেটা মাথা-চাড়া দিয়ে উঠছে।

বড় ঈর্ষা, নীচতা, কৃতঘ্নতা এখানে। এই পৃথিবী আমার থাকার যোগ্য নয়। ভাবি। তারপরেই ভাবি, এতো ভালোবাসি এই পৃথিবীকে! আকাশ, বাতাস, পাখি, ফুল, নারী, প্রজাপতিকে। এতোই ভালবাসি যে, সেই অকৃপণ ভালোবাসার বিন্দুমাত্রও ফেরৎ না পেয়েও আজন্ম ভালোবেসে যাচ্ছি।

আমি যে লেখক, অনেকই কষ্টে যে অর্থকরী বিদ্যা ছাড়া অন্য বিদ্যা বাঁচিয়ে রেখেছি তা কেউই বোঝেনা। সে সবের দাম নেই কারো কাছে কানাকড়ি। কিছুমাত্র কদর বা ইম্পর্ট্যান্সও নেই কারো কাছেই। আমার পিত্রালয়, শ্বশুরালয় এবং আমার নিজের বাড়িতেও আমার কেউ পড়েননা বললেই চলে

যা পেয়েছি তোমাদের কাছ থেকে তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে অশেষই কৃতজ্ঞ আমি। কিন্তু ঈশ্বরই জানেন, কত চোখের জল, কত দীর্ঘশ্বাস, জীবনের কত সুন্দর সময় আমি এই সাধনাতে ব্যয় করেছি। মূল্যের উপরেই যদি প্রাপ্তি নির্ভর করতো তাহলে আমার প্রাপ্তি আরও অনেকই বেশি হওয়া উচিত ছিল।

আজকের সকালটা ঘোর বর্ষার। চারদিক কালো করে ছিলো কাকভোর থেকেই। এখন

www.boiRboi.blogspot.com

নামলো মুষলধারে। বসবার ঘরে আমার স্ত্রী তাঁর গান চাপিয়ে ছিলেন মিউজিক-সীস্টেমে। আমি আমার ঘরে বসে লিখতে লিখতে শুনছিলাম।

আমার স্ত্রী বলে বলছি না, গানটি তিনি ভালোই গান। আমার তরফে কারো প্রতি গুণগ্রাহিতার কোনোই অভাব কোনোদিনও ঘটে নি। নিজে আজও গুণী হতে পারলাম না। কোনোদিনও হতে পারবো কি না, তাও অজানা। তবে গুণগ্রাহী যে হতে পেরেছি এই তো অনেক !

এ দেশে গুণীর সংখ্যা বড় বেশি হয়ে গেছে আর গুণগ্রাহী নেইই বলতে গেলে। উল্টোটা হলেই ব্যাপারটা সুখের হতো। তাই গুণগ্রাহী বলে আমি অশেষ গর্বিত।

পূজা পর্য্যায়ের গানটি, আমার আজকে সকালের মনের অবস্থা, আকাশের এই কৃষ্ণা, ক্রন্দনরতা রূপ, সব মিলে মিশে চোখ দুটি একেবারে দ্রব হয়ে এলো।

"বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে
শূন্য ঘাটে একা আছি, পার করে নাও খেয়ার নেয়ে॥
ভেঙে এলেম খেলার বাঁশি, চুকিয়ে এলেম কান্না হাসি
সন্ধ্যাবায়ে প্রান্তকায়ে ঘুমে নয়ন আসে ছেয়ে॥
ও পারেতে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল রে,
আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির পরে।
এসো এসো প্রাপ্তিহরা, এসো শান্তি সুপ্তি-ভরা,
এসো এসো তুমি এসো, এসো তোমার তরী বেয়ে।"

জানিনা আমার স্ত্রী এই গানটিই বাজিয়েছিলেন কেন ?

হয়তো তাঁর মনও খারাপ ছিল। হয়তো আমাহেন ঘর-কুনো, সর্বক্ষণ হুংকার-তোলা, নির্গুণ নিরূপ অপদার্থ স্বামীরই কারণে তাঁর এই মন খারাপ।

নিজের জন্যে দুঃখ করব কী, তাঁর দুঃখেই চোখ জলে ভরে এলো।

আমি একটা যাচ্ছেতাই। আমার মুক্তির বা খেয়া পারাপারের কোনো আশাই নেই। জানি না, ছুটি কবে হবে, কবে শ্রান্তিহরা শান্তি, সুপ্তিভরা নেয়ে এসে খেয়া পার করাবেন ! ভালো থেকো।

ইতি—লেখক।

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

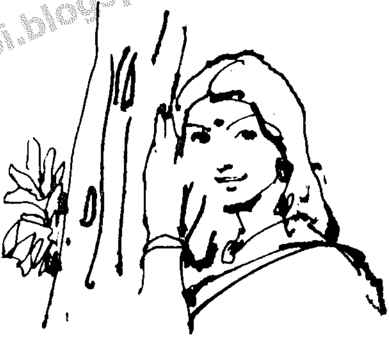

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ।

বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯

তোড়া,

কল্যাণীয়াসু,

হর্জর উদ্ভট নাম হতে পারে কিন্তু অলীক নয়।

কোচবিহারের ইতিহাস পড়লে জানতে পারবে যে, নবম শতাব্দীতে কোচবিহারের রাজা ছিলেন নরকবংশীয় হর্জর। ইতিহাসে অবশ্য তৎকালীন বানান অনুযায়ী বানান ছিলো "হৰ্জ্জর"।

তাঁর স্ত্রীদের নাম ছিলো, তারা, মঙ্গলশ্রী অথবা শ্রীমওরা। আসামের তেজপুরের প্রস্তরলিপিতে (৫১০ গুপ্তাব্দ, ৮২৯ খৃস্টাব্দ) হর্জর বর্মার "হারুপ্লেশ্বর" চিহ্নিত রাজগণের খোদিত লিপি আবিস্কৃত হয়েছিলো।

খানচৌধুরী আমানতুল্লা আহমেদ সাহাবের রচিত কোচবিহারের ইতিহাস একটি অত্যন্ত মূল্যবান বই। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে। সাম্প্রতিক অতীতে মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩ এই বইটির পুনর্মুদ্রণ করে সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

মাঝে মাঝে মনে হয়, ইংরেজরা দুশো বছরের জন্যে মাঝে এসে ভারতীয়দের মূল ভারতীয়ত্ব থেকে অনেকই দূরে সরিয়ে দিয়ে গেছেন। বাংলা তো আমাদের মাতৃভাষা। তাতো আমরা শিখবই। তার জন্যে গর্বিতও থাকবো সবসময়েই। কারণ, বাংলার মতো ভাষা তো বেশি নেই! কিন্তু ভারতীয় হিসেবে (এই উপমহাদেশের সকলকেই বোঝাচ্ছি) প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের সংস্কৃত, উর্দু এবং ফারসী এই তিন ভাষাই অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত ছিল। এই তিনভাষার অনভ্যাসে আমরা শিকড়হীন কচুরিপানার মতোই হয়ে গেছি। অথচ শিকড় আমাদের একদিন কতো-না গভীরে প্রোথিত ছিল! ভাবলেও দুঃখ হয়।

পশ্চিমের গড়পড়তা শিক্ষিত মানুষ, যাঁরা লেখাপড়ার কারবারী; তাঁরা সকলেই ন্যূনপক্ষে তিনটি ভাষা জানেন। ইংরিজি, জার্মান এবং ফ্রেঞ্চও। যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা দু একটি

পূর্বী ভাষাও জানেন।

শিশুকাল থেকে রপ্ত করলে ভাষা শিক্ষাটা এমন কিছু কঠিন কাজও নয়।

আমাদের দেশের রাজা-মহারাজাদের পরিবারের যে-কেউ কম পক্ষে পাঁচ-ছ'টি ভাষা জানেন। কারণ, ধরো মা বাঙালী, বাবা ওড়িয়া, পিসেমশাই মারাঠী, ছোট মেসো পাঞ্জাবী, কাকিমা তামিল, জেঠিমা কঙ্কনী ; এইরকম।

এবার তোমার অন্য প্রশ্নর উত্তর দিই। 'অববাহিকা' উপন্যাসটি মাথায় আসে শান্তিনিকেতনের চাবিঅলা দাউদ শেখকে দেখে। মানুষটি কিন্তু বাস্তবে আছেন। শান্তিনিকেতনের মেয়েদের হস্টেল "শ্রীসদনের" সামনে তাঁকে দেখতে পাবে, যদি যাও। নিয়মিতই বসে থাকেন। কী করে তিনি জেনেছেন জানিনা, কিন্তু অবশ্যই জেনেছেন যে, চাবির গোছা মেয়েদেরই সম্পত্তি। অতএব মেয়েদের চাবি-হারানোটাই নিত্য-ঘটনা। তা নইলে, তিনি তো আশ্রমের বড় গেটেই বসে থাকতে পারতেন।

অবশ্য বিশ্বভারতীরও অনেক কাজই করেন।

আমার গডরেজের আলমারীর চাবি হারিয়ে গেছিল। আলমারীর ভিতরের লকারের। তাতে কী যে রেখেছিলাম, তা মনে ছিলো না। লকারেতো ভদ্রলোকে দামী জিনিসই রাখেন। তা দাউদকে ডেকে পাঠিয়ে দু'দিনের কসরতে চাবিতো খুললো। খোলার পর দেখি, দাউদও সবিস্ময়ে দেখেন ; এক জোড়া পুরোনো চটি রাখা আছে লকারের ভিতরে। আমিই রেখেছি।

দাউদ হেসে বাঁচে না।

ভারী ভাল মানুষ দাউদ, খাঁটি মানুষ ; আগের প্রজন্মর।

এই সব কারণেই আমার স্ত্রী মাথায় হাত দিয়ে প্রায়ই বলেন, হায় রে ! কত পাপ থাকলে গতজন্মে, এমন মানুষকে বিয়ে করি !

জবাবে আমার কিছু বলার নেই। ছিলোও না কোনোদিন। "সবই নেব্বন্দ"।

গতরাতে বিড়লা সভাগৃহে সেতারী দেবু চৌধুরীর বাজনা শুনতে গেছিলাম। আসলে পদ্ম ভূষণ পাবার কারণে দেবুকে সম্বর্ধনা দেওয়াও হলো সেদিন। কী একটি অপরিচিত সংগীত গোষ্ঠী দিলেন। নাম মনে থাকে না। দেবুই কার্ড পাঠাতে বলেছিলো, তাই নেমন্তন্ন।

জানিনা, এই সব সরকারী খেতাব ও পুরস্কার কেন প্রকৃত গুণীরা গ্রহণ করেন ! উস্তাদ কালে খাঁ-র কথা মনে পড়ে যায়। "গুণীওমে এক সে এক হ্যায়। আল্লাহি জানে হরেক ইনসান্‌কে দিমাগ কিস্ কদর লায়েকিসে ভরা হুয়া হ্যায়। ফির হমারে আপকে কহনেসে ক্যা হক্ক হ্যায়।"

কোন মাণদণ্ডে মেপে যে ওঁরা এক গুণীকে সম্মান দিয়ে অন্যদের অসম্মানিত করেন ! তাছাড়া পরম্পরাই বা ঠিক করেন কি করে ?

তবে দেবু এই খেতাব পাওয়াতে আমি স্বাভাবিক কারণেই খুশি হয়েছি। তবে প্রত্যাখ্যান করলে আরও বেশি খুশি হতাম।

দেবু এখন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের "ডীন"। দেবুর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ১৯৫৭ তে। এক বছর হলো বি. কম. পাশ করে ইন্টারমীডিয়েট সি. এ. পরীক্ষাতে বসে বর্ষাকালে গোপালের সঙ্গে হাজারীবাগে গেছি। ফল বেরুবে মাসদেড়েক পরে। সেই

www.boiRboi.blogspot.com

প্রথমবার "পূর্বাচল"এ যাওয়া।

তখন হাজারীবাগ যে কী শান্তির, সুন্দর জায়গা ছিলো ! আর বর্ষার হাজারীবাগ ! বর্ষাতে যেতে হয় সাঁওতাল পরগনা ও পালামৌতে, নয়তো সমুদ্র পাড়ে। অথবা মাণ্ডুতে, খাণ্ডালাতে।

সন্ধে সন্ধেহই খাওয়া-দাওয়া সেরে "পূর্বাচল" এর বসবার ঘরের উঁচু ফরাসে বসে দেবু বাজাতো। শ্রোতা আমি আর গোপাল। আর ফিসফিসে বৃষ্টিতে ভেজা নির্জন প্রকৃতি।

বাগেশ্রী অথবা দুর্গা বা মান্দ অথবা শংকরা বা কাফি দিয়ে শুরু করতো। এক একদিন এক এক রাগ। তারপর রাত যত বাড়তো তারই সঙ্গে সঙ্গে তিলোক-কামোদ বা দেশ, বাগেশ্রী বা মারু-বেহাগ, ঝিঞ্ঝোটি বা মালকোষ এ গিয়ে পৌঁছতো।

বাজনা শুনতে শুনতে হুঁশ থাকতো না। পুবে আলো ফুটে যেত কোনো কোনো দিন।

সেই সব রাতজাগা ভোরে ললিত বা যোগিয়া বা বিভাস দিয়ে শেষ করতো দেবু। ভৈরবীও কোনো কোনোদিন। তারপর এগারোটা অবধি ঘুম। চমনলাল চা নিয়ে এসে পশ্চিমের বারান্দার বেতের টেবলে রাখলে চা খেয়ে আমরা মোরগা, তিতিরের সন্ধানে গোপালের ট্রায়াম্প গাড়ি নিয়ে গুলি-বন্দুক নিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতাম। নয়তো ওয়াটারপ্রুফ গায়ে দিয়ে মাথায় টুপি চড়িয়ে মুখে পাইপ গুঁজে (পাইপে তখন সবে রপ্ত হচ্ছি) ফিসফিসে বৃষ্টিতে গয়া রোডের দিগন্ত বিস্তৃত মোরব্বা ক্ষেতে খরগোসের খোঁজে বেরোতাম। পায়ে হেঁটে হেঁটে। পালসা।

পালসা, মানে পায়ে হেঁটে শিকার। পাল্‌সা নামের একটি গল্পও আছে আমার। বহুবছর আগে লেখা।

দেবু যেতো না। বাইরের বারান্দায় বসে রেওয়াজ করতো। দেবুর গুরু ছিলেন উস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ সাহাব। দেবুর মতো গুরুভক্তি যে-কোনো ডিসিপ্লিনেই কম ছাত্রের মধ্যেই দেখেছি। এবং এরকম সাধনা করতেও বেশি ছাত্রকে দেখিনি।

দেবুকে আজও দেখলে আমাদের চেয়ে ছোট মনে হবে। কিন্তু দেবু বয়সে বড়। চেহারাটি সুন্দর রেখেছে।

এতো বছর পরে বড় ভাল লাগলো ওর বাজনা শুনে। অনেক পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল। গোপালের কথা, চমন এর কথা। ওরা তো নেই।

দিল্লিতো যাই প্রতি মাসেই। কিন্তু সময় কি পাই যোগাযোগ করার ?

বাজনা ও গান এমনই এক জিনিস যা হৃদয়ে বিঁধে থাকে।

১৯৫৬ তে পুজোর সময়ে শিলং এ গেছি বাবা-মায়ের সঙ্গে। "পাইনউডে" জায়গা পাওয়া যায়নি, "পীক হোটেলে" আছি। ঐ সময়ে এই পীক হোটেলেরই একটি ব্রাঞ্চ ছিলো মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে। তখন দুই হোটেলই ভাল ছিল। পরে ট্রাইব্যুনালে কেস করতে কম করে তিরিশ বার শিলঙে এসেছি। "পাইনউড"এই থাকতাম। কী ভালো ছিলো তখন ম্যানেজমেন্ট ! কী ভালো খাওয়া। কী আনারস ! শিলেট থেকে আনা ইলিশের স্মোকড-হিলসা, ক্যালকাটা ক্লাবেও অমন হয় না। শিলং ক্লাবে টেনিস খেলতাম। বেঁটে বেঁটে ঘোড়াদের দৌড়ানো দেখতে ছুটির দিনে রেস কোর্সে যেতাম। যদিও জিতিনি একদিনও।

সে একটা সময় গেছে! চোখ ছিলো সুন্দর। যা-কিছু দেখতাম, তাই সুন্দর দেখাতো।

সেবার নবমীর দিন রামকৃষ্ণ মিশনের পুজো দেখতে গেছি সকালে।

একটি বাইশ তেইশ বছরের ছেলে, আমার চেয়ে একটু বড়, একটি গান গাইলো। "নবমীর নিশিগো তুমি আজ যেন ফুরায়ো না, দুখিনী মায়ের বুকে আর ব্যথা দিও না" আগমনী গান। গানটি যেন ছুরির মতো বুকে বিঁধে গেল। HAUNT করেছে এতোবছর। ১৯৮৭ তে চণ্ডীবাবু, শ্রী চণ্ডীদাস মাল মশায়ের কাছ থেকে গানটি তুললাম, ফ্রাঙ্কফুর্টে বাঙ্গালীদের পুজোর নেমন্তন্নে যাওয়ার আগে। ওখানের বইমেলাও ছিল তখন।

এটি এবং আরো ক'টি আগমনী গান তুলে নিয়েছিলাম সেবারে।

আলমোড়ায় গিয়ে ক'দিন ছিলাম একা ১৯৫৪ তে। তখন থার্ড ইয়ারে কী সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। রামকৃষ্ণধামে প্রায় রোজই যেতাম সন্নাসীদের ভাল ব্যবহারের জন্যে। আর ওঁরা প্রায়ই খেয়েও যেতে বলতেন। ছাত্র-পর্যটকের পয়সাও বাঁচতো। অতি সাধারণ খাওয়া। কিন্তু কী ভালোবাসার সঙ্গে সেই খাদ্য পরিবেশন করতেন ওঁরা। দু বেলা মল্লি বাজার আর তল্লি বাজারের সিঁড়ি দিয়ে উঠে নেমে যা খিদে হতো তা বলবার নয়। তাই খেতামও পরিমাণে নেহাৎ কম নয়।

অনেক জায়গার হিমালয়ই দেখেছি। জার্মানীর, সুইটজারল্যান্ডের আল্পসও দেখেছি। আফ্রিকার কিলিম্যানজারো দেখেছি। জাপানের মাউন্ট ফুজি। ইটালির পীরিনিজ। কিন্তু আলমোড়া অঞ্চলের হিমালয়ের মতো ন্যাড়া, ভৌতিক পর্বত খুব কমই দেখেছি। সকালে এর সুউচ্চ চুড়ো এবং গাছের এক রূপ, দুপুরে আরেক রূপ। আর সন্ধে নামলেই অন্য রূপ।

একদিন সন্ধেবেলা চলে আসছি মহারাজদের সঙ্গে গল্পগুজব করার পর। বড় মহারাজ বললেন, বসুন বসুন একটু পরেই সজ্জনবাবুর ভজন হবে।

কে সজ্জনবাবু আর কী ভজন তখন জানি না। তবে ভ্যাগাবন্ড ছোকরা, বসে গেলাম। কাজতো, দু টাকা চার আনার হোটেলে গিয়ে পাশের হালুইকরের দোকান থেকে পুরী আর রাবড়ি খেয়ে ঘুম লাগানো!

ধূপ-ধূনোর গন্ধে ঘরটি ম' ম' করছিলো। সজ্জনবাবু এসে পৌঁছলেন। তখন তার বয়স হবে চল্লিশ টল্লিশ। অন্ধ ভদ্রলোক। দুজন ছাত্র ধরে ধরে নিয়ে এলো। ওরাই বসে দু দিক থেকে জোড়া তানপুরা বেঁধে নিয়ে ছাড়তে লাগলো। সেই সুরে বাঁধা জোড়া তানপুরার ঝিনি ঝিনি শব্দেই যেন ভেসে ভেসে অদেখা কিন্তু বহুশ্রুত মায়াবতীতে পৌঁছে গেলাম।

সজ্জনবাবু গান ধরলেন। "বস্‌সো মেরে নয়নানোমে নন্দলালা"। তার পরে "খোঁজহে খোঁজহে তুমহে কানাইয়া মুঝে নয়নাধারে"। একটি গানে নন্দলালাকে আঁখিতে এসে বসার আকুতি জানাচ্ছেন বার বার আর অন্যটিতে বলছেন তোমাকে বারে বারে চোখের কোণে দেখার চেষ্টা করছি।

আহা। সেই নয়নহীন গায়কের তার পূজ্য দেবতাকে নয়ন দিয়ে দেখার যে কী তীব্র আকুতি। পাথরের বুক ফেটেও যেন জল বেরোয়।

যখন চলে আসছিলাম, নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে নিচে দেবাদিদেব আদিগন্ত হিমালয়ের দিকে চাইলাম কৃষ্ণপক্ষের নক্ষত্রজ্যোৎস্নায়, মন যেন বলে উঠলো কোনোদিন যদি সীরিয়াসলি

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

গান গাই তবে যেন এমন করে গাইতে পারি যাতে শ্রোতার চোখের জল বাঁধ না মানে।

আরেকবারের কথা মনে আছে। তখন আমি শিশু। পুজোর বা গরমের ছুটিতে কলকাতা থেকে রংপুরে যাচ্ছি। থার্ডক্লাস কম্পার্টমেন্টে জানালার পাশে বসে আছি মধ্যরাতে। দেখার যেন শেষ ছিলো না। অন্ধকার রাতেও রেলগাড়ির জানালার পাশে বসে চেয়ে থাকতাম। পৃথিবী কত যে বড়, কত কিছুকেই যে রেলগাড়ির জানালা অতিক্রম করে যায় ; তা ভাবলেও রোমাঞ্চিত হতাম। এখনও হই। যদিও ট্রেনে চড়ারসুযোগ হয়নাএখন।

পোড়াদহ স্টেশনের নির্জন প্ল্যাটফর্মে নীলাভ-হলুদ গ্যাসের বাতির তলায় একজন অন্ধ এবং খঞ্জ গায়ক দাঁড়িয়ে গাইছিলেন, "পাগলা মোনা, পাগলা মোনা, পাগলা মোনারে...." গানের আর কোনো কলি আজ আর মনে নেই। কিন্তু সেই গায়কের গলার তীব্র আর্তি হৃদয়ে এখনও বাজে। তখন আমার বয়সই বা কত ! সাত কী আট হবে।

ভালো গান শোনা এক অভিজ্ঞতা। একবার এক লহমার জন্যে শুনলেও তা আজীবন নিজের মধ্যে কাজ করে, নিজেকে ভালোবাসতে শেখায়, কাঁদতে শেখায়, মানুষ হিসেবে নিজেকে সমৃদ্ধতর করে।

হাজারীবাগ থেকে যে পথটি চলে গেছে সীমারীয়া তারই মাঝে টুটিলাওয়া বলে একটি ছোট্ট জায়গা পড়ে। টাটিঝারিয়া অন্য দিকে। বগোদরের পথে।

সেই টুটিলাওয়ার জমিদার ছিলো গোপাল সুব্রতদের বন্ধু ইজাহারুল হক সাহাব। সেই সুবাদে আমারও বন্ধু। তরুণ বয়সে মারা যায় ইজাহারুল। ভালো শিকারী ছিল।

একবার ডালটনগঞ্জ থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছি চান্দোয়াটোড়ি হয়ে বাঘড়া মোড় হয়ে সীমারীয়া টুটিলাওয়া হয়ে, হাজারীবাগে। পুজোর ঠিক পরে পরেই। গোপালরাও হাজারীবাগে এসেছে। সেখান থেকেই ফোন করেছিল যে, চলে এসো। দুতিনটে দিন অন্ততঃ থেকে যাও ফেরার পথে। ক্বোস্মাতে বীটিং-শিকার হবে।

জানতাম না যে, ইজাহারকে গোড় দেওয়া হয়েছে হাজারীবাগেরই বড় গোরস্থানে। জানতাম না বলেই ভেবেছিলাম, টুটিলাওয়াতে মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে যাই ইজাহারের কবরে। গাড়ি পার্ক করিয়ে নামলাম। ওদের ছোট্ট বাড়ি বন্ধ ছিলো। চওকিদার, খাদিম ; খিদমদগার কেউই ছিলো না। একটি বাচ্চা ছেলে ছিল চবুতরাতে বসে। তাকে ফাৎমান দেখাতে বলায়, সে নিয়ে চললো।

এই ফাঁকে বলে নিই, "বনবাসর" গল্প সংকলনে একটি গল্প আছে "ঈশক্কী আন্দাজ"। সেই গল্পটির পটভূমি এই টুটিলাওয়া। যদিও গল্পে "টুটিলাওয়াকে" "মুলিমালোয়া" বলে উল্লেখ করেছি, যেমন "কোজাগর"এ মারুমারকে "ভালুমার", "কোয়েলের কাছে"তে "কুমাণ্ডিকে" "বুমাণ্ডি"।

আমার সঙ্গে ভূতো ছিলো। "জঙ্গলমহলের" "গাড্ডি লাজোয়াবের নোটোরিয়াস ভূতো। ভূতনাথ সরকার।

জঙ্গলের মধ্যে সেই সুন-সান্নাটা ফাৎমানএ আমাদের নিয়ে গিয়ে তো পৌঁছল ছেলেটি। ছেলেটির নাম এনায়েৎ। আজও মনে আছে। লাল-কালো চেকচেক-লুঙি। মাথায় একটি সাদার উপর কালো কাজ করা টুপি। ফুটোফুটো কাপড়ের একটি হাতকাটা গেঞ্জি। ছাগল

চরাচ্ছিলো, তাই হাতে পাচনবাড়ি। সে একা কোথাও যায় না। সঙ্গে সঙ্গে তার কালো সাদা পাটকিলে ছাগলের দল, ধাড়ি বাচ্চা মাদী মদ্দা সব চললো খচর-মচর শব্দ করতে করতে। যা পেলো পথে, তাই মুড়িয়ে খেতে খেতে।

পৌঁছে দেখি, মাজারের পাশে একটি বড় কালো পাথরের উপরে একজন অতি বৃদ্ধ মানুষ বসে আছেন। সাদাকালো চেক-চেক লুঙি, নীল রঙা একটি বগল ছেড়া ফুলশার্ট। হাতের পাশে লাঠি।

জায়গাটা প্রাচীন সব বুনো আম আর তেঁতুলে ভরে ছিলো। মাঝে মাঝে জংলী হরজাই গাছ। পঁইসার, পন্নন, গাম্হার, খয়ের, পলাশ; বড় বড়। আর একটা প্রাগৈতিহাসিক শিমুল। নীচে এতোই ঘন পুটুসের জঙ্গল যে চিতাবাঘের আড়ৎ হতে পারে সেখানে। ছাগলগুলোর হাব ভাব দেখে মনে হলো তারাও আমারই মতো চিতাবাঘের কথাই ভাবছে।

ভূতো বললো, দাদা, খালি হাতে আসাটা উচিত হয়নি। সব যন্ত্রগুলো গাড়িতে রেখে এলেন। এদিকে ধাড়ি চিতা আমার আর আপনার চামড়া ট্যান করিয়ে কাঁধে ফেলে সীমারীয়ার হাটে যাবে ডাঁটের মাথায় অন্যদের দেখাতে।

বললাম, কবরখানায় এসে কেউ অশান্তি করে? একটু চুপ করোতো! ইজাহারের আত্মার জন্যে শান্তি কামনা করো।

ভূতো বললো, ও যা লোক ছেলো। যেখানে গেছে, সেখানেই হল্লা মার্চিয়ে দিয়েছে। জোর, শোর। শান্তি আর ইজাহার মিঞা নর্থ আর সাউথ পোল। ওর কবরে ক্যানেস্তারা বাজানো উচিত। যোগাড় হলে হতো একটা!

ইজাহারের সঙ্গে গোপালের ঘনিষ্ঠতা আমার চেয়ে অনেকই বেশি ছিল। ভূতোরও। কারণ, ওরা আমার চেয়ে অনেকই বেশি আসতো হাজারীবাগে। তাই ভূতোর ইজাহারের উপরে হরগিজ্ হক্ আছে বলেই চেপে গেলাম।

সেই যে বৃদ্ধ, চোখে পিচুটি, খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি, মুখে মহুয়ার গন্ধ; তিনি বললেন, তোমরা কে?

ভূতো বললো, দোস্ত। ইজাহার এর। তারপর ডান হাতের তর্জনী বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর মধ্যমার মধ্যে আড় করে রেখে, ইঙ্গিতে বন্দুক দেখিয়ে বললো; শিকার কা দোস্ত।

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন দু পাশে। আর কিছুই বললেন না। বোঝা গেল, চেনেন না।

আমি মোমবাতি জ্বালালাম। ভূতো লাতেহার থেকে কৃষ্ণচূড়া ফুলের ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এসেছিলো গোরস্থানে দেবে বলে। সেগুলো নামিয়ে রাখলো। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

এমন সময়ে বৃদ্ধ হঠাৎ নিচু স্বরে খালি গলায় পাখির ডাক আর শরতের হাওয়ার ঝুরুঝুরু করে ওড়া শুকনো পাতার "OBLIGATO"র পটভূমিতে গান ধরে দিলেন। সে কী গান তোড়া! তোমাকে কী বলব! সুর যদি প্রতিটি পর্দাতে ভরপুর থাকে, আরোহন আর অবরোহণে, ভাব আর বন্দিশ যদি ঠিকঠাক থাকে আর গলা যদি মোটামুটিও থাকে, তবেই সে গান তোমাকে হালাল করে দেবে নিপুণ কসাইএর মতো। আঁড়াই-প্যাঁচ মেরেই থামবে না সে, ক্রমাগত প্যাঁচ মারতে থাকবে আর তুমি হয় জবা-করা মোরগার মতো বার বার অধীর যন্ত্রণায় উৎক্ষিপ্ত, উৎসারিত হতে থাকবে সুরের দুনিয়াতে; নয়তো শিকারে, গুলিতে-

আহত করে তারপর জবা-করা শম্বরের মতো দুচোখ উজ্জ্বল বিস্ফারিত করে সমর্পণে স্থির হয়ে যাবে।

গানকে ভালোলাগার এই দুরকম হয়।

বৃদ্ধের মুখের মধ্যে এমন এক প্রশান্তি, কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য বাসনা দুনিয়ায় যা-কিছু লেনা-দেনা আছে সব কিছু মিটিয়ে নিয়ে মানুষ যখন খুদাহর দুয়ার আশাতেই বসে থাকে, দুয়া মাঙবে বলে দীর্ঘ এবং প্রলম্বিত করে খুট্‌বাকে ; তেমনি করে বৃদ্ধ চেয়েছিলেন সেই শিমুল গাছটার দিকে। একটি একটি করে লব্‌জ্‌, একটু একটু করে সুর, একটু একটু করে লয়, একটু একটু করে তাল, একটু একটু করে ভাব সব মিলিয়েমিশিয়ে অতি ধীরে ধীরে পেশ করতে লাগলেন তিনি। যেন মাজারের সামনে সুরের অদৃশ্য আলপনা দিচ্ছেন বৃদ্ধ। "বন্দিশ" কাকে বলে তা জানতে হলে, এমন পরিবেশে, এমন গানই শুনতে হয়!

একটু পরেই রঙেরই মতো সুরের একটি আস্তরণ পড়তেই গানের মুখটি স্পষ্ট হলো। হেসে উঠলো। আহা ! যেন গহরজান বাঈজীর মুখ। আর স্পষ্ট হতেই বুঝতে পেলাম যে এতো আমার শোনা শের।

"ইস্ ইশ্‌ককে মখতব্‌মে মিলতা হ্যায় সবখ্ পহলে।
গর বুসলকি খ্বাবিশ হো তো হস্‌তীকো ফনা কর্ না॥"

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার ঠিক পেছনে একটি মস্ত আমলকি গাছ ছিলো। ঝুরুঝুরু করে শারদ হাওয়াতে তার পাতা ঝরছিলো। আমাদের মাথায় গায়ে এসে পড়ছিলো। মোমবাতির আগুনের শিখা নিভে যায়, নিভে যায়। ভুতো তার দুটিহাত, তার গলা আর বুক, যেন তার সর্বস্ব দিয়ে সেই অগ্নিশিখাকে হাওয়া থেকে আড়াল করবার চেষ্টা করছিলো।

ওর দিকে চেয়ে আমার সেইক্ষণেই মনে হলো যে, একেকজন মানুষের ভালোবাসার প্রকাশ কত ভিন্ন ভিন্ন রকমের হয় ! ইজাহারকে আমিও কম ভালোবাসতাম না। কিন্তু আমার ভালোবাসার রকমটা, প্রকাশটা এক ; ভুতোরটা অন্য।

এই সহজ কথাটা যদি আমরা সকলেই বুঝতাম তবে ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রী বাবা-ছেলে মা-মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা কত বেশি মধুর হতে পারতো !

বৃদ্ধর গান তখন এই গভীর জঙ্গলের মধ্যের ফাৎমানএ এক আশ্চর্য পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলো। সুর যদি লাগে গানে, তবে তা করতে বাধ্য ; বিয়ের আসরেই হৌক, কী শ্মশানে।

শেরটির তর্জমা করলে এরকম দাঁড়ায়। প্রেমের এই ইস্‌কুলে প্রথম পড়া এই করতে হবে যে, যদি মিলনের আশা রাখো, তবে নিজের বলতে যা কিছুই আছে, তোমার আমিত্ব, মমত্ব, সবকিছুই মিটিয়ে চুকিয়ে দিতে হবে। একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে দেউলে হয়ে যেতে হবে। তবেই তোমার সব শূন্যতা পূর্ণ করতে প্রেম, আসলেও আসতে পারে।

এই শায়েরটি প্রেমের শায়ের। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম যে ঈশ্বর-প্রেমও তো প্রেম, আল্লার প্রেমও তো প্রেম ; সবচেয়ে বড় প্রেম। তারচেয়ে বড় আর কোন প্রেম আছে ?

বৃদ্ধকে, একটি কুড়িটাকার নোট পার্স থেকে বের করে দিতে গেলাম, গান শেষ হলে বৃদ্ধ ইনকার করে দিলেন। ধীর-স্থির কণ্ঠে বললেন, বেটা, মসজিদে আর ফাৎমানে কখনওই টাকা দেখিও না। ও জিনিস বড় খারাপ জিনিস। মানুষের অহং, ঘামণ্ড, হামবড়াই ভাব

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

বাড়ায়।

১৯৬৫তে কুড়িটাকার দাম অনেক ছিলো।

আমি শিখলাম। এখন জানি যে, কোথাও কোথাও, কোনো কোনো সময়ে, কোনো কোনো মানুষের কাছে টাকা, কাগজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

ভূতো কিন্তু শিখলো না, বললো, দাদা আমাকে দিন। ওল্ডমংক রাম এর একটা পাঁইট হয়ে যাবে।

মাধুকরীর যে ভুচু, সে পুরোপুরিই কল্পিত চরিত্র। কিন্তু এই ভূতোর, (যার পেশা মোটর মেরামতী,) সঙ্গে ভুচুর কিছু কিছু মিল অবশ্যই আছে।

বৃদ্ধর নাম জানা হলো না, ধাম জানা হলো না। কিন্তু যখনই রাঁচী হাজারীবাগ ডালটনগঞ্জ, লাতেহার, টোড়ি, মহুয়ামিলন, টেবো, মূরহু, বুণ্ডু, চক্রধরপুর বা খুঁটিতে যাই শরতকালে ; যখনই আমলকি পাতা ঝরে, ঝুরুঝুরু হাওয়ার শব্দ কানে আসে, আর কোনো ফাৎমান, বা শ্মশান বা সাসানডিরির কাছে পৌঁছোই তখনই আমার সেই বৃদ্ধর কথা মনে পড়ে।

'ইস ঈশক্‌কো মখ্‌তবে সবখ্ পহলে
গর বৃসলকি খ্বায়িস হো তো হস্‌তীকো ফনা কর্‌না॥"

ভালো থেকো।

ইতি—লেখক

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

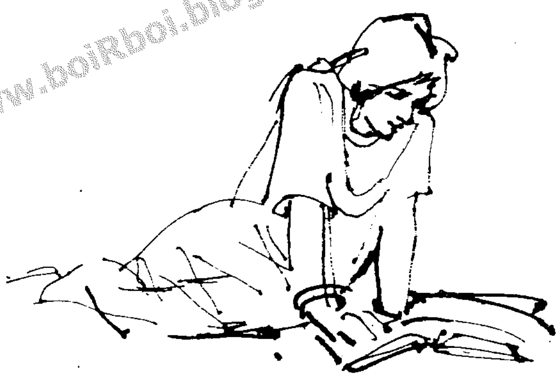

ফিরদৌসী আখতার
ধানমন্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ

" "

লেখক,

সকাল থেকে এলোমেলো উথাল-পাতাল হাওয়া চলেছে। শুকনো পাতারই মতো মনকে ভারশূণ্য করে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আবার পরক্ষণেই পাড়া-বেড়ানো শেষ করে ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। যখন ফেরৎ পাচ্ছি মন, তখন দেখছি যে তা এত ভারী যে তাকে নড়াতে পর্যন্ত পারছি না।

আজকে আমার ছুটি। এখানে ব্যাঙ্ক-হলিডে। সকালে চা-জলখাবার খেয়ে বিছানাতে আলসেমি করে শুয়ে শুয়ে আপনার চিঠিগুলি উল্টে পাল্টে দেখছিলাম। কম চিঠি লেখেননি কিন্তু আপনি আমাকে! কখনও মনে দুঃখ হলে সারাদিন আপনার চিঠি পড়েই দিন কেটে যেতে পারে। খাটের সঙ্গে একটি মস্ত আয়না আছে। নীলামে কিনেছিলাম খাটখানি। জানিনা, কোন পুরুষ তার সঙ্গে লীলা খেলার সাক্ষী হিসেবে এই আয়নাকে চেয়েছিল। কিন্তু আমি আপনার চিঠি পড়তে পড়তে সেই আয়নাতেই বেশ লক্ষ করছি যে, আমার মনের ভাব আজ সকালের আকাশের **রঙেরই** মতো ক্ষণে ক্ষণে পালটাচ্ছে। কখনও হাসি হাসি, কখনও গম্ভীর, কখনও দুঃখ দুঃখ। জানিনা, আমাদের এই চিঠি-চালাচালির খেলা, হিন্দুদের বিয়ের কড়ি-চালাচালির মতো ; কতদিন চলবে?

আচ্ছা! এর কী কোনেই গন্তব্য নেই! শুধু চিঠি লেখার জন্যেই কি কেউ কারোকে চিঠি লিখতে পারে এতো! আমি যে প্রায় একতরফাই আপনাকে লাগাতার প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে রাখি! আর আপনি?

প্রতিবাদ তো করেনই না উল্টে হাসিমুখে আমার সব জিজ্ঞাস্যরই উত্তর দেন, আর কী সুন্দরভাবেই না তা দেন, দিনের পরে দিন ; তা দেখে, আমার কেবলি জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয় যে, আপনি এই আবদার রাখতে ক্লান্ত হননা?

ভাবি, আপনি কত কিছুই আমাকে দিলেন, এখন আমি বদলে কিছুই দিতে পারলাম না আপনাকে! খুসি করতে পারলাম না।

www.boiRboi.blogspot.com

নিরানব্বই ভাগ পুরুষ, তাদের বয়স নির্বিশেষে, মেয়েদের কাছ থেকে যা পেলে ললিপপ্ বা বুড়ির চুলেরই মতো বিশ্বচরাচর ভুলে তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং বারবার বলেন কী কৃতজ্ঞ ! কী সুখী ! করলে আমাকে ; আপনাকে সেই সব দিয়ে খুশী করা যে সম্ভব নয় কোনো নারীরই পক্ষে, তা আমি ভাল করেই জানি। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে থেকেই জানতাম। আপনি নিরানব্বুই ভাগ পুরুষের দলে পড়েন না। এক ভাগ পুরুষের দলে পড়েন। আপনারাও এক শৃঙ্গ গণ্ডারের মতোই দুপ্রাপ্য বলেই আপনাদের নিয়ে দুশ্চিন্তাও কম নয়।

মাঝে মাঝেই ভাবি যে, যদি আমার জীবন অন্যরকম হয়ে যায়, মানে, যদি আমি আরও দশজন মেয়ের মতোই অবিবাহিত, একা থাকার, পূণ-স্বাধীনতার জীবনে হঠাৎই ছেদ টেনে খুব সুখী হব এমন "উইশফুল-থিংকিং"-এ বিশ্বাস করে "থোড় বড়ি খাড়া" "খাড়া বড়ি থোর" এর জীবনে ভিড়ে যাই, ভিড়ের একজন হয়ে ; তাহলে কি হবে ?

আমার আর আপনার এই চিঠির সম্পর্ক কি শুধু আমার আতরদানীর সুগন্ধরই মতো শাদী আর ঈদেই ব্যবহৃত হবার জন্যে পড়ে থাকবে মহার্ঘ্য কোণে ! ভাবলেও কষ্ট হয়।

সে বড় দুঃখের হবে।

তাই না ?

তবে একটা কথা বুঝি। তা হচ্ছে, চিঠি, সে যার চিঠিই হোক না কেন ! স্বগতোক্তি হলেও, আত্মকথন হলেও, এমনকি অনেক সময়ে আত্মরতির চিঠি হলেও তার নিজেরই নিজস্ব একটি ভূমিকা ও পরিচয় থাকেই ! সে অন্য কারো দয়া বা সাহায্য বা প্যায়েরভি ব্যতিরেকেই শুধুমাত্র নিজের দাবীতেই নিজ স্বতন্ত্র পরিচয় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ পরিপ্লুতির দাবী করতে পারে। উত্তর পাওয়া বা না-পাওয়ার উপরে নির্ভরশী। হয়না অনেকই মানুষের অনেক চিঠি। তারা পূর্ব হিমালয়ের লাভা-লুলেগাঁও এর পাহাড় কন্দরের অর্কিডদের মতো আপন আনন্দে শোভা পায়। সেই দুর্গম নির্জনতায় তাদের অন্যে দেখে বাহবা দিল, কী না দিল, তাতে তাদের যায় আসেনা কিছুমাত্রই !

আপনার চিঠিগুলি মনে হয় সেই গোত্রীয়।

বড়ই কৃতজ্ঞ বোধ করি। ভীষণ, ভীষণ, ভীষণ। আর কী বলতে পারি !

ভালো থাকবেন ! ভালো থাকবেন ! ভালো থাকবেন।

ইতি আপনার পরম প্রশ্রয়ের পাত্রী

ফিরদৌসী

www.boiRboi.blogspot.com

ফিরদৌসী আখতার
ধানমণ্ডি
ঢাকা
বাংলাদেশ

" "

লেখক

বড় বিপদে পড়েই আজ আপনাকে চিঠি লিখছি।

আমি যে কোনোদিন এমন বিপদে পড়বো তা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। আপনাকে যে অনেকদিন চিঠি লিখিনি, ইতিমধ্যে আপনার এতোগুলো চিঠি বেমালুম হজম করে বসে রয়েছি তার কারণ কিন্তু একটাই। মানে, এই বিপদ।

না জানি কী মনে করছেন আপনি আমাকে। ছিঃ।

কিন্তু কী যে করি ! কী করে যে কী বলি !

তাহলে গোড়া থেকেই বলি। লাজলজ্জার মাথা খেয়ে।

আপনার সঙ্গে বইমেলাতে আলাপ হওয়ার পর, চাক্ষুষ আপনাকে দেখার পর এমনই এক ঘোরের মধ্যে ছিলাম এবং এখনও আছি যে, নিজেকে নিজেই হলফনামা পড়িয়েছিলাম যে আমার দয়িতর সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে। যা হবার তা হয়ে গেছে এ জন্মের মতো।

বিয়ে করা, ঘরসংসার করাইতো একজন আধুনিক নারী পুরুষের প্রেমের শেষ গন্তব্য নয়। সে গন্তব্যর নানা দিক, নানারকম হতে পারে।

আসলে আপনার প্রভাব আমার কিশোরী মনের উপরে, আমার যুবতী মনের উপরে এমন ভাবেই পড়েছিল যে, তা যে কোনোদিনও একটু কুণ্ঠিত পর্যন্ত হবে তাও কখনও ভাবিনি। তা ছাড়া, সেতো একদিনের কথা নয় !

আসলে, এই প্রভাব আপনার ব্যক্তিসত্তার প্রভাব নয়। আপনার অগণ্য লেখার মাধ্যমে সৃষ্ট নায়ক-নায়িকাদের প্রভাব। তারাই আমার কাছে শিক্ষার, সুরুচির, রসবোধের সংজ্ঞা হয়েছিল। আপনার মনের ঋতি থেকে "সবিনয় নিবেদন" এর নায়িকা ঋতি সবাই আমাকে এমন ভাবেই প্রভাবিত করেছিলো যে, আপনার সঙ্গে আলেপিত হবার পর আমি জেনেছিলাম, যে তরী আমার কূল পেয়েছে ; চিরদিনের মতো।

"অগণ্য" লেখা বললাম বলে, রাগ করবেন না। সংখ্যাতে যতই হোক না কেন পড়া

www.boiRboi.blogspot.com

মাত্রই ভুলে গেছি, ভুলেও ফিরে পড়তে ইচ্ছা হয়নি একবারও ; এমন লেখা আপনি একটিও লেখেননি যে, এই আপনার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

মাসখানেক আগে রমনাতে আমার মুমানীজানের বাড়িতে আমার তাঁরই মেয়ে রেশমীর দেওরের সঙ্গে দেখা হল। ওরা পাবনার লোক। আপনার রংপুরের কাছাকাছি। ইফতিকারকে দেখে মনে হল ও যেন আপনারই কোনো উপন্যাসের নায়ক। সদ্য দুমলাটের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে।

পেশাতে কস্ট অ্যাকাউন্টট্যান্ট। একটি কোম্পানীর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট। তাতে অ্যামেরিকান লগ্নী আছে। ও পড়াশুনোও করেছে স্টেটস এ। আপনার লেখার খুব ভক্ত। স্টেটস এর বস্টন থেকে নাকি পাঁচবছর আগে আপনাকে চিঠি লিখেছিলো এবং সে চিঠির উত্তরও পেয়েছিল। উত্তরটা পার্স এর মধ্যেই রেখে রেখে লালচে করে ফেলেছে। বনজঙ্গলের ছবি আঁকা আপনার যে প্যাড, যে প্যাডে আমাকে আপনার প্রথম চিঠি লিখেছিলেন, সেই প্যাডেরই কাগজে।

আপনার ঐ চিঠিই হলো আমার অথবা তারও তুরুপের তাস।

যেমন ছেলেকে প্রত্যেক শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন মেয়ে শিশুকাল থেকে স্বপ্ন দেখে, তার পুতুলখেলার দিনে যে পুতুল হয়ে তার মনে বসে থাকে, ইফতিকার তেমনই ছেলে। ভদ্র, শিষ্ট ; প্রকৃতশিক্ষিত। বিদ্যার গর্ব নেই, টাকার গর্ব নেই। স্বভাবতঃই বিনয়ী এবং সবচেয়ে বড় কথা, শিশুর মতো সরল এবং ভালো। ওর ভালত্বটা ভাণ নয়, অনেকের মতো।

আপনি এখানে যখন এসেছিলেন তখন বলেছিলেন যে ভালত্ব এবং সারল্যই হচ্ছে এই আধুনিক জীবনে, আধুনিক সমাজে, "First casualty"। সেই জন্যেই, কারো মধ্যে এই দুটি গুণ যে একই সঙ্গে আদৌ পাওয়া যাবে, সে আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

ইফতিকার খুব রসিক এবং প্রাণবন্তও। ভাটিয়ালি গান যা গায়, তা কী বলব। ওর মতো সফিস্টিকেটেড ছেলে যে ভাটিয়ালি গায়, বাইচ খেলার গান,ডাকাতদের ছিপ নৌকোর গান গায় ; সারি, জারি, তাতে আমি অবাক হয়েছিলাম।

কী যে হয়ে গেল !

দু জনে দুজনকে দিনে, সকাল দুপুর বিকেল রাত মিলিয়ে তিন ঘণ্টা ফোন না করলে ঘুম হতো না। এতো কথা বলার পরও দিনের মধ্যে দুজন দুজনকে কমপক্ষে তিনটি করে চিঠি লিখতাম। এখনও লিখছি। তবে বেশিদিন তা আর করতে হবে না। কারণ, আমার মামুজান মুমানীজানের ফতোয়া যে, দুমাসের মধ্যেই নিকাহ করতেই হবে।

লেখক। আমার সব রোম্যান্টিসিজম, আমাদের ; আমার আর ইফতিকারের কল্পনাবিলাস কি শেষ হয়ে যাবে চিরতরে ? দুমাস পরে ?

আপনি একবার কি লিখেছিলেন মনে আছে ? বিয়ে করা মানে সাঁতারু মিহির সেনের মতো গায়ে গ্রিজ মেখে ইংলিশ চ্যানেলে ঝাঁপিয়ে পড়া।

সত্যি ! ভীষণ ভয় করছে আমার এখন থেকেই।

আমি ওকে live-together এর প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু ওদের পরিবার ধর্ম্মের ব্যাপারে বেশ কট্টর আছে। ও নিজেও কমবেশি তাই। সেই কারণে, আমার মতো বে-পর্দা চাকরী

www.boiRboi.blogspot.com

করা স্বাধীন আওরাৎকে দুলহীন করার ব্যাপারে ওদের বাড়িতে অনেকই আপত্তিও ছিলো। কিন্তু ইফতিকার অত্যন্ত ব্যক্তিত্যসম্পন্ন পুরুষ। He has put his feet down। তাছাড়া ইফতিকারকে পাওয়ার জন্যে আমি হারেমএ থাকতেও রাজী। প্রেম কী বিচ্ছিরী জিনিস! আমার বড় ভয় করছে।

আপনিই তো আমার জীবনের ধ্রুবতারা। আপনি পথ না দেখালে কে দেখাবে বলুন ?

ইতি—ফিরদৌসী

ফিরে ! আমার বিয়ে হবে জেনে আপনি দুঃখিত হবেন নিশ্চয়ই। মুখে যাই বলুন না কেন, আমি নিশ্চয়ই জানি যে ; আপনি হবেন। দুঃখিত হবেন যে, একথা জেনে একটু শ্লাঘাও যে হচ্ছে না এমনও নয়।

ইফতিকার আপনার কথা, মানে আমার জীবনে আপনার ভূমিকার কথা শুনেছে ; জানে, এবং .....। সব কথা বলিনি। শুধু একটুখানি গোপন রেখেছিলাম।

ও আমাদের পত্র-মিতালীর কথাও জানে। ও বলে, "কোনো শিক্ষিত মানুষ অপরের চিঠি খোলে না। তুমি যদি পড়াও তো পড়বো। না-পড়ালে পড়বো না। পড়ার ঔৎসুক্যই হবে না।

আমার বিয়ে হতে পারে (মানে না-হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস কি ?) বলে, আপনি কিন্তু ভাববেন না যে, আপনার যে নেমন্তন্ন ছিল তা তামাদি হয়ে গেল,

সেই রান্না করে খাওয়ানো, গামছা দিয়ে দই পেতে রাখা, লইট্যা আর বম্বে ডাক এর শুঁটকি খাওয়ানোর নেমন্তন্ন কোনোদিনও তামাদি হবে না। না, কোনোদিনও না।

আপনি এলে, ইফতিকারের বাড়ি ছেড়ে আমার বাড়িতে এসে থাকব আপনার খিদমদগারীর জন্যে। খাদিমা হব আপনার।

চাইকি, ইফতিকারও খোদ মজুদ থাকবে খিদমদগার এবং খাদিম হিসেবে।

আপনি যদি চান অবশ্য।

ইতি—আপনার তোড়া।

www.boiRboi.blogspot.com

তোড়া, তবাসুম ;

কল্যানীয়াসু,

কী খুশি যে হলাম !

"অলি বার বার ফিরে যায় অলি বার বার ফিরে আসে, তবেতো ফুল বিকাশে।"

এবার তোমার ফুল ফোটার বেলা এলো।

তোমার চিঠি পেয়েছি কাল সন্ধেতে।

যা পাবার কিছু যোগ্যতা আমার কোনোদিও নিজগুণে হতোনা, তা তুমি নিজেই দিয়েছিলে ! তোমার দেওয়া সেই সকালবেলার আলো এখন আমারই হয়ে গেছে। শুধুই আমার। সে আলোর সুইচ এখন তোমার বা আমার কারো হাতেই নেই সে আলো ফিরিয়ে নেবে এমন সাধ্য কী তোমার !

যতই দিন যাবে, ততই ঔজ্জ্বল্য বাড়বে তার ! বিশ্বচরাচর, আমার অন্তর-বাহির এই আলোর স্নিগ্ধতায় মুগ্ধতর হবে।

আমাদের শাস্ত্রে বলে,

"কন্যা বরয়তে রূপং, মাতা বিত্তং, পিতা গুণং, বান্ধবাঃ কুলমিছন্তি মিস্টান্নমিতরে জনাঃ।"

আমি ইতর জন। তোমার শাদীতে মিস্টি পেলেই খুশি। বুঝলে দুলহিন !

তুমি কি জানো যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এবং পুরুষতো বটেই, কিন্তু তিনি "রাধাকে কি বলেছিলেন ?"

"ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভূষণং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং
স্মরগরলখণ্ডনং
মম শিরসিমণ্ডনং
দেহি পদবল্লভমুদারম্"

এখন ইফ্তিকার বাছা বুঝছেন যে, সব শাস্ত্র সব কিমতি জিনিসের মূল্যই "কষ্ট অ্যাকাটেন্সীর" দ্বারা আগে থাকতে নির্দ্ধারন করা যায় না। ফলে কারখানায়, কমপ্যুটারে "প্রজাপতির" ভাইরাস ঢুকে গেলে যে কী "কেলোই" হতে পারে কোনো ধলোর জীবনে, তা আগে থাকতে আদৌ জানার উপয়েই নেই।

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com

তোমার চিঠিটি প্রথমবার পড়ে মনে হয়েছিলো, আমাকে জ্বালাবার জন্য, পরীক্ষা করার জন্যেই এসব বানিয়ে বানিয়ে বলছো। তারপরেই বুঝলাম তেমন সৌভাগ্য কী আমার !

ফৈয়াজ খাঁ সাহেব এবং আরও অনেক গুণীই একটি গজল গাইতেন।

"রকীব যো উয়ো বোসো
কনার করতে হ্যায়।
জ্বলাজ্বলাকে বেকারার করতি হ্যাঁয়।"

ভাবটি হচ্ছে, খবর পাওয়া গেল আমার প্রণয়ী অন্যের সঙ্গে চুম্বন বিনিময় করেছেন। শুনে, আমার মনে হচ্ছে, আসলে করেন নি। সব মিথ্যে। কিন্তু কথাটা আমার কানে যাতে আসে তার বন্দোবস্ত করেছেন যাতে আমি জ্বলে জ্বলে খাক্ হয়ে যাই। কিন্তু আমিও দুনিয়াকে জানিয়ে দিচ্ছি যে, অত বোকা আমিও নই। আসল ব্যাপারটা চিঠিই বুঝেছি।

আমাকে নিয়ে খেলা খেলছো তুমি।

এই গজলতো অন্যের বিশ্বাসের গজল। আমার জীবনের গজল নয়।

কনগ্রাচুলেশানস্। কনগ্রাচুলেশানস্। কনগ্রাচুলেশানস্। তোড়া ; গুলদস্তাঁ। তবাসুম।

"প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন।
যা পাইনি, বড় সেই নয়।"

কার লেখা বলোতো ?

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারই বা হতে পারে ?

কাল রাতেই স্বপ্ন দেখলাম তোমাকে দুলহিন্ এর বেশে। আর ইফতিকারকে দুল্হার বেশে। তোমার চিঠি পড়ে তার চেহারার একটা ভাল আন্দাজও করে নিয়েছি। তার মুখের "ভাও"এর

তুমি ব্রীড়ানম্র মুখ তুলে কাজী সাহেবের দিকে চেয়ে তাঁর প্রশ্নর উত্তরে বলছো "ম্যায়নে কবুল কিয়া।"

কাজী সাহেব বলে চলেছেন, "আজ থেকে আপনার খানা-পহেননা, দুখ-দরদ বিমারি—খারাবি এবং খুশীয়াঁ-ভালাই সব কিছুরই দায় দায়িত্ব নিলেন ইফতিকার আহমেদ।

তারপরে কাজী সাহেবের অনুরোধে উপস্থিত তোমাদের সব গুরুজন নিকাহর মোহরনামাতে গাওয়ার দস্তখত করলেন।

বাইরে তখন জোর হল্লাগুল্লা, শোর মেচেছে। বড়ি জোর বাজা বাজছে। ফালানা-ঢামকানা। অন্দরমহলে নাচনা-গানা। বোমের পর বোম ফাটছে বাইরে। নানারকম বাজীর ফোয়ারা উঠছে।

এদিকে শাদিয়ানা মানাতে মানাতে এসে গেছে ইফতিকার আহমেদ। সঙ্গে সঙ্গে বরাত।

দরওয়াজায়, অলিন্দে, ঝারোখার পেছনে পেছনে সুগন্ধি সুবেশা সুন্দরীদের, তোমার রিস্তেদার আর সহেলিদের দৌড়াদৌড়ি পড়ে গেছে পায়জোরে পায়জোরে ঝুনঝুনি তুলে, দুলহা দেখার জন্যে, তোমার পুরুষ গুরুজনেরা সকলেই বরাতিদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করে নিয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

গিয়ে বসাচ্ছেন। চারদিকে ঈত্বর আর গুলাব, হিন্বা আর কেওড়ার খুশবু উড়ছে হাওয়ায়।

আমি যাচ্ছি তাঁদের পেছনে পেছনে। সাদা পোষাকে। বিনম্র প্রৌঢ়।

কে যেন শুধোলেন আমাকে, আপনার তারিফ ?

আড়াল থেকে তুমি আমার মান বাঁচালে। বললে, আমার প্রিয় লেখক।

তোমাদের বিয়েতে কি কাওয়ালি হয় ? আমার যেসব বিহার উত্তরপ্রদেশের মুসলমান বন্ধুরা আছেন তাঁদের বিয়েতে অবশ্যই হয়। বিশেষকরে অবস্থাসম্পন্নদের বিয়েতে।

ঝিংচ্যাক, পাকিস্থানী জাতীয়-পতাকার রঙের মতো গাঢ় সবুজ রঙা কোট পরে, তার গায়ে অগণ্য সোনারূপো ব্রোঞ্জের মেডেল ঝুলিয়ে কোনো কাওয়াল চমকিলি পোশাক পরে তার দল নিয়ে ম্যায়ফিলে হাজির হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই।

কালীনে বসে, ম্যায়ফিল জমাবার হরকৎ এ সামিল হয়ে গেছে সে ইতিমধ্যেই।

ইফতিকার নিকাহনামাতে সই করার পরই ইমাম সাহেব মাথার উপরে দুহাত তুলে খুদাহর কাছে দুয়া মাঙ্গলেন।

"অয় পরবরদিগার, ইয়ে বহানী ফজল্‌কে বকস্‌নেওয়ালে অব্‌দি জিন্দ্‌গী কি বাণী, অপনে ইন দোনো বান্দাকা আপনি বরকত ঔর ফজলকে অ্যাইসা মামূর কর দো কি, ইয়ে দোনো হামেসা হামেসা কামাল মহব্বত ঔর মুয়াফিফত্‌ কি সাথ মিলে রঁহে ; ঔর তেরে হুকম্‌ কি বামূজিব্‌ জিন্দগী গুজারে। — আমীন !

আমীন।

আমীন।

আমীন।

হবে কলি, তুমি সুখী হবে।

কলি থেকে তুমি সত্যিই তোড়া হবে।

আমি আশীর্বাদ করছি যে, তুমি সুখী হবে, সুখী তোমাকে হতেই হবে।

তোমাকে আমিই "তোড়া" করেছিলাম।

আজ তোমার বিভিন্ন সত্তাকে বন্ধনমুক্ত করে তুমি গোড়াতে যেমন ছিলে তেমনই তোমাকে ইফতিকার আহমেদ এর হাতে তুলে দিলাম। প্রত্যর্পণ করলাম। তোড়া থেকে কলি করেদিলাম তোমাকে।

ইফতিকার তোমাকে আবার তোড়া করে তুলবে অন্য ভাবে। এক দারুণ খেলায়।

আমি একজন অতি সাধারণ লেখক, যে তোমার প্রশংসায়, তোমার প্রেরণায় এবং তোমার ভালোবাসাতেও প্রাণিত হয়েছিল।

নবীকৃত করেছিলে তুমি তাকে, নিজের অজানিতে।

আমি ছিলাম তোমার কয়েকমাসের 'অছি' মাত্র। কিন্তু সৎ, ইমানদার অছিমাত্রই জানেন, অছি হওয়ার সুখ। শত প্রলোভন সত্ত্বেও যে ধন পাহারা দেবার সানন্দ দায় তার উপরে বর্তেছিলো একদিন, তাকে অক্ষত রেখে ফিরিয়ে দেওয়ার সুখ, সুদে এবং আসলে ; যে, কত গভীর ; তা তিনিই জানেন।

পাওয়াতে সুখ অনেকই।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু পাওয়া থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করাতে যে সুখ, তার কাছে পাওয়ার সুখ ; কিছুমাত্রও নয়।

খুদাহ্ হাফিজ।

তোমার সুখেই আমার সুখ ফিরদৌসী। তুমি সুখী হলেই আমি সুখী, তবাসুম।

ইতি—তোমার লেখক। যে, চিরকাল তোমারই থাকবে।

পুনশ্চ ঃ

তোমার শরীরের পুরোটাই পাবে ইফতিকার। আর তোমার মনের আধখানা। অন্য আধখানা মন যে নীলামে চড়িয়েছিলে অনবধানে। সে তো আমি ডেকে নিয়েছি প্রথম দর্শনেই। সে তো আমারই চিরদিনের !

তোমার চানঘরের আয়নায় তোমার নগ্ন শরীরের ছায়া ফেলে ইফতিকারের পরশ মাখা নিজেকে দেখে দেখে তোমার আশ মিটবে না।

কিন্তু আমিও চিরদিন থেকে যাব তোমার মনে, তোমার সুখে, তোমার দুখে ; তোমারই একান্ত হয়ে।

আমি যে তোমার চানঘরের গান !

ইতি— “................”

www.boiRboi.blogspot.com
www.boiRboi.blogspot.com